NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

PG : POL. SC.

PAPER - III (Beng)

MODULES - 1, 2, 3 & 4

POST GRADUATE
POLITICAL SCIENCE

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে-পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ-কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনও শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। তার ওপর, প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর, 2019

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

রাষ্ট্রবিজ্ঞান : স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

[Post-Graduate Political Science (PGPS)]

নতুন সিলেবাস (জুলাই, ২০১৫ থেকে প্রবর্তিত)

তৃতীয় পত্র : রাষ্ট্রচিন্তার বিষয়সমূহ

[Paper III : [Issues in Political Thought]

উপদেষ্টামণ্ডলী:

অধ্যাপক মোহিত ভট্টাচার্য

অধ্যাপক রাধারমন চক্রবর্তী

অধ্যাপক কৃত্যপ্রিয় ঘোষ

বিষয় সমিতি :

অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগুপ্ত

অধ্যাপক তপন চট্টোপাধ্যায়

অধ্যাপক অপূর্ব মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপক সুমিত মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপক পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য

অধ্যাপক দেবনারায়ণ মোদক

Course-Writing :

পর্যায় — এক (Module–I) : একক : ১-৪ (Units: 1-4) : অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগুপ্ত

পর্যায় — দুই (Module–II) : একক : ১-৪ (Units: 1-4) : অধ্যাপক দেবাশীষ চক্রবর্তী

পর্যায় — তিন (Module–III) : একক : ১-৪ (Units: 1-4) : অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগুপ্ত

পর্যায় — চার (Module–IV): একক : ১-৪ (Units: 1-4) : অধ্যাপিকা দেবী চ্যাটার্জী

সম্পাদনা : অধ্যাপক কৃত্যপ্রিয় ঘোষ

সম্পাদকীয় সহায়তা এবং সমন্বয়সাধন : অধ্যাপক দেবনারায়ণ মোদক

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়

নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

PG Pol. Sc.–III

(স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)

পর্যায় 1

একক 1	রাষ্ট্র ও নাগরিক সমাজ	7-13
একক 2	ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ	14-20
একক 3	রক্ষণশীলতাবাদ	21-25
একক 4	ধর্মনিরপেক্ষতা	26-30

পর্যায় 2

একক 1	ন্যায়বিচার	31-46
একক 2	সাম্য	47-57
একক 3	স্বাধীনতা	58-73
একক 4	অধিকার	74-85

পর্যায় 3

একক 1	শাস্ত্রীয় গণতন্ত্র	86-94
একক 2	সমকালীন গণতন্ত্র	95-103
একক 3	জাতীয়তাবাদ	104-108
একক 4	ফ্যাসিবাদ	109-113

পর্যায় 4

একক 1	সমাজতন্ত্র	114-124
একক 2	নৈরাজ্যবাদ	125-131
একক 3	বিপ্লব	132-138
একক 4	সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ	139-144

একক ১ ☐ রাষ্ট্র ও নাগরিক সমাজ

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য
১.২ ভূমিকা
১.৩ নাগরিক সমাজ : বৌদ্ধিক উৎপত্তি
১.৪ পশ্চিমের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও নাগরিক সমাজ : উদারবাদী দৃষ্টিভঙ্গী
১.৫ পশ্চিমের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও নাগরিক সমাজ : মার্ক্সবাদী চিন্তাধারা
১.৬ নতুন অভিমুখ
১.৭ নমুনা প্রশ্ন
১.৮ গ্রন্থসূচী

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে ছাত্রছাত্রীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলির সঙ্গে পরিচিত হবেন:

- ভূমিকাতে রাষ্ট্র ও পুরসমাজের সম্পর্ক বিষয়ে একটি সামগ্রিক পরিচিতি পাওয়া যাবে।
- পুরসমাজের বৌদ্ধিক উৎস।
- পশ্চিমে রাষ্ট্র ও পুরসমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে উদারনীতিক দৃষ্টিভঙ্গি
- পশ্চিমে রাষ্ট্র ও পুরসমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি
- রাষ্ট্র ও পুরসমাজ সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি।

১.২ ভূমিকা

আধুনিক পাশ্চাত্য সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই নাগরিক সমাজ শব্দবন্ধটি গড়ে উঠেছে। রাজনৈতিক তত্ত্বে ও রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বে এই ভাবনাটিকে ব্যবহার করা হয়েছে রাষ্ট্রের সাথে ঘনিষ্ঠ অবস্থানে—যেটি সর্বদাই আধুনিক পাশ্চাত্য রাজনৈতিক চিন্তনের মধ্যমণি হিসেবে গুরুত্ব পেয়েছে। নাগরিক সমাজ শব্দবন্ধটি উদারবাদী এবং মার্কর্সবাদীরা সকলেই ব্যবহার করেছেন যদিও মার্কসবাদী দর্শন একে কিছুটা উপেক্ষা করেছেই বলা যায়। পাশ্চাত্যে নাগরিক সমাজকেন্দ্রিক ভাবনার একটি নির্দিষ্ট পথ কোনোদিনও ছিল না। উদারবাদী দর্শনেও এই প্রশ্নে বহু মত ও পরিবর্তন হয়েছে, কারণ, প্রথমত পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতন, যার সূচনা উনিশশো আশির দশকের শেষের দিকেই শুরু হয়েছিল ও দ্বিতীয়ত, বিশ্বায়ন। নাগরিক সমাজ আজ উন্নত দেশে বসবাসকারী দাতাদের তৃতীয় বিশ্বের গরিব দেশগুলিকে সাহায্য করার প্রধান যুক্তি ও কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাগরিক সমাজের অন্যতম উদাহরণ হল, অন্তত, এই বিশ্বায়িত পৃথিবীতে অসংখ্য NGO বেসরকারী সংস্থা) গুলি। এই শব্দবন্ধটি আজকাল অনেক র‍্যাডিক্যাল গোষ্ঠীও ব্যবহার করছে যারা বিভিন্ন স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের স্বার্থে লড়াই করছে, এমনকী সমাজের দুর্বলতরও প্রান্তিক অংশের স্বার্থ রক্ষার্থে কর্মসূচি গ্রহণ করছে। নাগরিক সমাজ শব্দবন্ধটি আজ তাই সারা পৃথিবী জুড়ে ব্যবহার হচ্ছে বিভিন্ন

ব্যবস্থায়, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও বিভিন্ন প্রেক্ষিতে এবং অনেক সময়ই বিপরীত অর্থে। কিন্তু সবক্ষেত্রেই এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আজকের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে অনস্বীকার্য।

পাশ্চাত্যে আধুনিকতার সূচনার সময় এই ধারণাটিকে ব্যবহার করা হয়েছিল একটি মুক্ত, স্বাধীন ক্ষেত্র হিসাবে, ব্যক্তিমানুষের স্বার্থে, ও সর্বশক্তিমান ও সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। যদিও এর মূল অর্থটি এখনো কিছুটা বিদ্যমান তবুও উত্তর ঔপনিবেশিক ও উত্তর সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদী সমাজগুলিতে এই ধারণাটি বিবিধ অর্থ পরিগ্রহ করেছে। ভূতপূর্ব সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে উদাহরণস্বরূপ নাগরিক সমাজের সেভাবে কোনো অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু সেখানে পার্টিরাষ্ট্রের রাষ্ট্রের প্রাধান্য ও অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হত। ফলস্বরূপ ১৯৯০-এর শুরুতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলির রাষ্ট্রভাবনাকেই ১৯৮৯ সালে বার্লিন প্রাচীরের পতন ১৯৯১-এ সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের ফলে বিভিন্ন নাগরিক সমাজ তাদের আন্দোলনের ভিত তৈরি করতে উৎসাহিত হল। পোল্যান্ডের সলিডরিটি আন্দোলন এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। উত্তর ঔপনিবেশিক সমাজগুলিতে এর অর্থ বিভিন্নজনের কাছে আলাদা আলাদা বার্তা বহন করেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন, তা সে বামপন্থী বা সমাজতান্ত্রিক যাই হোক বা নয়া সমাজিক আন্দোলন, সকলকেই নাগরিক সমাজের বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিতে হচ্ছে। এই শব্দবন্ধটিকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গণতন্ত্র, তার গঠন, তার টিকে থাকা ও তাকে গৌরবান্বিত করার ভাবনার সঙ্গে সংযুক্ত করা হচ্ছে। পাশাপাশি এই শব্দবন্ধটিকে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক কাঠামো অথবা সামাজিক সম্পর্ককে অর্থাৎ রাষ্ট্র ও ব্যক্তির সম্পর্কের স্বাধীন কাজের ক্ষেত্রকে বোঝার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হচ্ছে।

১.৩ নাগরিক সমাজ : বৌদ্ধিক উৎপত্তি

নাগরিক সমাজ শব্দটি প্রাথমিকভাবে ল্যাটিন Societas Civitas' এর থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল। রোমান চিন্তাবিদ Ciero'র কাছে রাষ্ট্রের (civitas) অর্থ অংশগ্রহণ (societas), আইনি সাম্যের নিরিখে, অর্থের বা গুণের নয়। এরও আগে অ্যারিস্টটল 'Koinonia politike' বলে একটা শব্দবন্ধের ব্যবহার করেছিলেন। তার অর্থ ছিল একটি গোত্র যেখানে নাগরিকরা মুক্ত, সমান ও গুণসম্পন্ন। এই চিন্তা ছিল গ্রিক জীবন দর্শনের প্রতিফলন সাম্যের নিরিখে ধর্মনিরপেক্ষ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার ফলশ্রুতি, সেটি ছিল মূলত ধর্মীয় ব্যবস্থাগুলির বিপরীতে।

দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় শহরগুলিতে এই শব্দবন্ধের ব্যবহার শুরু হল সরাসরি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কহীন কিন্তু মুক্ত ও স্বাধীন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করার স্বার্থে। সাধারণ মানুষের ভাষায়, পছন্দে ব্যবহারে, সচেতনতায় এমনকী লেখাপড়ার এর উল্লেখ পাওয়া যায়। নাগরিক সমাজকে কেন্দ্র করে যে বিষয়গুলি উঠে আসছিল তা হল ব্যক্তিগত সুরক্ষা, স্বাধীনতা, সম্পত্তির সুরক্ষা, জমি , বাড়ি, জিনিসপত্রের ওপর হঠাৎ করে কারও দখলদারি। নাগরিক সমাজের গড়ে ওঠার সূচনায় দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল: আইন ও আইনি প্রক্রিয়া এবং ন্যায়। রোমের আইনি ব্যবস্থার নাগরিক সমাজের গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। খ্রিস্টিয় সমাজব্যবস্থায় আইনের কাজ ছিল দুর্বলকে সবলের হাত থেকে রক্ষা করা। গরিবের, অরক্ষিত মানুষের ব্যক্তি অধিকারকে সুরক্ষিত করার অস্ত্র। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মাধ্যমে বোঝা যাবে কোন কোন ক্ষেত্রে রোমান আইন ব্যবহৃত হত: নিজের গৃহের সুরক্ষা, পারিবারিক জীবন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ব্যবসা বাণিজ্য, মালিকানা এবং তাকে হস্তান্তর করার ক্ষমতা ইত্যাদি। রোমান আইন নিয়ন্ত্রণ করত মানুষের কেনাবেচার, চুক্তির, বিবাহের ও পারিবারিক সম্পর্ককে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইওহানেস আলথুসিয়াস অ্যারিস্টটল, সিসেরো এবং খ্রিস্টিয় চিন্তাধারার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে নাগরিক সমাজের ভাবনাকে গঠনমূলক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর ধারণা এটি এমন একটি সমাজ যার ভিত্তি আদান প্রদান ও দেওয়া নেওয়া। তাঁর ভাষায়—'যদি একজন মানুষের অনেকের সাহায্য নাই লাগে, তাহলে কি কোনো সমাজ,

ব্যাবস্থা, সম্মান, যুক্তি মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব সম্ভব? এই জন্যেই গ্রাম এবং শহরের পত্তন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এই জন্যেই শত অনৈক্য থাকা সত্ত্বেও মানুষ সমাজ ও নাগরিক ঐক্য তৈরি করে একটি বৃহত্তর ব্যবস্থায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকবার স্বার্থে।' রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ রহিত স্বাধীন একটি ব্যবস্থাকে গুরুত্বপ্রদান করে যদিও চার্চের শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছিল, রাষ্ট্রের সাথে চার্চের বিবাদ ছিল স্পষ্ট।

রেনেসাঁ এবং জার্মান চিন্তাধারা পরবর্তী সময়ে নাগরিক সমাজে অন্তরের বৌদ্ধিক উন্নয়নকে পরিপুষ্ট করে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, আইন ব্যবস্থা এবং মানুষের মধ্যে সাম্য এই নব্য চিন্তাধারার মূল ভিত্তি ছিল। মেকিয়াভেলি সমাজে সাম্যকে মানব মুক্তির মূল চাবিকাঠি বলে মনে করতেন, এবং লুথার এই নীতিকেই প্রসারিত করলেন সর্বক্ষেত্রে।

সাম্যের মত সামাজিক মূল্যবোধের সরাসরি সংঘাত চলছিল সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে, যা ক্রমোচ্চশ্রেণি বিভাগ এবং স্বজনপোষণের কথা বলে। এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ সামন্ততন্ত্রের অবসান এবং পুঁজিবাদের উত্থান নাগরিক সমাজের সম্পূর্ণভাবে গড়ে ওঠার পিছনে মূল কারণ। শেষ যে বিষয়টিকে আমল দিতে হবে, নাগরিক সমাজের বৌদ্ধিক ভিত্তিকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে গেলে সেটি খুব জরুরি। পুর মতাদর্শের অবিচ্ছেদ্য উপাদান হল সরকার। পুর মতাদর্শই একটি সঠিক অ-সামরিক সরকারের বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র করে নির্দিষ্ট করেছিল। ইউরোপীয় নগররাষ্ট্রগুলিকে নাগরিক মূল্যবোধের পরাকাষ্ঠা হিসেবে তুলে ধরল। ইউরোপীয় নগরকে সংজ্ঞায়িত করা হল এইভাবে: 'নাগরিকের স্বাধীনতা অথবা বসবাসকারীর সুরক্ষা। নগর অর্থ, হিংসার হাত থেকে তোমার সুরক্ষা।'

উপরোক্ত আলোচনা থেকে যে মূল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তা হল যে নাগরিক সমাজের চিন্তাধারার অন্তর্নিহিত মূল্যবোধগুলি মূলত গ্রিক-রোমান চিন্তার সঙ্গে জার্মান ও ইহুদি-খ্রিস্টান চিন্তার সংমিশ্রণ থেকে এসেছিল। এগুলো চিহ্নিত করা আছে ধর্ম ও সাংস্কৃতিক বিভেদে, দৃষ্টিভঙ্গির বহুত্ববাদিতায় এবং স্বাধীনভাবে আইন স্বীকৃত গোষ্ঠী গঠনের বিশ্বাসে।

১.৪ পশ্চিমের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও নাগরিক সমাজ : উদারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

পশ্চিমের উদারবাদী চিন্তাধারাতেও নাগরিক সমাজ সম্পর্কিত কোনো একটি নির্দিষ্ট চিন্তাধারা ছিল এমনটা নয়। চারটি ভিন্ন চিন্তাধারা তৈরি হয়েছিল নাগরিক সমাজ সম্পর্কে। বিট্রিশ, স্কটিস, ফরাসি ও জার্মান।

ক. ব্রিটিশ ভাবধারা : নাগরিক সমাজ বিষয়ক সবচেয়ে বিখ্যাত ইংরেজ তাত্ত্বিক ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর চিন্তাবিদ জন লক। ১৬৮৮ গৌরবময় বিপ্লবের পরে ১৬৮৯ সালে লকের দুট বই—Two Treaties of Government এবং An Essay Concerning Human Understanding প্রকাশিত হয়েছিল। নাগরিক সমাজ এবং রাষ্ট্র নিয়ে তাঁর মূল কাজ এই বই দুটিতে পাওয়া যায়। লকের হিসেবে, নাগরিক সমাজ হল নাগরিক সরকার যা স্বাভাবিক অবস্থা থেকে ভিন্ন। স্বাভাবিক অবস্থার অর্থ একই ধরনের মানুষের মধ্যে সাম্য ও মুক্তির ব্যবস্থা। জন এরেনবার্গ দেখিয়েছেন, নাগরিক সমাজের প্রাথমিক গুরুত্ব ছিল অর্থনৈতিক ব্যক্তিত্বের স্বার্থরক্ষা করার ক্ষেত্রে এবং অর্থনৈতিক শক্তিই নাগরিক সমাজকে সংগঠিত করতে পারবে, তাকে স্বাধীনতার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করে আইনের কাঠামোর মধ্যে প্রোথিত করে একটি উদারবাদী রাষ্ট্র সুরক্ষিত হবে—এমনই ছিল তাঁর ভাবনা। নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রব্যবস্থাই এটা সম্ভব করতে পারে। এই ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করে ব্যক্তি তার আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধিকে—যেহেতু নাগরিক সমাজ কেন্দ্রীভূত থাকে মুক্ত অর্থনীতির আবর্তে, যেখানে রাষ্ট্রের ক্ষমতা এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত করবার চেয়ে বেশি নয়।

খ. স্কটিশ ভাবধারা— নাগরিক সমাজ সম্পর্কে লকের ভাবনা মূলত দুটি ধারায় চালিত হল যা তৈরি করল স্কটিস ভাবধারা। একটি অবস্থান ছিল অ্যাডাম স্মিথের, যিনি তাঁর ১৭৭৬ এ রচিত Wealth of Nations-এ লকের ধারণাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন। তিনি বললেন যে একটি বাজার নিয়ন্ত্রিত সমাজে যেখানে নির্দিষ্ট শ্রমের বিভাজন আছে,

অর্থনৈতিক কর্মসূচিই একমাত্র শান্তি আনতে পারে এবং সামাজিক বিত্তের উন্নতি ঘটিয়ে এমনভাবে যেন কোনো অদৃশ্য শক্তির দ্বারা এই ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। অন্য পথটি ছিল অ্যাডম ফারগুসনের। তিনি তাঁর ১৭৬৭-এ সালে রচিত Essay on the History of Civil Society-তে নাগরিক সমাজ সম্পর্কে একটি ভিন্ন ও বিপরীত একটি ভাষ্য সামনে নিয়ে এলেন। যেখানে স্মিথ সমাজের স্বনিয়ন্ত্রিত শক্তির কথা বলছিলেন, ফারগুসন গুরুত্ব দিলেন সমাজের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে। তিনি বললেন যে নাগরিক সমাজ সঠিকভাবে উদ্ভাসিত হতে পারবে তখনই যখন অর্থনৈতিক চাহিদার পাশাপাশি ব্যক্তির ও সমষ্টির মূল্যবোধকেও গুরুত্ব দেওয়া হবে, কারণ একমাত্র এভাবেই স্বাধীনতার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব।

গ. ফরাসি ভাবধারা—মঁতেস্কু ও তকভিল এই চিন্তাধারার দুজন অগ্রণী তাত্ত্বিক। মঁতেস্কু ১৭৪৮-এ The Spirit of the Laws-এ দেখালেন নাগরিক সমাজ কীভাবে মধ্যস্থতাকারীর কাজ করে রাজনৈতিক শাসক এবং সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে। নাগরিক সমাজ তাঁর মতে মধ্যবর্তী কিছু ভিন্ন মতাবলম্বী শক্তির দ্বারা সংগঠিত, যা বিস্তৃত এস্টেট থেকে চার্চ ও অন্যান্য নিচুতলার সংগঠন পর্যন্ত,—যা রাজনৈতিক স্বৈরাচারের বিরোধিতা করে। তকভিল, প্রায় একশ বছর পরে তাঁর Democracy in America-তে মঁতেস্কুর এই চিন্তাকে আরও পরিপুষ্ট করলেন মূলত মার্কিন গণতন্ত্রের ভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে। তিনি বললেন জনগণের মধ্যেকার বিতর্ক ও জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সংগঠনের মাধ্যমে নাগরিকেরা তাদের নিজস্ব সমস্যার বিষয়গুলি নিজেরাই মেটাতে পারে রাষ্ট্রের ওপর কোনো প্রকার ভরসা ছাড়াই। এই বোঝাপড়াকেই উনি নাগরিক সমাজের মূলচিন্তাধারা হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।

ঘ. জার্মান ভাবধারা : এই ভাবধারার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি ছিলেন হেগেল। লক, স্কটিশ ও ফরাসি ভাবধারা থেকে ভিন্ন এক চিন্তাকে আশ্রয় করে হেগেল তাঁর বক্তব্যকে হাজির করেছিলেন। নাগরিক সমাজ সম্পর্কে তিন যথেষ্ট সন্দেহপ্রবণ ছিলেন যদিও তার কিছু গুরুত্ব আছে এটাও তিনি স্বীকার করেছিলেন। নাগরিক সমাজকে তিনি মূলত অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের একটি ক্ষেত্র হিসেবে মনে করতেন যার সঙ্গে একদিকে নাগরিকদের সংযুক্তিকরণের সম্পর্ক ছিল অপরদিকে ছিল তাঁর ক্ষুদ্রকরণের। নাগরিক সমাজ তাঁর মতে, আসলে একটি এমন ক্ষেত্র যেখানে বিভিন্ন গোষ্ঠী, দল ইত্যাদির স্বার্থ গুরুত্ব পায়, অর্থাৎ অনেক মানুষকে সংযুক্ত করার স্বার্থে তা ব্যবহৃত হয়, আবার তার পাশাপাশি ব্যক্তির বিকাশকে সীমিত করে, কারণ ব্যক্তিচেতনা ব্যক্তিকে ক্ষুদ্র স্বার্থের দিকেই পরিচালিত করে। এর মাধ্যমেই ব্যক্তি রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থের থেকে দূরে সরে যায়। হেগেলের মতে, নাগরিক সমাজের রাশ তাই রাষ্ট্রের বৃহত্তর ক্ষেত্রের অধীনে থাকা উচিত।

১.৫ পশ্চিমে রাষ্ট্র ও নাগরিক সমাজ : মার্কসবাদী চিন্তাধারা

ধ্রুপদী মার্কসবাদে নাগরিক সমাজকে গভীর সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। মার্কস নাগরিক সমাজকে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বুর্জোয়া ব্যবস্থায় পরিবর্তনের স্তরের একটি সূচক হিসেবে দেখেছেন। নাগরিক সমাজের জন্ম বুর্জোয়া দর্শনের কোনো বস্তুবাদে, যা আধুনিক বহিঃপ্রকাশ এবং যা মূলত ব্যক্তিস্বার্থবাদের সমার্থক। মার্কসের মতে, নাগরিক সমাজ আসলে এক হবসীয় দুঃস্বপ্ন, যা অর্থের ভিত্তিতে উগ্র ও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিস্বার্থের সমাহার। ব্যক্তি যা অপরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। উনি বলেছিলেন যে নাগরিক সমাজ একসময় সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কিছু গোষ্ঠী হিসেবে কাজ করত মূলত প্রাক্ পুঁজিবাদী স্তরে। পরবর্তীকালে এই ক্ষেত্রটি বুর্জোয়াদের দ্বারা করায়ত্ত হয়, যখন পুঁজিবাদকে পাথেয় করে আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড সংগঠিত করা শুরু হয় শুধুমাত্র নিজের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য। মার্কস নাগরিক সমাজকে অপছন্দ করতেন কারণ তাঁর মতে নাগরিক সমাজের ভিত্তি, স্বার্থপর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ভিত্তি ছাড়া অন্যকিছু নয়। নাগরিক সমাজ তাঁর মতে মানুষের বিচ্ছিন্নতা মূল সামাজিক উৎস, যাকে মার্কস বলেছিলেন, 'মানুষের নিজের

সমাজের। এমনকী নিজের থেকেও বিচ্ছিন্নতা'। মার্কস নাগরিক সমাজ সম্পর্কে তাঁর নেতিবাচক মনোভাবকে ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাবে: '...নাগরিক জীবনের কিছু অসামাজিক চরিত্র, ব্যক্তি মালিকানার চরিত্র, ব্যবসা, শিক্ষা, বিভিন্ন জনগোষ্ঠির ধ্বংস... এই ভিত্তিসমূহ, এই সামাজিক দাসত্ব, এগুলিই আধুনিক রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি'। নাগরিক সমাজকে তিনি আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় ভরসাস্থল হিসেবেই গণ্য করে এসেছেন। উদারবাদী তাত্ত্বিকেরা যেখানে মনে করতেন যে নাগরিক সমাজ, রাষ্ট্রের বিপরীতে স্বাধীনতার মুক্তাঞ্চল, মার্কস সেখানে মনে করতেন, যে যদি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মানুষের বিচ্ছিন্নতাকে ঠেকাতে হয়, নাগরিক সমাজের ধ্বংস অবশ্য প্রয়োজনীয়। মানবমুক্তির স্বার্থে নাগরিক সমাজের ভেঙে পড়া একান্ত দরকার, এমনটাই ছিল মার্কসের মত। পরবর্তীকালে, ফেমিয়া বলেছিলেন, মার্কস নাগরিক সমাজকে শুধুমাত্র একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পর্যবসিত করার জন্যই আধুনিক পুঁজিবাদকে বুঝতে পারেন নি। তিনি এটা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন যে, নাগরিক সমাজ আসলে শুধুমাত্র বাজারি আদানপ্রদানের একটি নিরপেক্ষ জায়গা নয়, এটা ভ্রাতৃত্ববোধ ও একটি মূল্যবোধসম্পন্ন, জগৎ যাকে ধরে রাখে মানবিক আবেগ ও স্বাভাবিক ভালোবাসা।

নাগরিক সমাজ সম্পর্কে এহেন নেতিবাচক মনোভাব যা অনেকটাই এ বিষয়ে হেগেলের মতামতের সমগোত্রীয় দীর্ঘদিন পর্যন্ত ছিল নাগরিক সমাজ সম্পর্কে মার্কসীয় ভাবনার মূল কথা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে গ্রামসির কারারচনা প্রকাশিত হবার পর এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সূচিত হল। গ্রামসি মার্কস থেকে অনেকটাই সরে দাঁড়ালেন। গ্রামসি নাগরিক সমাজকে শুধুমাত্র শিল্প ব্যবসাকেন্দ্রিক একথা বললেন না। মার্কসের এই তত্ত্বের সঙ্গে তিনি একমত ছিলেন যে সমাজে শোষকশ্রেণি শোষিত শ্রেণির ওপর ক্ষমতা বিস্তার করতে হিংসার আশ্রয় নেয়। তিনি একই সঙ্গে একথাও বললেন সে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র শুধুমাত্র হিংসার মাধ্যমেই শাসন চালায় না। পুঁজিবাদ শাসন করে, বিশেষ করে সেই সমস্ত সমাজে যেখানে উদারবাদী গণতন্ত্র অবস্থান করে এবং আর্থসামাজিক উন্নয়ন বেশ উন্নত, শুধুমাত্র শক্তিপ্রদর্শনের মাধ্যমে নয়, শাসিতদের সহমত আদায়ের মধ্যমেও।

উপরোক্ত ভাবনাকে তাঁর আধিপত্যবাদের মূল তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত করে গ্রামসি এই উত্তর খুঁজতে শুরু করলেন যে, কেন পশ্চিমে ১৯১৭-এর পরে কেনো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হল না। উনি দেখালেন যে সামাজিক কাঠামো-এ দ্বিস্তরীয় উপরিতল আছে। প্রথম স্তর, নাগরিক সমাজ যার মধ্যে ব্যক্তি ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক অবস্থান করে। দ্বিতীয় স্তরে আছে রাজনৈতিক সমাজ অর্থাৎ রাষ্ট্র। এই দুই স্তর মিলিয়েই সমাজে আধিপত্য গড়ে ওঠে এবং এই বোঝাপড়ার কারণেই গ্রামসির মার্কসবাদে নাগরিক সমাজের এতটা গুরুত্ব আছে।

নাগরিক সমাজের বৃত্তে আছে চার্চ, রাজনৈতিক দল, শ্রমিক ইউনিয়ন, বিশ্ববিদ্যালয়, সংবাদপত্র ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে শাসক শ্রেণি তার মতদর্শকে অনেকে বেশি গ্রহণযোগ্য করে তোলে। শোষিত শ্রেণির কাছে মানুষ নিজেদের অজান্তেই বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রতি জ্ঞাপন করে আনুগত্য গ্রামসির মতে, রুশ দেশে শাস্ত্র বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল তার কারণ সেখানে পুঁজিবাদ ও উদারবাদী গণতন্ত্র যথেষ্ট দুর্বল থাকায় নাগরিক সমাজের অভাবে সরাসরি আক্রমণ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সফল গ্রামশি এর সামরিক উপমা করে বলেছিলেন, রাষ্ট্রের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই। কিন্তু পশ্চিমে, যেখানে নাগরিক সমাজ ও রাষ্ট্র উভয়েই যথেষ্ট উন্নত, সেখানে বিপ্লব করা অনেক বেশি জটিল, কারণ গ্রামশি আবারও একটি সামরিক উপমা ব্যবহার করে বলেছিলেন যে এই সব দেশে নাগরিক সমাজ রাষ্ট্রের রক্ষাকবচ হিসেবে, পুঁজিবাদের রক্ষাকর্তার ভূমিকা নেয়। কাজেই সশস্ত্র বিপ্লবের বিকল্প নীতি হওয়া উচিত, বিশেষ করে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে, আগে নাগরিক সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিকে আদর্শগত অবস্থান দিয়ে জয় করে তারপর রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে প্রয়াসী হওয়া।

১.৬ নতুন অভিমুখ

নাগরিক সমাজকে সাধারণভাবে দেখা হয়েছে রাষ্ট্রের প্রেক্ষিতে একটি স্বাধীন অবস্থানকারী বৃত্ত হিসেবে, বিশ্বায়ন ও নব্য-উদারবাদের সূচনা থেকে নতুন প্রশ্ন উঠে আসা শুরু হয়। শুরু হয় নতুন দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে তৈরি হওয়া আরও তীক্ষ্ণ বোঝাপড়া।

ক. রাষ্ট্র-রহিত নাগরিক সমাজ : এটি এমন একটি বৃত্ত যেখানে ব্যক্তিমানুষেরা একত্রিত হয় নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থে গোষ্ঠী তৈরি করার জন্য। এগুলিকে মূল তিনটি চরিত্রগুণে চিহ্নিত করা যায়। প্রথমত নাগরিক সমাজে অংশগ্রহণ একান্তই ঐচ্ছিক এবং তার কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়া স্বেচ্ছায় সম্ভব। দ্বিতীয়ত রাষ্ট্রের সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়ার পার্থক্য স্থির করে কিন্তু তৃতীয়ত নাগরিক সমাজ প্রাথমিকভাবে রাষ্ট্র নাগরিক সমাজের নির্দিষ্ট কাজ কী হবে তা চিহ্নিত করতে পারেনা। এই বোঝাপড়া শুধুমাত্র উদারবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই সংগঠিত হওয়া সম্ভব, কারণ সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রে এ হেন গোষ্ঠীরা যত স্বেচ্ছাসেবামূলক হোক না কেন কিছুতেই কাজ করতে পারবে না যদি তার লক্ষ্য রাষ্ট্রবিরোধী হয়।

খ. রাষ্ট্রবিরোধী নাগরিক সমাজ : সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ১৯৮৯-এটি বহুমাত্রিক এবং সামগ্রিক লক্ষ্যে উপনীত হতে নাগরিক সমাজে ব্যক্তিরা একত্রিত হয়ে বিশেষ উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে বার্লিন প্রাচীর ভেঙে পড়া—এই বিতর্ককে শক্তিশালী করল যে নাগরিক সমাজ অবশ্যই রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করে। এহেন সর্বগ্রাসী শক্তির পতনের পিছনে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করার ক্ষমতা আছে। এমনকী ইউরোপেই সেই সময় বহু এমন নাগরিক সমাজের গোষ্ঠী সক্রিয় হয় যারা মানবাধিকার, বাক্‌স্বাধীনতার আন্দোলন ইত্যাদি নিয়ে কাজ করত এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। M M Howard অবশ্য দেখিয়েছেন যে সোভিয়েত পরবর্তী পূর্ব ইউরোপ এবং রাশিয়াতে নাগরিক সমাজের বৈশিষ্ট্যই ছিল দুর্বল সংগঠন ও মানুষের বিশ্বাস অর্জন না করতে পারা। ফলে সে প্রশ্ন অবশ্যই তৈরি হল যা হল নাগরিকদের রাস্তার বিক্ষোভ ও আন্দোলন রাজনৈতিক স্থায়িত্ব অথবা সঠিক জননীতি প্রস্তুত করতে পারবে কিনা।

গ. রাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় নাগরিক সমাজ : নাগরিক সমাজকে রাষ্ট্রের বিকল্প হিসেবে দেখার জায়গায় Habermas মনে করেন যে নাগরিক সমাজ রাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে। Habermas জনমতকে নাগরিক সমাজের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে দেখেন যেখানে চিন্তা, চাহিদা, মতাদর্শ নাগরিক সমাজের অভ্যন্তরেই তৈরি হচ্ছে এবং তা রাজনৈতিক গুরুত্ব পাচ্ছে এবং তাকে রাষ্ট্রের কানে তোলা হচ্ছে যাতে তার যথাযথ কার্যকারিতা তৈরি হয়। এই বোঝাপড়ায় নব্য সামাজিক আন্দোলনকে চিহ্নিত করা হচ্ছে জনমত তৈরির সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে, যেহেতু তারা নাগরিকদের শক্তিশালী করছে স্বায়ত্ত শাসনকে বলবৎ করছে ও গনণতন্ত্রকে সুদূরপ্রসারী করছে নাগরিক সমাজ। এই দৃষ্টিকোণের মাধ্যমে নাগরিক সমাজ রাষ্ট্রের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচকের ভূমিকা পালন করে।

ঘ. রাষ্ট্রের সহযোগী নাগরিক সমাজ : এই বোঝাপড়ায় নাগরিক সমাজকে দুভাবে দেখা হয়। প্রথমত একে বহুত্ববাদের বৃত্তেও দেখা হয় এবং নাগরিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার স্বার্থে ঐক্য তৈরি করবার একটি ব্যবস্থা হিসেবেও দেখা হয়। যদিও এই বোঝাপড়ার দুটি সমস্যাও আছে। প্রথমত নাগরিক সমাজ একাধারে স্বাধীনতার কথা বলে (যা কিছুটা রাষ্ট্রবিরোধী) এবং অন্যদিকে তা আবার ভালো নাগরিক হওয়ার কথাও বলে (যা কিছুটা চারিত্রিক ভাবে রাষ্ট্র অনুযায়ী) এই দুইয়ের মধ্যে সংঘাত কী করে এড়ানো যায়? দ্বিতীয়ত, ভালো এবং খারাপ দুই রকমের নাগরিক সমাজই হতে পারে। কাজেই নাগরিক সমাজে সমর্থনের যুক্তিগুলো ব্যবহার করে হিংসা, সাম্প্রদায়িকতা, জাতিবিদ্বেষ ইত্যাদিকে সমাজের মূল কাঠামো হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে ভালো নাগরিক সমাজের গঠনের পিছনের যুক্তিগুলিকে অত্যন্ত সহজে খারাপ নাগরিক সমাজ তৈরি করবার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতেই পারে।

ঙ. রাষ্ট্রের সঙ্গে অংশীদারিত্বে নাগরিক সমাজ : এটি একটি নতুন দৃষ্টিকোণ, যার সম্পর্ক নির্দিষ্টভাবেই নব-উদারবাদের

সঙ্গে। যেহেতু রাষ্ট্র প্রশাসনিক কাজের ভারে ন্যুব্জ, রাষ্ট্রপরিচালনার কাজ নাগরিক সমাজের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। এভাবেই নাগরিক সমাজ রাষ্ট্রের অংশীদার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে এবং প্রশাসনের স্বার্থে বিভিন্ন সরকারি কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। এখানেও দুটি সমস্যা আছে : এক সরকার ও প্রশাসনের মধ্যবর্তী সীমানা ধোঁয়াটে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, দুই সে রাষ্ট্রের বিপ্রতীপে অবস্থিত হবার সাবেকী বোঝাপড়াকে অস্বীকার করে।

চ. রাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে নাগরিক সমাজ—এই ভাবনায় নাগরিক সমাজের কার্যকারিতা বিশ্বায়িত রূপ পায়। একটি নতুন শব্দবন্ধ তৈরি হয়েছে (global civil society) অর্থাৎ, বিশ্বায়িত নাগরিক সমাজ। এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল নির্দিষ্ট নীতিভিত্তিক সামাজিক আন্দোলন ও NGO। প্রথমটি মূলত কাজ করে মানবাধিকার, আবহাওয়া পরিবর্তন, HIV/AIDS ইত্যাদি নিয়ে। যেহেতু এগুলি নানা দেশের সমস্যা সেহেতু এরা নানা দেশকে ব্যবহার করে। দ্বিতীয়ত বৃহদাংশের এই জাতীয় আন্দোলনের কাজ আজকাল NGO-র মাধ্যমে সংগঠিত হয় যেহেতু NGOগুলি দেশের সীমানা অতিক্রম করে কাজ করতে পারে। সমালোচকরা অবশ্য সন্দেহের চোখে NGOগুলিকে দেখেন, কারণ তাদের মনে হয় যে এদের স্বচ্ছতার অভাব আছে ও এরা রাষ্ট্রবিরোধী কাজ সংগঠিত করে থাকে।

১.৭ নমুনা প্রশ্ন

বড় প্রশ্ন :

১। পশ্চিমে নাগরিক সমাজ সম্পর্কে উদারবাদী দৃষ্টিভঙ্গির একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা করুন।

২। বর্তমান বিশ্বে নাগরিক সমাজ সম্পর্কে নতুন অভিমুখগুলির একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা করুন।

মাঝারি প্রশ্ন :

১। নাগরিক সমাজের ধারণার বৌদ্ধিক উৎসগুলি চিহ্নিত করুন।

২। মার্কসীয় পরম্পরায় নাগরিক সমাজের স্থানটি বিশ্লেষণ করুন।

ছোট প্রশ্ন :

১। নাগরিক সমাজ বিষয়ে ফরাসি ভাবনা সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

২। গ্রামশি নাগরিক সমাজের বিষয়টিকে কীভাবে তত্ত্বায়িত করেছিলেন সেই সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

৩। 'বিশ্বায়িত নাগরিক সমাজ' বলতে কী বোঝায়?

১.৮ গ্রন্থসূচি

A. S. Kaviraj, and S. Khilnani (eds.) *Civil Society: History and Possibilities* (Cambridge: Cambridge University Press, 2001).

B. J. Cohen and A Arato. *Civil Society and Political Theory* (Cam. Mass: MIT Press, 1992).

C. A. Seligman, *The Idea of Civil Society* (New York: Free Press, 1992).

D. Michael Edwards (ed), *The Oxford Handbook of Civil Society* (Oxfoed: Oxford University Press, 2011).

E. Simone Chambers & Jeffrey Kopstein (eds.) "Civil Society and the State" in John, s. Dreyzek et al (eds.), *The Oxford Handbook of Political Theory* (Oxford: University Press, 2006).

F. Rainer Forst, "Civil Society", in Robert E. Goodin et al (eds), *A Companion to Contemporary Political Philosophy.* Second editon (West Sussex : Wiley-Blackwell, 2012).

একক ২ ☐ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য
২.২ ভূমিকা
২.৩ সনাতনী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ : জে.এস. মিল, হারবার্ট স্পেনসার
২.৪ আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ : ফ্রীডরিস ফন হায়েক, ইসাইয়া বার্লিন
২.৫ সমালোচনাধর্মী মূল্যায়ন
২.৬ নমুনা প্রশ্ন
২.৭ গ্রন্থসূচী

২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে ছাত্রছাত্রীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলির সঙ্গে পরিচিত হবেন:

- ভূমিকাতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সম্পর্কে একটি সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যাবে।
- সনাতনী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বিশেষত জে.এস. মিল ও হারবার্ট স্পেনসারের দৃষ্টিভঙ্গি।
- আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, বিশেষত ফ্রিডরিস ফন হায়েক ও ইসাইয়া বার্লিনের দৃষ্টিভঙ্গি।
- ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মূল্যায়ন।

২.২ ভূমিকা

ব্যাক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, উদারবাদের পথ ধরেই ব্যক্তি মানুষকে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করে। এই তত্ত্ব গোষ্ঠী বা সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন করে ব্যক্তিকে ও তার স্বাধীনতাকে দেখার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়। উদারবাদী এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ভাবনা রাষ্ট্রবাদের বিপরীতে ও বিরুদ্ধে অবস্থান করে। কাজেই নেতিবাচকভাবে দেখলে উদারবাদ সব ধরনের কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধাচরণ করে (বিশেষ করে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্ববাদ)। ইতিবাচক অর্থে উদারবাদ ব্যক্তির স্বার্থে, সব ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে উৎসাহ প্রদান করে। গোড়ার দিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ কিছুটা নেতিবাচক উদারবাদের রূপে গড়ে উঠেছিল যা কিনা যে কোন ধরনের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় মধ্যস্থতায় আপত্তি সৃষ্টি করে। Physiocrat (ফিসিয়োক্রেটদের)দের রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে ব্যাক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ব্যবসায়ীদের শিল্প ও ব্যবসা হাতে নেওয়ার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছিল। বাণিজ্যিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তারা laissez faire'এর (মুক্ত বাণিজ্য) দাবি তুলেছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য আধুনিক ব্যাক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (বিংশ শতাব্দী) গড়ে ওঠা শুরু করল যা থেকে উদারবাদের একটি ইতিবাচক অবস্থান ধীরে ধীরে তৈরি হয়েছে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মূল ভিত্তি ব্যক্তিমানুষের বিশেষ গুরুত্ব। মানুষকে প্রাথমিকভাবে দেখা হয় একজন ব্যক্তি হিসেবেই। এই বোঝাপড়াটি এরকম যে প্রত্যেক ব্যক্তিরই একটি নিজস্ব, অনন্য পরিচয় আছে, সুতরাং সব ব্যক্তিকেই তার নিজস্ব উপায়ে এই অনন্যতাকে প্রস্ফুটিত ও প্রকাশিত করবার সুযোগ দেওয়া উচিত। এটা বাস্তবায়িত করতে গেলে ব্যক্তিমানুষের জীবনে কোনওরকম হস্তক্ষেপ করা চলবে না (একমাত্র এভাবেই মুক্ত প্রতিযোগিতার তত্ত্বকে বজায় রাখা সম্ভব ও যোগ্যতম হিসেবে টিকে থাকতে পারবে)। অথবা রাষ্ট্রকে একটি সূত্র হিসেবে ব্যবহার করতে হবে

যা প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমান সুযোগ দেবে জীবনে টিকে থাকার ও উন্নতি করবার জন্য।

সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ আলোচকেরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ভূমি তৈরি করেছিলেন, যখন তাঁরা রাষ্ট্র গড়ে ওঠার পিছনে ব্যক্তির ভূমিকাকে গুরুত্ব দেওয়া শুরু করেছিলেন। এমনকী হব্‌সের মত ব্যক্তি, যিনি শেষ অবধি সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের কথাই বলে গিয়েছিলেন, উনিও শুরুতে এ কথাই বলেছিলেন যে রাষ্ট্র তৈরি হয়েছে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধের পরিস্থিতিতে থাকা এক পরিবেশে মানুষের মধ্যে বোঝাপড়ার মাধ্যমে। জন লক যখন সাংবিধানিক সরকারের কথা বলেন তখন তিনি শুরু করেন সমস্ত ব্যক্তির নিজের জীবনজীবিকা ও স্বাধীনতার ওপরে স্বাভাবিক অধিকার থাকার প্রশ্ন দিয়ে। G. S. Sabine (জি এস স্যাবাইন) বলেন যে একটি স্থায়ী সমাজ গড়ে তুলতে গেলে তার ভিত হতে হবে ব্যক্তিমানুষ, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, তার সুখ, উন্নতি সর্বোপরি তার যুক্তিবোধ। C. B. Macpherson (সি. বি ম্যাকফারসন) এই জাতীয় প্রাথমিক স্তরের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে এক ধরনের অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ আখ্যা দিয়েছেন। উনি এই অধিকারবোধের কথা বলেছিলেন, কারণ তাঁর মনে হয়েছিল যে এক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজেই তার নিজের মালিক, সমাজকে তার দেওয়ার কিছুই থাকতে পারে না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রাথমিক বোঝাপড়া অনেকটা পরিবর্তিত হল কল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণা তৈরি হওয়ার পর থেকে। এই ধারণা প্রথম তৈরি হল উনবিংশ শতাব্দীর শেষে যখন ধ্রুপদী উদারবাদ এক ভয়ানক সংকটের মুখে পড়ল। পুঁজিবাদ শক্তি অর্জন করার পরে অতি দ্রুত গতিতে শিল্পায়ন হওয়ার কারণে গরিব বড়লোকের মধ্যে সামাজিক বিভেদ গড়ে উঠল এবং অসাম্যের সমস্যা বড় হয়ে দেখা দিল। রাষ্ট্রের মধ্যস্থতা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল আর এই প্রয়োজনীয়তাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের দর্শনের পরিবর্তন করল। রাষ্ট্রের নেতিবাচক দিকের পরিবর্তে এক ইতিবাচক দিক সামনে এল এবং উদারবাদের এই নব্য চেহারা গড়ে তুলতে T H Green, L T Hobhouse, Harold Laski এবং অন্যান্যদের অবদান অনস্বীকার্য।

যদিও ১৯৭০-এর দশক অবধি এই কল্যাণকর রাষ্ট্রের ধাঁচ মোটামুটি সফলভাবেই কাজ করছিল, আশির দশকের সূচনা থেকেই, বিশেষ করে বিশ্বায়ন শুরু হওয়ার পরে, এর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করল। কল্যাণকর ব্যবস্থার জায়গায় নয়া উদারনীতিবাদ জায়গা করে নিল এবং ধ্রুপদী উদারবাদী চরিত্র আবারও ফিরে এলো। এক্ষেত্রে যেটা নতুন তা হল আগে ব্যক্তির গুরুত্ব ছিল, এখন দেখা দিল বাজারের গুরুত্ব, যার মূল কথাটি হল বাজারই ব্যক্তির কর্মকাণ্ডেরও সবচেয়ে খোলাখুলি প্রকাশ ঘটাতে সাহায্য করে।

২.২ ধ্রুপদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ : জে. এস. মিল, হার্বার্ট স্পেনসার

ক. জে এস মিল উনবিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতার তত্ত্বের শ্রেষ্ঠতম ও গণতন্ত্রের সমর্থক হিসেবে পরিচিত জে এস মিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ধ্রুপদী ভিত্তি তৈরি করে গিয়েছিলেন। রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ নির্দিষ্টভাবেই খারাপ যদিও কখনো কখনো তা অপরিহার্য। কেউ কখনোই এটা বলতে পারবেনা যে রাষ্ট্র সবসময়ই তার কাজে প্রাজ্ঞতার পরিচয় দেবে। কোনো সরকারের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞার দাবিদার হওয়ারও কোনো প্রশ্ন ওঠেনা। এ হেন পরিস্থিতিতে ব্যক্তিকে তার মত ছেড়ে দেয়া উচিত। এতে তার স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে। সমাজে প্রত্যেককে তার নিজের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করতে দেওয়া উচিত, তবে এর থেকে মিলের কাছে এ প্রশ্ন উঠে আসে যে প্রত্যেক ব্যক্তিই রাষ্ট্রে সুরক্ষা ছাড়া নিজের ইচ্ছা মত কাজ করার সুযোগ কীভাবে পাবে, যদি না আমরা এটা অসম্ভব হলেও ধরে নিই যে সমাজে কেউ কোনো দিনও অন্য কারুর ক্ষতি করবে না। মিল এটা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারেন না যে সমাজে সব সময় এরকম কিছু মানুষ থাকেন যারা বাকিদের স্বার্থবিরোধী কাজ করেন। এছাড়াও সাধারণ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও অজান্তে বা অসর্তকভাবে অন্য মানুষের ক্ষতি করে ফেলতে পারে। এই পরিস্থিতির কথা ভেবেই তিনি মানুষের কাজকে দুইভাগে বিভক্ত করলেন : (ক) যে কাজ নিজেকে কেন্দ্র করে যাকে স্বকেন্দ্রিক কাজ বলা হবে; (খ) যে কাজ অন্যকে কেন্দ্র করে যাকে

অপরকেন্দ্রিক কাজ বলা হবে। মিলের বক্তব্য অনুযায়ী স্বকেন্দ্রিক কাজের ক্ষেত্রে কোনো রাষ্ট্রশাসন বা রাজনৈতিক বক্তব্যের জায়গা নেই। কিন্তু অপরকেন্দ্রিক কাজের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে ক্ষতিকর বিষয়গুলির বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করতে হবে। বাস্তবে অবশ্য এই দুইয়ের মধ্যে ফারাক করা খুবই কঠিন কাজ। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখতে গেলে এ জাতীয় চিহ্নিতকরণ ও পার্থক্যকরণ অত্যন্ত ভ্রান্তিমূলক হতে পারে। একজন সমাজতাত্ত্বিক বলবেন, মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক জীব এবং তার সমস্ত কাজই সামাজিক কাজ। নির্দিষ্ট স্বকেন্দ্রিক কাজ কল্পনাবিলাস ছাড়া কিছুই না। এই কারণেই সমালোচকেরা এই ধরনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতাবাদকে আক্রমণ করেছেন এই বলে যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ আদর্শগতভাবে কর্মের সামাজিক কারণ ও ফলাফলকে অস্বীকার করে। সমস্ত মানুষ্যকর্মের ভিত্তিও সামাজিক ও সেহেতু ফলাফলও সামাজিক। সে কারণে সমাজ তথা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে কোনো ধরনের সামাজিক কর্ম থাকা সম্ভব নয়।

ব্যক্তিগত অবস্থানের সীমাবদ্ধতা অত্যন্ত স্বাভাবিক। তবুও এই বিষয়টি আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে এর ন্যূনতম সারবত্তা আছে কিনা দেখার জন্য। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের একটি অনুমান হল এই যে সব মানসিক ভারসাম্যযুক্ত প্রাপ্তবয়স্ক মানুষই নিজেকে সবচেয়ে ভালো বোঝে। রাষ্ট্রকে সবচেয়ে বড় নিয়ন্ত্রক হিসেবে মেনে নেওয়াটা যুক্তিবোধসম্পন্ন ব্যক্তির নিজস্ব বোঝাপড়াকে জটিল করে। রাষ্ট্র যখনই কোনোকিছুকে নিরাপত্তা দেয় বা উৎসাহিত করে, সাধারণ যৌক্তিক ব্যক্তির জন্য তখনই পরিস্থিতি খারাপ হয়। রাষ্ট্রের কাজ শুধু তাই হওয়া উচিত সমাজ থেকে বিরোধ সরানো, অসামাজিক ও অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া ইত্যাদি। রাষ্ট্র আদতে সমাজের সেই সমস্ত অংশকে নিয়ন্ত্রণ করবে যেগুলি ব্যক্তিকে তার স্বাভাবিক জীবনযাপনে বাধা দান করছে। যেহেতু রাষ্ট্র একটি পুলিশি ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করবে, এমন কাজ নির্দিষ্ট ভাবেই নেতিবাচক হতে বাধ্য; ইতিবাচক, গঠনমূলক কাজকর্ম সবই ব্যক্তিমানুষের দায়িত্ব। সাধারণভাবে ব্যক্তিমানুষের রাষ্ট্রে সাহায্য লাগে না। নিজের ভালো ব্যক্তি সবার চেয়ে বেশি বোঝে।

মিল তাঁর এই অভিনব অবস্থানকে উপযোগিতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিলেন। যদিও উপযোগিতাবাদ গড়ে তুলতে গিয়ে উনি তাঁর গুরু Bentham-এর অবস্থান থেকে অনেকটা সরে এসেছিলেন, ব্যক্তির ভালো থাকা নিয়ে তিনি যথেষ্ট ভাবিত ছিলেন। Bentham একটি বিলাস-বেদনা, সমীকরণের মাধ্যমে তাঁর উপযোগিতাবাদের ভিত তৈরি করেছিলেন, যার মূল কথা ছিল, 'সর্বাধিক মানুষের, সর্বাধিক উপকার'। Bentham-এর মতে সর্বাধিক আনন্দেই সর্বাধিক মঙ্গল ও আনন্দকে তার ব্যাপ্তিতে মাপা যায়।

ব্যক্তির হিতকে সর্বাধিক বৃত্তির বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া সত্ত্বেও মিল আনন্দকে শুধুমাত্র ব্যাপ্তির দ্বারা মাপতে চাননি। তাঁর কাছে আনন্দের গুণগত মান দেখাও জরুরি ছিল। মিলের মতে জীবনের উপলক্ষ্য বস্তুগত উপযোগিতা নয়, বরং মানবিক মর্যাদা। সেই অনুযায়ী ভোগসুখের বিভিন্ন ধরনের মধ্যে বিভেদ করা যায় মানবিক মর্যাদার মাপকাঠির ভিত্তিতে। মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর জীবন আসে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মিল দেখতে চেয়েছেন এমন একটি রাষ্ট্র যেটি ব্যক্তির উন্নতি-সাধনের পথের বাধা সরিয়ে দেবে। প্রকৃত স্বাধীনতা থেকেই মানুষের উন্নতি সম্ভব। রাষ্ট্রকে সজাগ থাকতে হবে, কেউ যেন অপরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করে বা তাদের সুন্দর জীবনযাপনের অন্তরায় না হয়। একজনের স্বাধীনতা যদি অন্যের স্বাধীনতার অন্তরায় হয় তবে সেটি নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। মিল তাঁর বই On Liberty-তে লিখেছেন 'এককভাবে বা সমষ্টিগতভাবে মানুষ অপরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে একমাত্র নিজের রক্ষার্থে। সভ্য সমাজের কোনো সদস্যের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার ওপর শক্তিপ্রয়োগ করা যেতে পারে শুধুমাত্র অপরের ক্ষতি এড়াতে।'

মিল চেয়েছেন ব্যক্তির সর্বাধিক স্বাধীন উদ্যোগ। স্বাধীন চিন্তা ও মতের সমর্থক হওয়ার কারণে, মিল কখনোই কোনো দৃষ্টিকোণের দমন সমর্থন করতেন না, সেটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মতবাদের বিরুদ্ধে হলেও। সংখ্যালঘুর ভিন্ন মত পোষণ করার অধিকারকে তুলে ধরে মিল নিঃসন্দেহে গণতন্ত্রের একটি দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। ভিন্ন মত পোষণ করার, বিরোধিতা করার, সমালোচনা করার অধিকার নিঃসন্দেহে গণতন্ত্রের বিশেষত্ব। সেই দিক থেকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ গণতন্ত্রের মধ্যেই নিহিত আছে।

(খ) হার্বার্ট স্পেন্সার : উনিশ শতকের সমাজতত্ত্বের প্রবর্তকদের মধ্যে একজন হলেন হার্বার্ট স্পেন্সার যিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন জৈব অনুরূপতা (Organicist analogy) তত্ত্বের ভাবনা উদ্ভাবন করে, যেখানে তিনি সামাজিক ও জৈবিক জীবের মধ্যে সাদৃশ্য দেখিয়েছিলেন। স্পেন্সার একজন বিখ্যাত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতাবাদী ছিলেন। তিনি সমাজ (ও রাষ্ট্রের) উৎপত্তিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ও উপযোগিতাবাদের প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যক্তির উদ্দেশ্যসাধনের বাহন।

স্পেন্সারের মতে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক স্থাপিত হয় সুবিধা অর্জন করার জন্য। মানুষ নিঃসঙ্গ জীবন ত্যাগ করে সঙ্ঘবদ্ধভাবে থাকে। কারণ সেটি তাদের পক্ষে বেশি সুবিধার হয়। তাঁর মতে ব্যক্তির গুণগত মানের ওপর সমাজের মান নির্ভর করে। তিনি বলেন সাধারণত এককের গুণ সমষ্টির গুণ নির্ধারণ করে। তিনি বলেন, সমাজকে সরকার ও সংস্কারকের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখা উচিত। একমাত্র ব্যক্তির স্বাধীনতাকে বহিরাগত শত্রুর হাত থেকে রক্ষার ক্ষমতাকে স্পেন্সার রাষ্ট্রকে দিতে রাজি ছিলেন। রাষ্ট্রের দায়িত্ব শুধুমাত্র নাগরিকদের প্রতিবেশীর অনুপ্রবেশ থেকে রক্ষা করাই নয় তাকে সমস্ত গোষ্ঠীর সঙ্গে বিদেশি আক্রমণ থেকে প্রতিরোধ করাও দায়িত্ব। ব্যক্তিকে রক্ষা করার বাইরে রাষ্ট্র আর অন্য কোনো কাজ করবে না।

স্পেনসারের মতে, মানবিক সম্পর্ক চুক্তির মাধ্যমে তৈরি হয়। রাষ্ট্র যদি এতে হস্তক্ষেপ করে তাহলে সামাজিক অবস্থার বিচ্যুতি ঘটবে ও পূর্ববর্তী অস্থির সমাজব্যবস্থায় ফিরে যাবে। Darwin-এর মত স্পেনসারও বির্তনশীল অস্তিত্বের সংগ্রামের তত্ত্ব সমর্থন করে পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে খোলা প্রতিযোগিতায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু বিবর্তন একটি অনন্ত প্রক্রিয়া। তাই যদি কখনো প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উন্নতি হয়, অন্য সময় বিবর্তন আসে অভিযোজনের মাধ্যমে। আধুনিক তাত্ত্বিকেরা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অস্তিত্ব বা নগ্ন প্রতিযোগিতার তত্ত্বকে মানেন না। এই প্রকট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে এখন বলা হয় সহযোগিতাই জীবনধারণের পথ এবং সংঘাতই মৃত্যুর রাস্তা।

জন স্টুয়ার্ট মিলের মত স্পেনসারও মনে করতেন রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় কিন্তু অশুভ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্পেনসার একটি চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সমর্থন করেন, যেখানে তাঁর মতে প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্র রক্ষকের বদলে ভক্ষক। তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থন রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের সমালোচনা দ্বারা দৃঢ় হয়েছে।

২.৪ আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতাবাদ : ফ্রীডরিষ ফন হায়েক, ইসাইয়া বার্লিন

বিংশ শতাব্দীর শেষে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রাধান্য হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ও সমষ্টিগত তত্ত্ব প্রাধান্য পেল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দুটি বিশ্বযুদ্ধ ও তার অন্তর্বর্তী পর্যায়ে ফ্যাসিবাদী শক্তির অভ্যুত্থান উদারনীতির একটি পর্বের সমাপ্তি সূচিত করল। উদীয়মান ধনতন্ত্র যেমন রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের হ্রাস দাবী করেছিল সেই একই ধনতন্ত্র অর্থনৈতিক বৈষম্য, গরিবীকরণ, বেকারত্ব, শিল্পনগরীর সঙ্গে যুক্ত বহুবিধ সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। এবং এই সমস্যাগুলরি জন্য রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের দরকার ছিল এই কারণে যে ১৯৩০-এ শুধু ফ্যাসিবাদই উদারনীতিগত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালো না, এর সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণা, যেটি সাধারণ মানুষকে সুবিধা দেবে সেটিও একটি বাধা হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু উদারনীতির কল্যাণমূলক তত্ত্বটি, যেটি ধ্রুপদী উদারবাদকে অনেকটা নমনীয় করেছিল, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের মূল বিষয়গুলির গুরত্ব কমাল না। বিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ দুটি ধারায় উজ্জীবিত হল। প্রথম ধারাটির প্রবর্তক গ্রাহাম ওয়ালাস (Graham Wallas), নর্মান এ্যাঞ্জেল (Norman Angell)। তাঁদের বক্তব্য একদিকে ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থান ও সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের স্থাপন, কেন্দ্রীভূত সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রব্যবস্থার ন্যায্যতা দিয়েছিল। তার ভিত্তিতে আধুনিক রাষ্ট্রে ক্রমবর্ধমান ক্ষমতাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। অন্যদিকে তারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে সমর্থন করেছেন বহুত্ববাদের মাধ্যমে যাঁরা ব্যক্তির এক স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলে অতি শক্তিশালী রাষ্ট্রের (যেমন ফ্যাসিবাদ বা

সোভিয়েত সমাজতন্ত্র) সমালোচনা হিসাবে গোষ্ঠী স্বাধীনতার কথা বলেছেন। অপর ধারাটি ব্যক্তি বনাম রাষ্ট্রের চিন্তার ওপর জোর দিয়েছিল, যেটি যুদ্ধোত্তর পর্বে বিশ্বায়নোত্তর বাজারের ন্যায্যতা রক্ষার সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিল।

প্রথম ধারাটি, হব্‌স থেকে মিলের (ও স্পেনসারের) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, যেটি ব্যক্তির আত্ম-সংরক্ষণের কথা বলেছে, তার থেকে পৃথক। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পরিবর্তিত অবস্থায়, দার্শনিক ও রাজনীতিবিদদের দৃষ্টি ব্যক্তি থেকে সমষ্টির দিকে সরে গেল। আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের রাজনীতির প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়াল 'মানুষ বনাম রাষ্ট্র' নয় বরং 'গোষ্ঠী বনাম রাষ্ট্র'।

গ্রাহাম ওয়ালাস, তাঁর বই Human Nature in Politics-এ রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চার একটি নতুন দিক প্রবর্তন করলেন, যেটি রাজনীতিকে বোঝার ক্ষেত্রে একটি নয়া-বাস্তববাদের দাবি তৈরি করল। সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ওয়ালাস এই মত পোষণ কললেন যে মানুষ সম্পূর্ণভাবে যুক্তিবাদী জীব নয় ও মানুষের রাজনৈতিক কর্ম সম্পূর্ণভাবে যুক্তি ও স্বার্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। তিনি বললেন, 'মনুষ্য চরিত্র সাধারণভাবে ব্যাখ্যার জন্য অনেক বেশি জটিল'। সুতরাং ওয়ালাস শুধুমাত্র মানুষের সমস্যার সমষ্টিগত বা রাষ্ট্রিক ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে ছিলেন না (রাষ্ট্র মানুষের সব সমস্যার সমাধান করতে পারে বলে তিনি মনে করতেন না) তার সঙ্গে তিনি ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদতের মুক্ত বাজার (laizsez faire) নীতির, যেটি শুধুমাত্র মানুষের অর্থনৈতিক স্বার্থের ওপর জোর দিত, তার বিরুদ্ধাচারণ করেছেন। রাষ্ট্রিক বিশ্লেষণ তিনি মানুষের কী রকম ব্যবহার করা উচিত সেটি না ভেবে জোর দিয়েছেন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মানুষের প্রকৃত ব্যবহারের ওপর (এর মধ্যে দিয়ে তিনি ব্যাবহারিক বিশ্লেষণের অবদান রেখে যান)। আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ক্ষেত্রে, গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দৃঢ় মত পোষণ করা হয়। রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার বিরুদ্ধে এক বা একাধিক সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্য হয়ে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ওপর তিনি জোর দিয়েছেন। সামাজিক দলগুলি যাদের নিজেদের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও স্বার্থ আছে যেগুলি রাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে। অন্য ধারাটি নতুন পরিস্থিতিতে ধ্রুপদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছিল। এর দুই প্রবর্তক ফ্রেডরিক ভন হায়েক ও ইসায়া বার্লিন, যাঁরা ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বীকৃতির ওপর জোর দিয়েছিলেন এবং অ-রাষ্ট্রবাদের পক্ষে মতপোষণ করেছিলেন।

ক. ফ্রেডরিক ভন হায়েক : The Road to Serfdom বইতে বিশিষ্ট অস্ট্রিয়ান অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক হায়েক বলেছেন যেকোনও সার্বিক প্রকল্প ও সমাজ নিয়ন্ত্রণের সমষ্টিগত প্রচেষ্টা শুধুমাত্র অত্যাচার ও পীড়নের দিকে ও দাসত্বের দিকে মানুষকে নিয়ে যাবে। তিনি বইটি শেষ করেছেন এই কথাগুলি দিয়ে যে 'ব্যক্তির স্বাধীনতাই একমাত্র প্রগতিশীল পন্থা এই স্থায়ী নীতিটি উনিশ শতকেও যেমন সত্যি ছিল আজও তেমনি এর মধ্যে দিয়ে তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের একটি আধুনিক ও নতুন দিক প্রবর্তন করলেন। আজকের নয়া-উদারনীতিবাদ হায়েকের সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শনের কাছে ঋণী।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ নতুন জীবন পেল, যদিও পরিবর্তিত রূপে, নয়াউদারনীতিবাদের মধ্যে দিয়ে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি Ronald Reagan ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী Margaret Thatcher এই নয়া-উদারনীতির মূল রাজনৈতিক পরামর্শদাতা। এই মতবাদের দার্শনিক সূত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ বছরগুলিতে পাওয়া যায়, যখন হায়েক তাঁর বইটি লেখেন। এটি লক্ষণীয় যে প্রকাশের চার দশক পরেও এই বইটি নয়া-দক্ষিণবাদী চরম অ-রাষ্ট্রিক, বাজার ভিত্তিক, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী নীতির দার্শনিক ভিত্তি হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। নয়া দক্ষিণপন্থা রাষ্ট্রকে পিছিয়ে যেতে বলে। রাষ্ট্রের কল্যাণকর হওয়ার দরকার নেই। নয়া দক্ষিণপন্থা রক্ষণশীল বিশ্বসৃষ্টির মতবাদ, যেটি বাজার, স্বাতন্ত্র্য ও সর্বশক্তিমান রাজ্যের সংমিশ্রণ। এখন নয়া দক্ষিণপন্থা নয়া উদারনীতির সঙ্গে সমার্থক হয়ে গিয়েছে। উনিশ শতকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মত নয়া উদারনীতিবিদরাও বিশ্বাস করেন যে অনিয়ন্ত্রিত বাজারই দক্ষতার, বৃদ্ধি ও ব্যাপক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে। হায়েক বাজার ব্যবস্থায় ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি কার্ল পপারের মত সমাজতন্ত্র ও সমষ্টিনীতির সমালোচক ছিলেন। এড্রু ভিনসেন্ট এই পরিপ্রেক্ষিতে সুন্দর মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন লক থেকে হায়েকের উদারনীতির কেন্দ্রে রয়েছে এই বিশ্বাস যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যক্তি স্বাধীনতার সূচক, সম্পত্তি দৈহিক

অধিকারের প্রসারণ, যেটিকে যথেচ্ছ রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের থেকে রক্ষা করতে হবে, সেটি সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রই বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা যাই হোক না কেন। এই কারণে হায়েককে নয়া-উদারনীতিবাদের দার্শনিক বলে দেখা হয়।

খ. ইসায়া বার্লিন : বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত ব্রিটিশ উদারনীতিবিদ ইসায়া বার্লিন উদারনীতির একটি নতুন ধারণা তৈরি করলেন স্বাধীনতার ধারণার মাধ্যমে। সাধারণ উদারনীতির ধারণা যে ব্যক্তির স্বাধীনতাকে অরাষ্ট্রিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে, যা থেকে সরে গিয়ে বার্লিন স্বাধীনতার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকের মধ্যে পার্থক্য করলেন ১৯৫৮-এ লেখা তাঁর বিখ্যাত একটি প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে। নেতিবাচক স্বাধীনতা বলতে তিনি মনে করেছেন ব্যক্তির বাইরের বাধার অভাব, অর্থাৎ, ব্যক্তি যা করতে চায় সেখানে বাধা না এলে সে স্বাধীন। ইতিবাচক স্বাধীনতার অর্থ ব্যক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ ব্যক্তি তার নিজের ভবিতব্য নির্ধারণ করতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। সুতরাং নেতিবাচক স্বাধীনতা কিছুর অনুপস্থিতি (অর্থাৎ অন্যদের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ) ও ইতিবাচক স্বাধীনতা কিছুর উপস্থিতি (অর্থাৎ নিজের নিয়ন্ত্রণ, স্ব-নির্ধারণ) বোঝায়। বার্লিনের ভাষায়, স্বাধীনতার নেতিবাচক ধারণা এই প্রশ্নের উত্তর চায়: কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা দলকে ছাড়া হবে বা ছাড়া উচিত যেখানে সে অন্য হস্তক্ষেপ ছাড়া কিছু হতে বা করতে পারবে। অপরদিকে ইতিবাচক ধারণাটিতে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর চাই। কী বা কে, হস্তক্ষেপের উৎস সেটি নির্ধারণ করে কে কী হবে বা হবে না। এই ক্ষেত্রে বার্লিন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন স্বাধীনতার ইতিবাচক দিকের কর্তৃত্ববাচক দৃষ্টিকোণের প্রতি। স্বনিয়ন্ত্রণ ও সমাজ গঠনকারী বিষয়গুলির ইতিবাচক নির্ধারণের নামে যারা ক্ষমতাশীল তারা বিরুদ্ধতা দমন, সংখ্যালঘুর মতবাদের দমন এবং ক্ষমতার অভ্যাসের দ্বারা রাষ্ট্রক্ষমতার অপব্যবহার করে। প্রকৃতপক্ষে চরম উদারনীতিবিদ হিসাবে এটি বার্লিনের ঠান্ডা যুদ্ধকালীন সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের সমালোচনা, যে সময় ব্যক্তিস্বাধীনতার বিকৃতি ও প্রতিবাদের দমন সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশেষভাবে ঘটেছিল।

২.৫ সমালোচনাধর্মী মূল্যায়ন

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের দর্শন, যেটি উদারনীতিবাদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, অনেক পথ পেরিয়ে এসেছে। এটির কেন্দ্রে আছে স্বাধীনতার ধারণা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, যেটি কোনো নিয়ন্ত্রণের বাইরে, বিশেষ করে রাষ্ট্রের। ঐতিহাসিকভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ইংল্যান্ডে সপ্তদশ শতাব্দীতে গৌরবময় বিপ্লবের পর উদ্ভব হয়। ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধ ও লকের Second Treatise যে বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল সেটি প্রকাশ পেল একদিকে সংসদীয় সরকারের মধ্য দিয়ে ও অন্যদিকে সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার, জীবন ও সম্পত্তির অধিকারের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রকাশে। কিন্তু Leo Strauss, Michael Oakeshott ও C B Macpherson-রা হব্‌সের লেখার মধ্যে উদারনৈতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের আসল ভিত্তি খুঁজে পেলেন। হব্‌সের মতে মানুষ সব কাজ নিজের স্বার্থে করে। আকাঙ্ক্ষিত বস্তু স্বভাবতই স্বল্প ও সেইজন্যই মানুষের জীবনে চরম উত্তম বা সম্পূর্ণ শেষ বলে কিছু নেই। বাস্তবে মানুষ তার চিরপরিবর্তনশীল আকাঙ্ক্ষার পিছনে ছোটে। হব্‌সের উদারনৈতিক মনোভাব তাঁর সমতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে যেখানে তিনি তাঁর প্রাকৃতিক রাজ্যে প্রত্যেক মানুষকে সমানাধিকার দিয়েছেন এবং বংশানুক্রমিক ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলকে অস্বীকার করেছেন। লিও স্ট্রস যেমন দেখেছেন, হব্‌সীয় রাজনৈতিক তত্ত্বে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে সীমাবদ্ধ হয়েছে ব্যক্তির আত্ম-সংরক্ষণের স্বাভাবিক ও অন্তর্নিহিত অধিকারে, আবার লকের মতে নাগরিক সমাজ হচ্ছে স্বাধীন মানুষের সমাজ যারা আইনের চোখে সমান, একে অপরের সঙ্গে নিঃস্বার্থ সম্পর্কে যুক্ত এবং পরস্পরের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন। এই ধারণাগুলির মধ্যে দিয়ে ইংল্যান্ডের প্রথমদিকের তত্ত্ববিদরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রধান সূত্রগুলো দেননি শুধু তার সঙ্গে উদার গণতন্ত্রের উপাদানগুলি দিয়েছেন। জে এস মিল, হার্বার্ট স্পেনসারের ধারণাতে, যেগুলি প্রধানত স্বাধীনতার ধারণা, এগুলি আরো উন্নত হয়েছিল।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রধান গুণ স্ব-নির্ভরতার ওপর জোর দেওয়া। অপ্রয়োজনীয় সরকারি নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধাচরণ ও

সরকারি সাহায্যের নির্ভরশীলতা থেকে বিরত করার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা ব্যক্তির গুরুত্বকে তুলে ধরেছিলেন। লকের সময় থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মূলে ছিল স্বাধীনতাকে অনমনীয় ভাবে রক্ষা করা। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পতন, বিশ্বায়ন ও সত্তরের দশকে পশ্চিমী দেশগুলিতে কল্যাণকর ব্যবস্থার অসাফল্যের ফলে নয়া দক্ষিণবাদের জন্ম হয়, যার মূলে আছে চরম অরাষ্ট্রিকতা। এর ফলে বিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবি আরো দৃঢ় হল এবং এটি নয়া উদারনীতিবাদের সঙ্গে প্রায় সমার্থক হয়ে গেল। আজকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অরাষ্ট্রিক নয় কিন্তু এটি নয়া উদারনীতিবাদের থেকে নিজের দৃঢ়ত্ব রক্ষা করতে পারেনা, কারণ এর বাজারনীতি অরষ্ট্রিকতরাই যুক্তিগত প্রসারণ। কিন্তু নয়া উদারনীতিবাদের উত্থান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে একটি বড়ো প্রশ্নের সম্মুখীন করে। যেহেতু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা, বাজারের ব্যাপক আধিপত্য কি এই মূল্যবোধকে ব্যাহত করে না কারণ ব্যক্তি অনিয়ন্ত্রিত বাজারের সম্মুখে সম্পূর্ণ শক্তিহীন।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতাবাদের প্রধান দুর্বলতা তার সমষ্টিগত প্রচেষ্টার অবহেলা। সহযোগিতা ও সমষ্টিগত কর্ম গণতন্ত্রের প্রধান ভিত্তি। যতদিন মানবসমাজে স্তর ভাগ থাকবে এবং সেইজন্য মানুষ নানারকম অসুবিধা ভোগ করবে ততদিন সরকারের ভূমিকা খর্ব করা অযৌক্তিক। দরিদ্র, শক্তিহীন ও নিপীড়িত মানুষ আরও বেশি পীড়িত হবে যদি রাষ্ট্রের কল্যাণকর কার্য যেমন অর্থ ও খাদ্যের সহায়তার ক্ষমতার হ্রাস করার দাবী করা হয়। অমর্ত্য সেন তাঁর লেখায় এই প্রশ্ন বহুবার তুলেছেন ও এই মত পোষণ করেছেন যে মানুষ যখন অসাম্যের শিকার হয় তখন ন্যায়ের প্রধান তত্ত্বটি অস্বীকার করা হয়। এই একই মত John Rawls পোষণ করেছেন।

৩.১ নমুনা প্রশ্ন

বড় প্রশ্ন :

১। সনাতনী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী পরম্পরা সম্পর্কে একটি রচনা লিখুন।

২। ফ্রেডরিক ফন হায়েক এবং ইসাইয়া বার্লিনের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের একটি পর্যালোচনা করুন।

মাঝারি প্রশ্ন :

১। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিকাশে জে. এস. মিল-এর অবদানের উপরে একটি টীকা লিখুন।

২। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দর্শনের একটি সমালোচনামূলক মূল্যায়ন করুন।

ছোট প্রশ্ন :

১। হারবার্ট স্পেনসারকে একজন সনাতনী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী কেন বলা হয়?

২। ইসাইয়া বার্লিনের মতে স্বাধীনতার দুটি ধারণা কী?

৩। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ত্রুটিগুলি কী কী?

২.৭ গ্রন্থসূচি

A. Andrew Vincent: *Modern Political Idelogies.* Third edtion (West Sussex: Wiley-Blackwell, 2010).

B. Steven Lukes : *Individualism* (Essex: Basil Blackwell, 1973).

C. Isaiah Berlin : *Four Essays on Liberty* (Oxford: Oxford University Press, 1969).

একক ৩ ☐ রক্ষণশীলতাবাদ

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য
৩.২ ভূমিকা
৩.৩ মূল ভাবনা
৩.৪ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
৩.৫ রাজনৈতিক তাৎপর্য
৩.৬ সমালোচনামূলক মূল্যায়ন
৩.৭ নমুনা প্রশ্ন
৩.৮ গ্রন্থসূচি

৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে ছাত্রছাত্রীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলির সঙ্গে পরিচিত হবেন:

- ভূমিকাতে রক্ষণশীলতাবাদ সম্পর্কে একটি সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যাবে।
- রক্ষণশীলতাবাদের কেন্দ্রীয় ধারণাসমূহ।
- রক্ষণশীলতাবাদের একটি ঐতিহাসিক পরিচিতি।
- রক্ষণশীলতাবাদের রাজনৈতিক তাৎপর্য।
- রক্ষণশীলতাবাদের মূল্যায়ন।

৩.২ ভূমিকা

যদিও রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে রক্ষণশীলতাবাদকে সাধারণত পরিবর্তন বিরোধী হিসেবে দেখা হয় তবুও এর চরিত্র অনুধাবন কর সহজ কাজ নয়। এই সমস্যার মূল কারণ হল এই যে এই আদর্শটি তত্ত্ব হিসেবে বারংবার নিজের চরিত্র পাল্টেছে ইতিহাসে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। যদিও ইউরোপের জন্ম মূলত ফরাসি বিপ্লবের পরে যারা সাবেকি ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার পক্ষে ছিলেন তাদের হাত ধরে, Andrew Vincent দেখিয়েছেন যে, রক্ষণশীলতাবাদের বিষয়ে অন্তত পাঁচটি পৃথক ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব। ফ্রান্সে শব্দটি প্রথম ব্যবহার হয় 'Chateaubriand' এর পত্রিকা 'Le Conservateur' এ, ১৮২০ সালে। ব্রিটেন এর ব্যবহার হয় ১৮৩০ সালে 'Questerly Review পত্রিকাটিতে। এভাবে এই তত্ত্বের প্রথম ভাবনা তৈরি হয়, প্রাথমিক ভাবে, কিছু আধা সামন্ততান্ত্রিক পৃথিবী ও অভিজাতদের রাজনৈতিক তত্ত্ব হিসেবে, যারা ফরাসি বিপ্লবের বিরুদ্ধে ছিলেন। এই তত্ত্ব এমন এক শ্রেণিকে প্রভাবিত করেছিল যাদের শতাধিক ও বেশি সময় ধরে অবনতি হচ্ছিল (১৭৯০-১৯১৪)। দ্বিতীয়ত এটিকে বাস্তবসম্মত রাজনৈতিক প্রজ্ঞা হিসেবেও দেখা হয়, সেটি আবার বর্তমান ব্যবস্থাকেই রাষ্ট্র বা স্বাধীনতার ভাবনার দ্বারা পরিচালিত হয়ে সমর্থন করে। তৃতীয়ত এই তত্ত্ব কোন আদর্শের কথা বলে না, বরং বলে সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক রূপকে অটুট রাখার কথা। চতুর্থত, রক্ষণশীতাবাদকে মনে করা হয় জীবনের স্বাভাবিক অঙ্গ। এবং সেই কারণে যা কিছু বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত ও বা অভ্যাসবসত স্বাভাবিক, সেই সমস্ত কিছুরই পক্ষেও তা পরিবর্তনের বিরোধী। শেষে, আলোকায়ন উদারবাদের সূচনা ও বিপ্লবী ভাবনার প্রসার

রক্ষণশীলতাকে সৃষ্টি করেছিল। মানুষ সমাজে পরিবর্তন আনতে পারে যুক্তিবোধের ভিত্তিতে, বা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে পারে ও তার জন্য গতানুগতিক কায়েমী স্বার্থ বহাল থাকা চামচের ব্যবস্থা ও ক্ষমতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলা হবে—এমন ভাবনার বিরোধিতা করে রক্ষণশীলতাবাদের উদ্ভব হয়েছিল, যা প্রশ্ন করে মানুষের হস্তক্ষেপের ভাবনাকেই।

৩.৩ মূল ভাবনা

Anthony Quinton রক্ষণশীলবাদের অর্ন্তনিহিত তিনটি ভিত্তিকে চিহ্নিত করেছেন যেগুলি হল : সনাতনবাদ, সংশয়বাদ, এবং জৈববাদ। প্রথমত, সনাতনবাদ বিশ্বাস করে যে পরিবর্তন অস্থিরতাবাদের সূচক, এবং অপ্রয়োজনীয়, বিশেষ করে তা যদি হঠাৎ করে সংগঠিত হয়। এতে জীবনের ছন্দ নষ্ট হয় ও সমাজের স্থায়িত্ব ও নিয়মনীতিকে অস্পষ্ট করে দেয়। তবুও, রক্ষণশীলতাবাদ সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তনবিরোধী একথা বলা যাবে না। Edmund Burke, ব্রিটিশ রক্ষণশীলতার এক প্রধান প্রবক্তা, বলেছিলেন যে রাষ্ট্রের টিকে থাকার জন্য কিছু পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তবে এই পরিবর্তনকে হতে হবে সময়সাপেক্ষ, যাতে পরিবর্তনের হিসেবের বাইরের অংশটিকে, যাকে নিয়ে আগে থেকে পরিকল্পনা করা যায় না, তার মোকাবিলা করা যাবে। রক্ষণশীলতাবাদ বিশেষ করে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বিরোধী, কারণ তা, হিংসা, নৈরাজ্য অস্থায়িত্ব ইত্যাদির কথা বলে।

দ্বিতীয়ত, রক্ষণশীলতাবাদ নতুনভাবে একান্ত রাজনৈতিক জ্ঞান বা পরীক্ষামূলকভাবে রাজনৈতিক প্রয়োগের ব্যাপারে তীব্র সন্দেহপ্রবণ। অতীতের পুরনো পরীক্ষিত ব্যবহারেই সে বিশ্বাস রাখে। সে মনে করে যে প্রশাসনিক কাজ তাকেই সাজে যার প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে। সেই কারণে উদারবাদের সমালোচনা করে এই মতাদর্শ।

তৃতীয়ত, রক্ষণশীলতাবাদের মূল ভিত্তি এই ভাবনা যে সমাজ ও মানুষ একে অপরের সঙ্গে জৈবিক ভাবে সম্পর্কিত। রক্ষণশীলতা যেহেতু প্রচণ্ডভাবে জাতীয়তাবাদী, এবং সেই কারণে এটি মানব ঐক্য বা বিশ্বজনীনতার যেহেতু প্রচণ্ডভাবে জাতীয়তাবাদের বিরোধী, সেই কারণে এটি মানবঐক্য বা বিশ্বজনীনতার ভাবনার বিরোধী।

৩.৪ ঐতিহাসিক অবলোকন

যদিও ফরাসি বিপ্লবকেই এই রক্ষণশীল ভাবধারার ঐতিহাসিক সূত্র হিসেবে গণ্য করা হয় Russell Kirk, প্লেটো এই দৃষ্টিভঙ্গির পৃষ্ঠপোষক বলে মনে করেন। মধ্যযুগে ঈশ্বরের বরপ্রাপ্ত রাজতন্ত্রের বিষয়টি যখন চালু হয়ে গেল, সরকারের ভাবনাকে পুষ্ট করল ঐশ্বরিক ভাবনা এবং অ-প্রতিরোধ ও নিষ্ক্রিয় আনুগত্যকে মনে করা হল ধর্মীয় কর্তব্য, তা শক্তিশালী করল রক্ষণশীলতাবাদকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে David Hume একে আরো এগিয়ে নিয়ে গেলেন। ১৭৮৯-১৯১৪ রক্ষণশীলতার ইতিহাসের এই পর্বে Edmund Burke এর রচনার মধ্য দিয়ে এই চিন্তাধারা আরো পরিপুষ্ঠী হল। তাঁর মতে ফরাসি বিপ্লব যে .... স্বপন দেখিয়েছিল তা মেনে নেওয়া যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই মতাদর্শগত বোঝাপড়া অন্য এক উজ্জ্বলতা নিয়ে পৌঁছলো। Mathew Arnold, Thomas Carlyle, Henry Maine এবং W.H. Lecky, ব্রিটেনে তাঁদের লেখাপত্রের মাধ্যমে এই আলোচনা এগিয়ে নিয়ে গেলেন, যেখানে প্রতিফলিত হয়েছিল জনসাধারণের ভোটে অধিকারের ধারণার প্রতি গভীর সংশয়।

রক্ষণশীলতাবাদের প্রবক্তাদের ভাবনায় একটি পার্থক্য করা হয় 'জনসাধারণ' ও 'আম-জনতার' মধ্যে। তাঁদের মতে, যাঁদের বিষয়সম্পত্তি আছে, তাঁদের অধিকার আছে প্রতিনিধিত্ব করার কারণ তাঁরাই 'জনসাধারণের' প্রতিনিধি। কিন্তু এই অধিকার থাকবে না অশিক্ষিত 'আম-জনতার'। এই চিন্তার পূর্বানুমানটি হল যে সমাজের স্থায়িত্ব ও মঙ্গলের বিষয়টি সম্পত্তির মালিকানার সঙ্গে সম্পর্কিত।

আশ্চর্যজনক ভাবে রক্ষণশীলতাবাদের পুঁজিবাদ বিরোধী একটি দিকও আছে। Justus Moeser, Coleridge, William Cobbett, T. S. Eliot প্রমুখেরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ ও শিল্পায়নের সমালোচনা করেছেন, এই বলে যে আদতে বিজ্ঞানের উন্নতির কথা বলে সমাজের ক্ষতি করা হচ্ছে, কারণ এর ফলে সমাজব্যবস্থা, পরম্পরা ও ধর্মের ভাবনার ক্ষয়ক্ষতি ঘটছে। রক্ষণশীলতাবাদের ঐতিহাসিক উৎস তাই একাধিক এবং এককথায় সেগুলিকে বিন্যস্ত করা যায় না। Andrew Uincent রক্ষণশীলতাবাদের পাঁচ ধরনের প্রকার বিশ্লেষণ করেছেন।

ক. সনাতনী রক্ষণশীলতাবাদ : এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের আচার, আচরণ ও সাবেকি ধারণাগুলিকে টিকিয়ে রাখা। Edmund Burc ছিলেন এর প্রধান তাত্ত্বিক। এরা মনে করেন যে রাষ্ট্র একটি কৌম ও জৈবিক প্রয়োগের অভিব্যক্তি। সংবিধান কোনও মনুষ্যসৃষ্ট বিষয় নয়। বরং সমাজের ঐতিহ্যের বহমানতার জন্যই হয়। নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব এবং স্তরায়ন প্রকৃতিগত বিষয়, যার পবিত্রতাকে প্রশ্ন করা যাবে না।

খ. রোমান্টিক রক্ষণশীলতাবাদ : জার্মান তাত্ত্বিক, Moeser ও Novalis এবং ইংরেজ রক্ষণশীল, Wordsworth, Walter Scoot ও T. S. Eliot এর মূল প্রবক্তা ছিলেন। যেহেতু এরা শিল্পায়িত পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্নতার অভিজ্ঞতার শরিক ছিলেন, সেহেতু এরা স্বপ্ন দেখতেন এক আধা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার, যেখানে জীবন হবে সরল, ধর্মীয় ও গোষ্ঠীবদ্ধ, যেখানে স্বার্থপর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ নয়, প্রাধান্য পাবে পিতৃতান্ত্রিক রক্ষণশীলতাবাদ।

গ. পিতৃতান্ত্রিক রক্ষণশীলতাবাদ : নাগরিকদের মঙ্গলের স্বার্থে রক্ষণশীলবাদের এই ধারাটি পুষ্ট হয়েছিল ব্রিটেনে, যার মূল কথা হল যে, রাষ্ট্র মানুষ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা এড়াতে পারে না। মানুষের পড়া, কাজের পরিবেশ বেতন গরিবের চিকিৎসা, এসবই তাদের দায়িত্ব। এই ভাবনা থ্যাচারবাদেরও সমালোচক, কারণ এটি উপেক্ষা করেছিল রক্ষণশীলতাবাদের রাজনৈতিক দিককে, যেহেতু এটি অগ্রাধিকার দিয়েছিল অর্থনৈতিক দিককে।

ঘ. উদারবাদী রক্ষণশীলতাবাদ : পিতৃতান্ত্রিক রক্ষণশীলতাবাদের একেবারে বিপরীতে এই ধরনের রক্ষণশীলতা। রাজনীতির তুলনায় অর্থনীতিতে গুরুত্ব দিয়ে এরা মনে করেন ব্যক্তিমানুষের নেতিবাচক স্বাধীনতা, ব্যক্তির অধিকার এবং রাষ্ট্রের ন্যূনতম ভূমিকাই হল শেষ কথা। Friedrich Hayck এই তত্ত্বের মূল প্রবক্তা। এর মূল কথা সম্পত্তির অধিকার, যার সঙ্গে সম্পর্কিত এডমাণ্ড বার্কের ভাবনা।

ঙ. নয়া দক্ষিণপন্থী রক্ষণশীলতাবাদ : উদারবাদী রক্ষণশীলতার পরিপন্থী এই ধারণাটিও পঞ্চাশের দশকের সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী নিকটবর্তী যার প্রবক্তা ছিলেন লিও স্ট্রাউস, ফ্রেডরিক হায়েক ও মাইকেল ওকলট এঁরা রক্ষণশীলবাদ, পূর্বেই বলা হয়েছে, সমাজতন্ত্র ও ৬০ এবং ৭০-এর দশকে কেইনসীয় কল্যাণে রাষ্ট্রের সমালোচক নয়া রক্ষণশীলরা আবার নয়া দক্ষিণপন্থীদের বাজারমুখী দৃষ্টিভঙ্গিকে ভাল চেখে দেখে না। তাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হল জাতীয়তাবাদী গরিমা,দেশপ্রেম, দেশজ সংস্কৃতি, জাতির বিশুদ্ধতা, স্বাভাবিক বৈষম্য, শৃংখলাবদ্ধ পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব, পিতৃতান্ত্রিক কর্তৃত্ব এবং আবশ্যিক খ্রিস্টীয় ধর্মীয় শিক্ষা—এবং এঁর প্রবক্তারা হলেন Roger Scrutton, Irvin Kristol, Russell Kirk ও Maurice Cowling।

৩.৫ রাজনৈতিক তাৎপর্য

ক. ধর্ম : রক্ষণশীলতাবাদ চার্চকে রাষ্ট্রের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে দেখে। ধর্ম সামাজিক জীবনের মূল ভিত্তি, যেমনটি বলেছিলেন বার্ক।

খ. সম্পত্তি : সম্পত্তি সম্পর্কে রক্ষণশীলদের ধারণা, অন্যান্য দক্ষিণপন্থী রক্ষণশীলদের থেকে কিছুটা আলাদা। সম্পত্তির ক্ষেত্রে অধিকারের পাশাপাশি দায়িত্বও আছে। এরা কর-এর পক্ষে কারণ রাষ্ট্রই সম্পত্তিকে রক্ষা করে। নীতিগতবাবে রক্ষণশীলতাবাদ সম্পত্তির ভাবনাকে সমর্থন করে, যেহেতু এটি স্বনির্ভরতা ও স্বাধীনতার ভাবনাকে

স্বীকার করে, যেখানে কল্যাণতন্ত্র কিছু পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করে নিষ্ক্রিয়তা ও জড়তাকে প্রশ্রয় দেয়।

গ. জাতি : রক্ষণশীলবাদ, পূর্বেই বলা হয়েছে, বিশ্বজনীন মানবসমাজে বিশ্বাসী নয়। এরা বরং অনেক বেশি জাতীয়তাবাদী। অন্যের দেশ দখল করে উন্নয়ন করা কিন্তু এদের নীতি নয়, যদি না এর মধ্যে নিহিত থাকে কোনও পারস্পরিক বিবাদ বা সংঘর্ষ নিরসনের ভাবনা।

ঘ. আইন ও সংবিধান : রক্ষণশীলরা মনে করেন আইন, আচার ও রীতির প্রতিফলন যার উৎস কোন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। কাজেই রক্ষণশীলতাবাদ মনে করে আইনকে সম্মান দিতেই হবে। সংবিধান সেই এক যুক্তিতে সর্বোচ্চ আইন ও পবিত্র এবং তার পরিবর্তন একেবারে ধীরে ধীরে করা উচিত। এই যুক্তি অনুযায়ী, আইন ও সংবিধান ঐতিহাসিকভাবে সিদ্ধ ও অনাবশ্যক কারণে এই নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলা বা এর বিরুদ্ধাচারণ করা ঠিক নয়।

ঙ. স্বাধীনতা, সাম্য, গণতন্ত্র : রক্ষণশীলতা এই ধারণাগুলিকে নীতি হিসেবে নয়, ইতিহাসগতভাবে মান্যতা দেয়। যেহেতু এঁরা সরকারকে চূড়ান্ত ক্ষমতা দেবার পক্ষপাতী নন, এবং সনাতনী ক্রমাগত স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দেয়, ব্যক্তির এবং এন.জি.ও.-দের জন্য এঁরা একটি ক্ষেত্র উন্মুক্ত রাখতে চান। সাম্যের প্রশ্নেও রক্ষণশীলতাবাদ ন্যায়ের সঙ্গে সাম্যকে এক করে দেখতে চায় না এবং সাম্যকে একটি সর্বজনীন নীতি হিসেবেও দেখে না। তাঁদের কাছে ন্যায় হল একটি পদ্ধতিগত বিষয় এবং সবাই বিচারের দ্বারে পৌঁছতে পারছেন কী না সেই প্রশ্নটি নিয়েই ভাবিত। অর্থাৎ, সাম্যের সামাজিক-অর্থনৈতিক সারবত্তার বিষয়টি এঁদের কাছে উপেক্ষিত।

৩.৬ সমালোচনামূলক মূল্যায়ন

রক্ষণশীলতার সমালোচনা একাধিকভাবে করা হয়। তার ভিত্তিটি হল রক্ষণশীলবাদের তাত্ত্বিক অবস্থান, যার ভিত্তি হল সনাতনী ভাবনা, সংশয় ও জৈববাদ। প্রথমত, এঁদের ঐতিহ্যবাদী অবস্থান পুরোটাই ইতিহাসবিরোধী ও কল্পনাশ্রিত। এছাড়াও পরিবর্তনের রাজনীতিতে এই পরিবর্তনকে বিচার করার মাপকাঠি কী হবে, সে বিষয়টিও স্পষ্ট নয়। বড় ও ছোট পরিবর্তনের পার্থক্যের সীমানাও স্পষ্ট নয়। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক বিশ্বাসের প্রতি সংশয়ের বিষয়টি সমালোচকরা মানতে পারেন না। এটি এমন একটি ভাবনা যা, প্রশ্নকে অনুসন্ধিৎসা কে অপছন্দ করে ও মতাদর্শকে ও বদ্ধ চিন্তাকে প্রশ্রয় দেয়। তাছাড়া, এই ধারণা একেবারেই অবৈজ্ঞানিক, যা সংশয়বাদের নামে উৎসাহিত করে একধরনের অনমনীয়তাকে এবং নিরুৎসাহ করে নমনীয়তা ও মুক্তচিন্তার ভাবনাকে।

তৃতীয়ত জৈববাদের ধারণাকে সমালোচকরা প্রশ্ন করেন এই ভিত্তিতে যে এর ফলে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে ব্যক্তির ভূমিকাকে এই মতবাদ অস্বীকার করে। জৈববাদ উৎসাহ দেয় এক ধরনের সর্বনিয়ন্ত্রণবাদকেই শুধু নয়, এটি এই সত্যকেও অস্বীকার করে যে মানুষ পরিস্থিতির ফসল একথা মেনে নিয়েও খেয়াল রাখা দরকার যে কর্তা হিসেবে মানুষও তার পরিস্থিতিকে তার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বলাতে পারে, তাকে একটি নির্দিষ্ট রূপ দিতে সক্ষম হয়।

৩.৭ নমুনা প্রশ্ন

বড় প্রশ্ন :

১। রক্ষণশীলতাবাদের ঐতিহাসিক অবলোকনের পর্যালোচনা করুন।

২। রক্ষণশীলতাবাদের রাজনৈতিক তাৎপর্যের একটি পর্যালোচনা করুন।

মাঝারি প্রশ্ন :

১। রক্ষণশীলতাবাদের অন্তর্গত মূল ভাবধারাগুলির পর্যালোচনা করুন।

২। রক্ষণশীলতাবাদের একটি সমালোচনামূলক মূল্যায়ন করুন।

ছোট প্রশ্ন :

১। জৈববাদ রক্ষণশীলতাবাদের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত?

২। রোমান্টিক রক্ষণশীলতাবাদ বলতে কী বোঝায়?

৩। সনাতন পরম্পরাকে রক্ষণশীলতাবাদ কীভাবে মান্যতা দেয়?

৩.৮ গ্রন্থসূচি

A. Andrew Vincent: *Modern Political Idelogies.* Third edtion (West Sussex: Wiley-Blackwell, 2010).

B. Jerry Z. Muller (ed), *Convervatims. An Anthology of Social and Political Thought from David Hume to the Present* (Princeton, N. J: Princeton University Press, 1997).

C. Anthony Quinton, "Conservatism" in Robert E. Goodin et al (eds), *A Companion to Contemporary Political Philosophy.* Second edition (West Sussex: Wiley-Blackwell, 2012).

একক ৪ ☐ ধর্মনিরপেক্ষতা

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য
৪.২ ভূমিকা
৪.৩ ধর্মনিরপেক্ষতা ও আধুনিকতা
৪.৪ ধর্মনিরপেক্ষতার বিভিন্ন মাত্রা
৪.৫ ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা : কয়েকটি প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি
৪.৬ নমুনা প্রশ্ন
৪.৭ গ্রন্থসূচী

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে ছাত্রছাত্রীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলির সঙ্গে পরিচিত হবেন:

- ভূমিকাতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সম্পর্কে একটি সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যাবে।
- ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও আধুনিকতার সম্পর্ক।
- ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিভিন্ন দিক।
- ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি।

৪.২ ভূমিকা

Shorter Oxford English Dictionary ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞা এইভাবে নিরূপণ করে : বিশ্ববোধ চার্চ ও ধর্মবোধ থেকে স্বতন্ত্র। এটি সাধারণত নেতিবাচক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, যার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে অ-যাজকীয়, অ-পবিত্র ও অ-ধর্মীয় ভাবনা। যা ধর্ম বা ধর্মীয় ব্যাপারের সম্বন্ধে নিজেকে জড়ায় না তাই ধর্মনিরপেক্ষ। ধর্মনিরপেক্ষতার পরিধি জাগতিক। সেই একই অভিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে বোঝান হয়েছে সেই মতবাদকে যা মনে করে নৈতিকতা শুধুমাত্র মনুষ্য জাতির এই জীবনের হিতের উপর নির্ভরশীল থাকবে এবং ঈশ্বরচিন্তা বা কাল্পনিক ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করবে না। কিছুকে বা কাউকে ধর্মনিরপেক্ষ তাকে ঐশ্বরিক বা আধ্যাত্মিক জগত থেকে ঐহিক বা জাগতিক অবস্থায় আসতে হবে।

অভিধানের সংজ্ঞাটি খুব পরিষ্কার। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সাধারণত এই সংজ্ঞাটিকেই গ্রহণ করেন। ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে তাঁরা বোঝেন যে ধর্ম ঐহিক ব্যাপারের মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করবে না এবং এই বিশ্বাস সাধারণত রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষতা রাখার চিন্তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

'Secularism' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন ব্রিটিশ লেখক জর্জ জেকব হলিওক ১৮৫১ সালে। তিনি এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন একটি সমাজব্যবস্থার ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করতে এবং বিশেষভাবে ধর্মীয় বিশ্বাসকে কড়া সমালোচনা না করে খারিজ করতে। তিনি নিজে সংজ্ঞাবাদী ছিলেন এবং এই মত পোষণ করতেন 'ধর্মনিরপেক্ষতা খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধ মতবাদ নয়, এটি তার থেকে স্বাধীন। এটি খ্রিস্টধর্মের ধারণাকে প্রশ্ন করে না; অন্য ধারণা প্রকাশ করে। ধর্মনিরপেক্ষতা কোথাও কোন দিশা নেই এমন কথা বলে না, বরং সেই দিশা একমাত্র সেই সত্যের মধ্যে আছে

যা লোকায়ত, যার শর্ত ও বিধান স্বাধীন ও চিরকালীন। লোকায়ত জ্ঞান সেই বিশেষ জ্ঞান যা মনুষ্যজীবনের মধ্যে নিহিত, যেটি মানুষের হিতসাধন করে জীবনধারণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়, এবং এই জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে হয় পরীক্ষিত।' Barry Kosmin ধর্মনিরপেক্ষতাকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন : কঠোর ও কোমল ধর্মনিরপেক্ষতা। কঠোর ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন সেই ধর্মীয় ধারণাগুলি যেগুলি জ্ঞানতত্ত্বের বিচারে অবৈধ, কারণ সেগুলি কোনরকম যুক্তি বা অভিজ্ঞতা সঞ্জাত নয়। কোমল ধর্মনিরপেক্ষতা বিশ্বাস করে সম্পূর্ণ সত্য উদ্ঘাটন কখনো করা যায় না, সুতরাং ধর্মের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াইয়ে না নেমে সংশয়বাদ ও সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গিই বিজ্ঞান ও ধর্মের আলোচনার ভিত্তি হওয়া উচিত।

৪.৩ ধর্মনিরপেক্ষতা ও আধুনিকতা

ধর্মনিরপেক্ষতাকে পশ্চিমী আধুনিকতার সঙ্গে সংযুক্ত সামাজিক-সাংস্কৃতিক ধারণার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করা হয়। কিন্তু এটির বৌদ্ধিক সূত্র পাওয়া যায় মার্কাস আরেলিয়াস ও এপিকিউরাসের মত গ্রীক ও রোমান দার্শনিকের চিন্তায়, দিদেরো, স্পিনোজা বা লকের মত Enlightenment যুগের চিন্তাবিদদের মধ্যে, বা রবার্ট ইঙ্গারসোল ও বার্টর‍্যান্ড রাসেলের মত যুক্তিচিন্তাবিদ ও নাস্তিকতাবাদীদের চিন্তার মধ্যে। যদিও ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে সাধারণভাবে ভাবা হয় যে এটি অ-ধর্মীয়, সুতরাং ঈশ্বরবাদী, এটি ঠিক ধারণা নয়। এটি ধর্মকে লক্ষ্যবিন্দু করে না এবং সুতরাং এটি ধর্মবিরোধী নয়। বরং এটি অ-ধর্মীয় (non-religious) বলা যেতে পারে।

রেনেসাঁসের ধর্মনিরপেক্ষতার আবির্ভাব য়ুরোপে। পঞ্চাদশ শতাব্দীতে ধ্রুপদী সংস্কৃতি ও শিক্ষার যে পুনরুজ্জীবন হল, সেটি প্রাচীন গ্রিস থেকে প্রেরণা পেয়েছিল। সেটি আধুনিকতাকে নিয়ে এল। ধর্মনিরপেক্ষতা ও আধুনিকতা এই দুটি প্রক্রিয়াই মানুষের সামাজিক সম্পর্কের যুক্তিবাদী ও সমতাবাদী দিককে এবং এটি বিশেষ গুরুত্ব দেয় ধর্মনিরপেক্ষতাকে দিব্যতন্ত্র থেকে আলাদা করে। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে সামন্ততান্ত্রিক ধর্মব্যবস্থার অবনতি হতে আরম্ভ করল ও তার জায়গায় আধুনিক যুক্তিবাদী ব্যবস্থা ধীরে ধীরে রূপ নিতে শুরু করল। এই অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতাই আধুনিক ও তদ্ববিপরীত। কার্যত, কোন মানুষ তার দৃষ্টিভঙ্গীতে যুক্তিবাদী ও আধুনিক না হলে ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না। যুক্তিবাদী মানুষ যুক্তির ভিত্তিতে বিচার করে ও কার্যকারণ ঠিক করে। আধুনিক যুক্তিবাদী মানুষ যা যুক্তিনির্ভর নয় তা স্বীকার করে না। সন্দেহ তৈরি হলে এবং সেই সম্বন্ধে নিঃসংশয় হলে (যতদূর নিঃসংশয় হওয়া যায়) সেটি গ্রহণ করা হয়। যেহেতু ধর্ম ঈশ্বর বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে, তাই ধর্ম ব্যক্তিগত ও সর্বসাধারণের আওতার মধ্যে পরে না। আধুনিক যুক্তিবাদী মানুষ ধর্মীয় বিষয়কে জনসাধারণের বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে না। আধুনিক মানুষের কাছে ধর্ম জাগতিক বিষয়ে মাথা ঘামাবে না। এইজন্যই আধুনিক মানুষ ধর্মনিরপেক্ষ। তার প্রাত্যহিক কার্যকলাপে এই আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ অ-ধর্মীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু সে নিরীশ্বরবাদী হবে এমন কোনো কথা নেই।

যন্ত্রসভ্যতার যুগে এই ন-ধর্মীয় শক্তি ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে উঠল। যতই ধর্মনিরপেক্ষতা শক্তিমান হতে লাগল, ততই ঐহিক বিষয়ে (বিশেষত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে) ধর্মের প্রভাব কমতে লাগল। উদারনৈতিক চিন্তা ও সংস্কৃতির বিস্তার ধর্মনিরপেক্ষতাকে শক্তিশালী করল। শিল্পবিপ্লব ও ফরাসি বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে যে নতুন রাজনৈতিক ধারণার জন্ম দিচ্ছিল তার বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মনিরপেক্ষ সমালোচনা। আধুনিকতা, শিল্পায়ন, ধর্মনিরপেক্ষতা ও উদারনৈতিক সংস্কৃতির ধারণা পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। এ্যাল্ডু হেউড বলেছেন, 'উদারনীতির একটি বৈশিষ্ট্য সম্প্রদায় ও ব্যক্তির বিভাজন। এর ফলে সর্বসাধারণের বৃত্ত, যেখানে মানুষ স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছায় কাজ করতে পারে, তার একটি স্পষ্ট ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। এর ফলে ধর্মের ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ অর্থ তৈরি হচ্ছে যা থেকে ধর্মকে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সীমিত করা হচ্ছে, ও জনজীবনকে সম্পূর্ণভাবে ধর্মনিরপেক্ষ করে গড়ে তোলা হচ্ছে।' হেউড আরো বলেন যে ধর্মকে ব্যক্তিগত

ক্ষেত্রে সীমিত করার ফলে, ধর্মনিরপেক্ষতা ব্যক্তি-জনপরিসর ভাবনাকে আরো এগিয়ে নিয়ে গেছে রাজনীতি ও ধর্মের ক্ষেত্রের বিভাজনের দিকে। এবং আমরা জানি যে আধুনিকতার একটি দাবি (যেটি মেকিয়াভেলি ও রেনেশাঁসের বহু দার্শনিকের লেখাতে পাই) হচ্ছে রাজনীতি ও ধর্মের মধ্যে স্পষ্ট বিভাজন রক্ষা করা সুতরাং আমরা আবার বলতে পারি যে ধর্মনিরপেক্ষতাই আধুনিক। আধুনিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার এই পরস্পর সম্পর্কসূত্র বিশেষভাবে আমরা মেকিয়াভেলির লেখার মধ্যে পাই। তিনি যেমন আধুনিকতার প্রথম প্রতিনিধি, একই সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন ধর্ম (ব্যক্তিগত) ও রাজনীতির (সর্বসাধারণের) সম্পূর্ণ বিভাজনে।

৪.৪ ধর্মনিরপেক্ষতার মাত্রা

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে আধুনিক সমাজের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের অবনতি ঘটে। ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মের অনুশাসনের হ্রাসকে চিহ্নিত করে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে কিছু ঐতিহ্যগত ও অপ্রচলিত বিশ্বাস ও প্রথা হিসাবে ধর্ম অদৃশ্যপ্রায় হয়ে গেছে। কারণ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি চলে যাচ্ছে না। বিভিন্ন দেশের প্রতিষ্ঠিত ধর্মগুলি ছাড়াও, অসংখ্য ধর্মীয় গোষ্ঠী সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। সমাজতাত্ত্বিকদের সমীক্ষা অনুযায়ী দেখা গেছে বহুসংখ্যক মানুষ ধর্মবিশ্বাসী বা ধার্মিক। সুতরাং আজকের যুগে ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতার সম্পর্ক বুঝতে গেলে তাদের বিভিন্ন মাত্রাগুলি জানতে হবে।

বিশিষ্ট ব্রিটিশ সমাজবিজানী অ্যান্টনি গিডেনস্ ধর্মের ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া ও ধর্মনিরপেক্ষতার বৃদ্ধির সম্পর্কের প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার তিনটি দিক দেখিয়েছেন।

(ক) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সদস্যের মান : উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কত মানুষ মন্দির, মসজিদ বা চার্চে যান তার কোনো প্রামাণ্য পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। কিন্তু উন্নত দেশগুলিতে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের হ্রাস সম্বন্ধে পরিসংখ্যান পাওয়া যয়।

(খ) সামাজিক প্রভাব : সনাতনী সমাজে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি খুব প্রভাবশালী. কিন্তু আধুনিক যুগে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের আগের প্রভাব অনেকাংশে হারিয়েছে।

(গ) ধর্মভাব : ধর্মভাবাপন্ন মানুষ হয়ত নিয়মিতভাবে মন্দির, মজজিদ বা চার্চে যান না। অপরদিকে, যাঁরা নিয়মিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যান তাঁরা ধর্মভাবাপন্ন নাও হতে পারেন। সেইজন্যই মানুষের ধার্মিকতার হিসাব করা শক্ত। সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক গবেষণা দেখাচ্ছে যে বহুসংখ্যক মানুষ প্রথাগতভাবে প্রার্থনা বা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করলেও গভীর ধর্মবোধ পোষণ করেন না। অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মবোধ বা ধর্মীয় বিশ্বাস ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি শিথিল ভাবনা দেখা যায়।

উপরোক্ত তিনটি মাত্রা থেকে বোঝা যায় যে যদিও মানুষের ধর্মবোধের সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া শক্ত, ধর্ম যে তার প্রভাব হারাচ্ছে সেটি বোঝা যায়। গিডেনস্-এর মতে 'যদিও ধর্মের প্রভাব অনেকটাই কমে গেছে, এই কথা বলা যায় না যে ধর্ম অদৃশ্য হবার মুখে।' এইভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা ধীর ধীরে শক্তিশালী হচ্ছে। ধর্মের মৃত্যু হয়নি, কিন্তু সনাতনী সমাজের তুলনায় আজকের সমাজে ধর্মবিশ্বাসের আকর্ষণ অনেক হ্রাস পেয়েছে।

একটি মত আছে যে ইসলামের পুনরুজ্জীবন ও মৌলবাদের ফলে ধর্মনিরপেক্ষতার অগ্রগতির ধারা ব্যাহত হচ্ছে। এই মত অনুযায়ী আগামী দিনে ধর্মনিরপেক্ষ বিরোধ ও দ্বন্দ্বের তুলনায় ধর্মীয় সংঘর্ষ ও ধর্মযুদ্ধ অনেক বড় আকার ধারণ করবে। এই প্রসঙ্গে আমরা স্যামুয়েল হান্টিংটনের The Clash of Civilizations and Making of World Order বইটির কথা উল্লেখ করতে পারি। সেখানে তিনি এই মত পোষণ করেছেন যে একবিংশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ ও যুদ্ধ বাধবে ইসলামীয় বা খ্রিস্টধর্মের মত উন্নত সভ্যতাগুলির মধ্যে। যখন সংঘর্ষগুলি ধর্মীয় গোষ্ঠী প্রতিযোগিতায় পর্যবসিত হয় (যেমন মধ্য-এশিয়ার ইসলাম ও খ্রিস্টান পশ্চিম) তখন আর বলা যায় না যে ধর্মনিরপেক্ষতর প্রভাব

বাড়ছে বা ধর্মের প্রভাব কমে যাচ্ছে। তবে এই তত্ত্ব এখনো পরীক্ষিত নয়। বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষতার অগ্রগতি নিয়ে সন্দেহের কোনো কারণ নেই।

ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ এমনি একটি ব্যবস্থা যেটি পৃথিবী সম্বন্ধে বিশেষ একটি দৃষ্টিকোণকে ও সেখানে মানুষের ভূমিকাকে স্বীকার করে না। এটি বহুত্ববাদে স্বীকার করে এবং ব্যক্তিগত বিচারে বিশ্বাস করে। এটি বিশ্বাস করে ব্যক্তির ও গোষ্ঠীর প্রতি সম্ভ্রমে, মানুষের সমানাধিকারে, জাত ও শ্রেণির সীমানাকে অস্বীকার করে। যদিও এটি একটি প্রগতিশীল মতবাদ সমালোচকরা এটিকে অনেক সময় স্তালিনবাদ ও নাৎসীবাদের সঙ্গে সংযুক্ত করেন এবং ধর্মনিরপেক্ষতাকে নিরীশ্বরবাদ বলে অভিহিত করেন।

৪.৫ ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা : কয়েকটি প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি

আমরা জানি, ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার একধরনের আধুনিকতার প্রবর্তন করেছিল যার ফলে ন্যূনতম পরিকাঠামোর সাহায্যে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ চালানো যায়। রেলপথের প্রবর্তন, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা ও বিচারব্যবস্থার প্রবর্তন ছিল আধুনিকীকরণের কার্যক্রম। বিশিষ্ট ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানী এম.এন. শ্রীনিবাসের মতে, ব্রিটিশ শাসন ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় ও সংস্কৃতিতে কিছুটা ধর্মনিরপেক্ষতা প্রবর্তন করেছিল নগরের বিকাশ এসেছিল যেটি যোগাযোগ ব্যস্তার উন্নতি, যুক্ত ছিল স্থানিক বিকাশ সচলতা ও শিক্ষার বিস্তারের মধ্য দিয়ে শক্তিলাভ করল। শ্রীনিবাস আরো বলেন যে দুটি বিশ্বযুদ্ধ ও মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন, যার ফলে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে সাধারণ মানুষের সচলতা বেড়েছিল, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসার ঘটিয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী পর্বে ধর্মনিরপেক্ষতার পথ দ্রুতগতিতে আরো গভীর ও ব্যাপক হল। প্রথমত ভারতবর্ষকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করা হল। একদিকে ১৯৭৬ সালের (৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে যেখানে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি সংবিধানর প্রস্তাবনায় যোগ হল); অপরদিকে, সমানাধিকার, ধর্মীয় অধিকার ইত্যাদিকে সংবিধানে স্বীকৃতি দিয়ে, এবং অপরদিকে সর্বজনীন ভোটাধিকার ও অন্যদিকে সরকার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের মধ্য দিয়ে। (পঞ্চায়েতী রাজ প্রকল্প)।

ধর্মনিরপেক্ষতার একটি বিশেষমাত্রা যুক্তিবাদ যার ফলে পুরাতন বিশ্বাস ও ধারণাকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তার দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়। গ্রামাঞ্চলেও জাতিভেদের রাজনীতিকরণ ও লোকায়ত সাংস্কৃতিক প্রভাব সামাজিক জীবনকে অনেক মুক্ত করেছে। পবিত্রতা অপবিত্রতার ধারণার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। যেখানে দলিত ও অন্ত্যজরা জাতপাতের দ্বন্দ্বের শিকার হয়েছে, সেখানেও বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের শোষণও রাজনৈতিক শক্তি ও দ্বন্দ্বের মোড়কে দেখা দিয়েছে, অর্থাৎ ধর্মনিরপক্ষ ভাবনার প্রকাশ হিসাবে।

সাম্প্রতিকালে ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয় ঘিরে প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। মোটামুটিভাবে এর দুটি বিপরীত ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে। একদিকে আশিস নন্দী, টি. এন. মদন ও তাঁদের অনুগামীরা উত্তর উপনিবেশবাদের সূত্র ধরে বলেন, জওহরলাল নেহরু যে ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কথা ভেবেছিলেন সেটি ঔপনিবশিক মনোভাব প্রসূত, কারণ আধুনিকতার পশ্চিমী ধারণা, যার মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার অবস্থান, অ-পশ্চিমী সমাজ সম্পর্কে বিশেষভাবে আধিপত্যগামী মনোভাবের পরিচায়ক। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতার পশ্চিমী ধারণাকে সমালোচনা না করে স্বীকার করার অর্থ আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণকে আইনসম্মত স্বীকৃতি দেওয়া। তার ফলে, এই দৃষ্টিভঙ্গি ভারতবর্ষের একান্ত নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করে না, যার অন্তর্নিহিত অর্থকে ধর্মনিরপেক্ষতার মত আধুনিক পশ্চিমী বিষয় দ্বারা বোঝা যায় না। অপর মতবাদ ডি.ই. স্মিথ ও অমর্ত্য সেনের মত তাত্ত্বিকরা পোষণ করেন। স্মিথ তাঁর বিশিষ্ট রচনা India as a Secular State-এ ধর্মনিরপক্ষ রাষ্ট্র বলতে বুঝেছেন : ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সেই রাষ্ট্র যা তার নাগরিকদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়, সাংবিধানিকভাবে কোনো বিশেষ ধর্মের সঙ্গে নিজে যুক্ত থাকে না, কোনো ধর্মপ্রচারে হস্তক্ষেপ করে না এবং নাগরিকদের ধর্ম নির্বিশেষে চালনা করে। এটি পরিষ্কার যে অনেকের মতো স্মিথও ধর্মের ব্যাপারে জোর

দিয়েছেন। কিন্তু আবার স্মিথ এই জায়গায় জোর দিয়েছেন যে শুধুমাত্র রাষ্ট্রর থেকে ধর্মকে আলাদা করা মানেই ধর্মীয় স্বাধীনতা নয়। বাস্তবে রাষ্ট্র ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ বিভাজন হয়ত নাও থাকতে পারে। এবং স্মিথের মতে ভারতবর্ষে এই বিভাজন নেই। কিন্তু ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার সর্বোচ্চ নিদর্শন পাওয়া যায় এইখানে যে ভারতবর্ষের কোনো রাষ্ট্রীয় ধর্ম নেই, এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ধর্ম হিসাবে হিন্দুধর্মকে কোনোরকম সাংবিধানক স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। অপরদিকে বড় ও প্রভাবশালী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপস্থিতি ভারতীয় রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতাকে আরো শক্তিশালী করেছে। স্মিথ লিখেছেন, 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের স্বাভাবিক ধারক।' স্মিথ যথার্থভাবেই নেহরুকে ধর্মনিরপেক্ষতার একজন বড় রক্ষক হিসাবে অভিহিত করেছেন। ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নেহেরু দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং সেটিই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ধর্মনিরপেক্ষতার শক্ত ভিত্তি।

অমর্ত্য সেনও নেহরুর ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশংসা করেছেন। 'Seculerism and its discontents' নামক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে ধর্মনিরপেক্ষতার সমালোচনা যে ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণির চিন্তার অংশ হয়ে উঠছে এটি একটি সদর্থক ভাবনা। ধর্মনিরপেক্ষতার মত মতবাদ মানুষকে সরাসরিভাবে প্রভাবিত করে। তাই এই বিষয়ে বিতর্ক ভারতের গণতন্ত্র সম্বন্ধে মানুষের দৃষ্টি প্রসারিত করবে। সেন মনে করেন যখন এই বিতর্কগুলি দীর্ঘকাল চলে, যখন অসন্তোষ নানাভাবে প্রকাশ পায় তার ফলে সবাই (জনপ্রতিনিধিরাও) সতর্ক থাকেন যে ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তি যেন নড়ে না যায়। সেনের মতে, ভারতবর্ষকে একটি সংঘবদ্ধ বহুত্ববাদী সমাজ হিসাবে দেখতে হবে, এবং সমানাধিকার ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে এই স্বীকৃতির গণ্য অংশ হিসেবেই গণ্য করতে হবে।

৪.৬ নমুনা প্রশ্ন

বড় প্রশ্ন :

১। ধর্মনিরপেক্ষতার বিভিন্ন মাত্রাগুলির একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা করুন।

২। ধর্মনিরপেক্ষতা ও আধুনিকতার সম্পর্ক বিষয়ে একটি টীকা লিখুন।

মাঝারি প্রশ্ন :

১। ধর্মনিরপেক্ষতার উদ্ভব ও অর্থ ব্যাখ্যা করুন।

২। ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ বিষয়ে কয়েকটি প্রধান ভাবনা ব্যাখ্যা করুন।

ছোট প্রশ্ন :

১। 'কঠোর' ও 'কোমল' ধর্মনিরপেক্ষতার পার্থক্য কী?

২। গিডেন্সের মতে ধর্মনিরপেক্ষতার তিনটি মাত্রা কী কী?

৩। ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার ভাবনা সম্পর্কে আশিস নন্দীর সমালোচনা কী ছিল?

৪.৭ গ্রন্থসূচি

A. Rajeev Bhargava, "Political secularism" in John s. Dryzek et al (eds), *The Oxfoed Handbook of Political Theory* Oxford University Press, 2006)

B. Rajeev Bhargava (ed), *Secularism and its Critics* (New Delhi: Oxfoex University Press, 1998).

C. Donal Smith, *India as a Secular State* (Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1963).

D. Amartya Sen, "Secularism and its Discontents" in Amartya Sen, *The Argumentative Indian. Writings on Indian History, Culture and Identity* (London : Allen Lane, 2005).

একক ১ ☐ ন্যায়বিচার

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য
১.২ ভূমিকা
১.৩ ন্যায়বিচারের অর্থ
১.৪ ন্যায়বিচারের সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত
১.৪.১ ন্যায়বিচার সম্পর্কে প্লেটোর ধারণা
১.৪.২ ন্যায়বিচার সম্পর্কে অ্যারিস্টটল
১.৪.৩ ন্যায়বিচার সম্পর্কে বার্কার-এর বিশ্লেষণ
১.৪.৪ ন্যায়বিচার সম্পর্কে রলস্-এর তত্ত্ব
১.৪.৫ ন্যায়বিচার প্রসঙ্গে অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গি
১.৫ উপসংহার
১.৬ গ্রন্থসূচী
১.৭ নমুনা প্রশ্নাবলি
১.৭.১ রচনাত্মক প্রশ্ন
১.৭.২ মাঝামাঝি উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন
১.৭.৩ সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন

১.১ উদ্দেশ্য

বর্তমান এককে রাষ্ট্রচিন্তার একটি মূল ধারণা, ন্যায়বিচার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনার উদ্দেশ্য হল :

- শিক্ষার্থী পাঠককে ন্যায়বিচারের অর্থ কি সে বিষয়ে আলোচিত করা।
- ন্যায়বিচার সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব বা মতামতগুলি সম্পর্কে রাষ্ট্রচিন্তাবিদগণের মতামতকে উপস্থিত করা
- ন্যায়বিচার সম্পর্কে অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে সংক্ষেপে উপস্থিত করা। সন্দেহ নেই বিভিন্ন তত্ত্ব মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে শিক্ষার্থী ধারণাটি সম্পর্কে নিজস্ব ভাবনাকে সঞ্চালিত করার সুযোগ পেতে পারেন।
- সমগ্র আলোচনার একটি সংক্ষিপ্তসার এবং উপসংহার দিয়ে বিষয়টির ব্যাখায় ইতি টানা।

১.২ ভূমিকা

ন্যায়বিচার রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বা রাষ্ট্রচিন্তকের (Political thinkels) দৃষ্টিতে একটি কেন্দ্রীয় ভাবনা (Central issue) হিসাবে গুরুত্ব লাভ করে প্রধানত তিনটি কারণে ঃ (১) রাষ্ট্র-রাজনীতির লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য বিচারের এটি অন্যতম প্রধান মাপকাঠি। রাষ্ট্রের আইন হোক বা জনমত যাচাইয়ের প্রশ্ন হোক কোনো ক্ষেত্রেই ন্যায়ের প্রশ্নটি উপেক্ষিত হয় না। (২) সমাজ, রাষ্ট্র বা ব্যক্তির সম্পর্কের প্রশ্নেও ন্যায়বিচার একটি ক্রিয়াশীল শক্তি (৩) আইন, স্বাধীনতা, সাম্য প্রতিটি ধারণার

মধ্যেই ন্যায়ের নীতি যুক্ত। সমতায় আদর্শ বা মান বজায় রাখা, সমন্বয়ের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ক্ষমতার উগ্রপ্রদর্শনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বা সুরক্ষার নীতি, সমাজগঠন ও মানবোন্নয়নের শক্তি, গণতন্ত্রের আলোকবর্তিকা (Search-light)—কতভাবেই না ধারণাটিকে দেখা হয়েছে। ধারণাটির কিছু সংজ্ঞার্থ (Definition) প্রদান করেই বর্তমান অধ্যায়ের (এককের) আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে। প্লেটো থেকে অ্যারিস্টট্‌ল, সফিস্ট বা স্টোয়িক দার্শনিকগণ, রোমান চিন্তাবিদ, চুক্তিবাদী তাত্ত্বিক (হব্‌স, লক, রুশো প্রমুখ), আদর্শবাদী দার্শনিক (কান্ট, হেগেল, গ্রিন), উদারবাদের ধ্রুপদি তাত্ত্বিক (বেন্থাম, জনস্টুয়ার্ট মিল), সমাজবাদের বিচিত্র ব্যাখ্যায় (বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ), নব উদারবাদীদের বিশ্লেষণে (হায়েক, রল্‌স, নজিক অন্যতম), গণতান্ত্রিক চিন্তার অন্যান্য ভাবনায় (বার্কার ও ল্যাস্কির ভাবনা উল্লেখযোগ্য) প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে এসেছে ন্যায়বিচারের কথা। ন্যায়বিচারের অর্থ যাচাই করে নিতে শিক্ষার্থী পাঠক এইসব আলোচনার সূত্র ধরেই অগ্রসর হতে পারেন।

ন্যায়বিচারের তাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের প্রাথমিক উপকরণ সন্ধানে সাহায্য করেছেন গ্রিক দার্শনিক প্লেটো (Plato) ও অ্যারিস্টট্‌ল (Aristotole)। প্লেটোর 'রিপাবলিক' (Republic) মহৎ বা ভালো জীবনের সন্ধানেই সমাজ জীবনের শ্রেষ্ঠ সংগঠন বা বিন্যাসের কথা (Best organization or order of human society) মাথায় রেখেই ন্যায়ের প্রশ্নকে এনেছেন। প্লেটোর ন্যায়ের আলোচনার পদ্ধতি হয়েছে সংলাপ বা কথোপকথন (Dialogue)। অ্যারিস্টট্‌ল তাঁর 'রাজনীতি' গ্রন্থে (Polities) ন্যায়ের পদ্ধতিগত (Procedural) প্রশ্নকে বিবেচনায় এনেছেন। ন্যায়ের প্রশ্ন বিতর্ক ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে নানা বিষয় বা সমস্যায় বিচারে এসেছে। তবে ন্যায়ের তত্ত্বকে বিশ্লেষণমূলক ও সমাজতাত্ত্বিক ভাবনায় (Analytical and Sociological theory) বিংশ শতকের প্রথমার্ধে পুষ্ট করেছেন বিশিষ্ট ইংরেজ দার্শনিক বার্কার। জন রলস্-এর (John Rawls) বণ্টনমূলক ন্যায়ের (Distributive justice) ভাবনা বার্কারের মতোই বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে একটি নতুন তাত্ত্বিক মডেল (Theoretical Model) হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্থান করে নিল। তবে হায়েক (Hayek) বা নজিক-এর (Nozik) নব উদারবাদী তত্ত্বে রল্‌স-এর ভাবনার সঙ্গে অমিলটিই লক্ষ করা যায়। ন্যায়ের প্রশ্নে মার্কসবাদীরা প্রচলিত সব ব্যাখ্যাকেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। তবে তাঁদের ভাবনায় ন্যায়ের কোনো তাত্ত্বিক কাঠামো ছিল না। ন্যায়ের প্রশ্নে আর্থিক সমতা (economic equulity) ও শ্রেণিহীন সমাজের ধারণাকেই তাঁরা মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করেছেন। নব উদারবাদের ন্যায়বিচার ভাবনার বিপরীতে বিগত শতকের শেষাশেষি কৌমবাদী তত্ত্ব (Communitarian theory) উল্লেখযোগ্য ব্যাখ্যা দিয়েছে। ন্যায়বিচারের এই তার্কিক বিতর্ক থেকেই শিক্ষার্থী পাঠক বিচার করে নিতে পারেন এক্ষেত্রে মূল সমস্যাটি কী বা এর সমাধান কীভাবে করা সম্ভব।

> জানবার কথা—রাষ্ট্র কেবলমাত্র আইনের দৃষ্টি নিয়ে চলে না, নৈতিকতা ও ন্যায়বোধের দ্বারাও পরিচালিত হয়—আর্নেস্ট বার্কার

১.৩ ন্যায়বিচারের অর্থ

ন্যায়বিচারের অর্থ বিচারে তিনটি মূল প্রশ্নকে বিবেচনার মধ্যে রাখা দরকার। প্রথমত, ন্যায়বিচার কোনো সম্পূর্ণ বা অবিমিশ্র (absolute) ধারণা নয়। এটি পরিবর্তনশীল (Dynamic) ধারণা। একটি নৈতিক মানদণ্ডে ধারণাটিকে দেখা হলেও পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুসারে এর অর্থ ভিন্নরূপ গ্রহণ করে। রাষ্ট্রতত্ত্বে ন্যায়বিচারের বহুমুখী ও গতিশীল চরিত্রটিকে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, ন্যায়বিচারের অর্থ বিচার করতে গিয়ে সাম্যকে (Equlaity) পরিমাপক হিসাবে দেখা হলেও অসাম্যের অবস্থানকেও বিচার করা প্রয়োজন বলে আধুনিক রাষ্ট্রতাত্ত্বিকেরা মনে করেন। তৃতীয়ত, ন্যায়বিচারকে স্বাধীনতা, সাম্য, নৈতিকতা, সমাজকল্যাণ, জনকল্যাণ প্রভৃতি ধারণার সঙ্গে সম্পর্ক দিয়েই বিচার করতে হবে। এটি একটি আপেক্ষিক (Relative) ধারণা।

এই সব প্রশ্নকে সামনে রেখেই ন্যায়ের বা ন্যায়বিচারের কয়েকটি অর্থ বা সংজ্ঞার্থকে উপস্থিত করা যায় :

- ন্যায় কথাটি উদ্ভব লাতিন শব্দ Jungere থেকে যার অর্থ সংযোজন, বন্ধন, মিলন (Joining, binding, fitting or tying together)।
- জাস্টিনিয়ান ইনস্টিটিউট ন্যায় বলতে বুঝেছে একটি সঠিক, সাধারণ, সুসমঞ্জস ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মানসিক অনুভূতি।
- ন্যায় হল সেই বন্ধন যা সমাজকে এক সূত্রে বাঁধে। প্রতিটি শ্রেণির আপন আপন কর্তব্য পালনের অঙ্গীকারই হল ন্যায় (প্লেটো)
- ন্যায় হল মহত্ত্বের সামগ্রিক প্রকাশ (Exercise of Goodness as a whole—Aristotle)
- ন্যায় হল সেই নীতি যা ব্যক্তিত্বের মহত্তম বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে নিয়োজিত (বার্কার)
- ব্যক্তির অধিকার বণ্টনের ক্ষেত্রে যে তিনটি নীতি কার্যকর, সেই স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর নীতিকে সংযুক্ত করে ন্যায় (বার্কার)
- রল্‌স ন্যায়বিচার বলতে বুঝেছেন সর্বার্থসাধক এক ভালো নীতির রূপায়ণ (Justice as fairness)। কেমন হবে এই নীতি? রল্‌স-এর অভিমত: সমস্ত সামাজিক মূল্যবোধ—স্বাধীনতা ও সুযোগ, আয় ও সম্পত্তি এবং আত্মমর্যাদার ভিতকে সমভাবে বণ্টন করতে হবে যদি না এই সমস্ত মূল্যবোধগুলির কোনো একটি বা সবগুলির অসম বণ্টন সবার সুবিধার্থে হয়। ('All social values—liberty and opportunity, income and wealth and the bases of self-respect are to be distributed equally unless an unequal distribution of any or all, of these values is to be everyone's advantage.' Jawn Rawls—A Theory of Justice)

ন্যায়ের (ন্যায়বিচারের) আরও কিছু তাত্ত্বিক অর্থকে রাষ্ট্রচিন্তাবিদেরা সরাসরি এবং অনেকক্ষেত্রে কিছুটা পরোক্ষভাবে পেশ করেছেন। যেমন রল্‌স-এর বামপন্থী উদারপনীতিবাদী ব্যাখ্যার বিপরীতে দাঁড়িয়ে রবার্ট নজিক বলেছেন, ন্যায়ের অর্থ কোনো সঠিক নীতির জন্য বোঝাপড়া নয়; ন্যায় হল মানুষের নিজস্ব মালিকানার অধিকারের মর্যাদা, সম্পত্তির অধিকারের স্বীকৃতি—মানুষকে তার নিজের বিষয় নিজেকে স্থির করার অধিকার দেওয়া। রাষ্ট্রের কাজ ন্যায্য বণ্টন নয়, ব্যক্তির সম্পত্তিকে হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করা।

ন্যায়বিচার সম্পর্কে অতীতে সফিস্টরা (Sophists) যা ভেবেছেন তা হল, শক্তিশালীর স্বার্থরক্ষাই ন্যায়বিচারের নীতি। প্লেটোর বন্ধু গ্লুকো (Glucon) বলেছেন, দুর্বলের ভীতি ও প্রয়োজন থেকেই ন্যায়ের উদ্ভব (Justice is the child of fear)। পেরিক্লিসের চোখে এথেন্সের গণতান্ত্রিক শাসনেই আছে ন্যায়। রোমান ডাইজেস্ট (Digest) অনুসারে আইনই হল ন্যায় অন্যায়ের শাস্ত্র। মধ্যযুগে চার্চ তথা খ্রিস্টধর্মের নীতিই ছিল ন্যায়নীতি। অষ্টাদশ শতকে ফরাসি আলোকিত ভাবনায় যুক্তির প্রসারকেই ন্যায়ের ভিত্তি বলা হয়েছে। ভলতেয়ার সামাজিক প্রগতি, রুশো গণইচ্ছা, হবহাউস বণ্টনমূলক ন্যায় ও সামাজিক ঐক্যের মধ্যেই সন্ধান করেছেন ন্যায়নীতি। মার্কসবাদ শোষণ, শ্রেণিবৈষম্য এবং অসাম্যের পরিস্থিতিতে ন্যায়ের উপস্থিতি নেই বলেই মনে করে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের নির্মাণের মধ্যেই এঁরা দেখেন ন্যায়নীতি, যার মধ্যে আছে সুশৃঙ্খল সামাজিক ব্যবস্থাপনা, উন্নত মূল্যবোধ।

> জানবার কথা—ন্যায়বিচারের শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি হল, কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ধারণাটিকে দেখা হবে।

১.৪ ন্যায়বিচার সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত

ন্যায়বিচার প্রসঙ্গে রাষ্ট্রচিন্তাবিদেরা একমত নন। এক্ষেত্রে প্রধানত আদর্শবাদ, উদারবাদ, নব-উদারবাদ, মার্কসবাদ এবং সমষ্টিবাদ—পাঁচটি মূল ধারার মতামতের সঙ্গে পরিচিত হলেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী পাঠক নিজেদের ভাবনাকে যাচাই করতে পারবেন। ন্যায়বিচার সম্পর্কে আদর্শবাদী ভাবনার দুই মূল তাত্ত্বিক হলেন প্লেটো ও অ্যারিস্টট্‌ল। এক্ষেত্রে কিছুটা উদারবাদ এবং মূলত বিশ্লেষণবাদী ও বহুত্ববাদী ব্যাখ্যার প্রতিনিধিত্ব করেছেন আর্নেস্ট বার্কার। ফ্রেডরিক হায়েক, জন রল্‌স ও রবার্ট নজিক হলেন ন্যায়বিচার ধারণার তিন নব-উদারবাদী বিশেষজ্ঞ। এঁদের বিপরীতে ন্যায়বিচারের প্রশ্নে উঠে এসেছে কৌমবাদী (Commanitarian) ও মার্কসবাদী ভাবনা। সমষ্টিবাদের ভাবনাকে প্রচার করেছেন মাইকেল ওয়ালজার (Michael Walzer), চার্লস টেলর (Charler Taylor), মাইকেল স্যান্ডেল (Michael) প্রমুখ। মার্কসবাদী তত্ত্বে প্রতিফলিত হয়েছে সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণা।

১.৪.১ ন্যায়বিচার সম্পর্কে প্লেটো

রাষ্ট্রচিন্তায় ন্যায়বিচারের ধারণাটিকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির আশ্রয়ে সুন্দরভাবে উপস্থিত করেছেন প্লেটো তাঁর 'Republic' গ্রন্থে। সমকালের রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ও রাষ্ট্রশাসনের অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে একটি আদর্শ রাষ্ট্রের ভিত্তি কি হবে সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্বের অবতারণা। সে কালের বিশিষ্ট জ্ঞানতপস্বী সক্রেটিসের বিচার ও প্রাণদন্ড তাঁকে এতটাই বিচলিত করেছে যে সমকালের শাসন ও অরাজক রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর সংশয় জেগেছে। স্পার্টা ও এথেন্সের যুদ্ধ, এথেন্সের পরাজয়, ত্রিশ অভিজাতের অত্যাচারী ও ব্যর্থ শাসন (Rule of Thirty) গণতান্ত্রিক শাসনের সংকট নিয়ে শঙ্কিত প্লেটোকে রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে জ্ঞানের জগতে,

> জানবার কথা—প্লেটোকে সক্রেটিসের মানস-পুত্র বলা হলেও সক্রেটিসের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দর্শনে প্লেটোর কোনো মোহ ছিল না। সক্রেটিসের জ্ঞানচর্চা যুক্তিতর্ক প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে মতামত যাচাই করার কৌশল তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। তাঁর সক্রেটিস বিষয়ক গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল Apologym Lrotagaras, Crito, Republic প্রভৃতি কথোপকথনের আকারে লিখিত।)

দর্শনের রাজ্যে প্রবেশের সুযোগ এনে দিল। সিসিলি, ইজিপ্ট, সায়রাকিউজ থেকে শাসনের অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এসে এথেন্সে শুরু হল তাঁর বিদ্যাচর্চা ও গবেষণা। 'আকাদেমি' গঠন করে জানার রাজ্যে প্রবেশ করা ও আকাদেমির শিক্ষার্থীদের সঙ্গে চিন্তা-বিনিময় করার যে সুযোগ তিনি পেলেন সেটাই হল সত্য ও নৈতিকতা সন্ধানের ক্ষেত্র। ন্যায়ের সন্ধানে ব্রতী হয়ে দর্শন ও নীতিজ্ঞানকে আশ্রয় করে তিনি লিখে ফেললেন তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ 'The Republic'। কথোপকথনের আকারে লিখিত এই গ্রন্থে ন্যায়নির্ভর রাষ্ট্রের এক রূপরেখা নির্মিত হল। প্লেটো এই গ্রন্থের প্রধান চরিত্র করেছেন সক্রেটিসকে। সে যুগের জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ বিশিষ্ট তার্কিক ও নীতিনিষ্ঠ মানুষ, অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাগ্মী এথেন্সের গণতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে তরুণ সমাজকে বিদ্রোহে প্ররোচিত করেন এই অভিযোগে সক্রেটিস প্রাণদন্ডে দন্ডিত হন। সক্রেটিসের সাহস, নৈতিকতা, স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং রাষ্ট্রকলা (Statecraft), শাসন ও নাগরিক জ্ঞান প্লেটোকে এতটাই অভিভূত করে যে তিনি সক্রেটিসকে মুখ্য চরিত্র ধরে রাষ্ট্র-রাজনীতির নৈতিকতা সন্ধান করেন। ন্যায়ের প্রশ্নে সক্রেটিসের সঙ্গে সফিষ্ট (Sophists), সম্ভ্রান্ত নাগরিক সেফেলাস (Cephalus) সেফেলাসের পুত্র পলিমার্কাস (Polemarchus) প্লেটোর বন্ধু গ্লুকোঁ (Glucon) সকলেই কথা বলেছেন। ন্যায়ের প্রশ্নে সক্রেটিসের (প্লেটো) প্রশ্নের জবাবে সেফেলাস বলেন, কথায় ও কাজে যিনি সত্যনিষ্ঠ এবং ঈশ্বর ও মানুষের কাছে যার কোনো দেনা নেই তিনিই ন্যায়পরায়ণ।

পলিমার্কাস প্রাথমিকভাবে বলেন, প্রত্যেক মানুষকে তার প্রাপ্য প্রদান করাই ন্যায়। তবে শেষ পর্যন্ত সক্রেটিসের যুক্তিজালে মত পরিবর্তন করে তিনি বলেন, ন্যায়নীতি হল এক উচ্চমার্গের জ্ঞান। ন্যায়ের ধর্ম মানুষের ক্ষতি করা নয়, ভালো কাজ করা। সফিস্ট দার্শনিক থ্র্যাসিমেকাসের (Thrasymechus) প্রতিবাদী মত হল, ন্যায়বিচার হল শক্তিশালীর স্বার্থরক্ষার নীতি। শাসকের চোখে অন্যায়ই ন্যায়।

প্লেটো ন্যায়বিচার সম্পর্কে সমকালের এইসব প্রতিষ্ঠিত ভাবনা প্রত্যাখ্যান করে বলেন ঃ

(১) ন্যায়ের সন্ধান করতে হবে গ্রিক নগর রাষ্ট্রের প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার (এথেনীয় গণতন্ত্র) দুর্বলতা এবং একে কীভাবে সংস্কার করা সম্ভব তার প্রেক্ষিতে। সেকালের জনপ্রিয় প্রতিনিধি সভায় নয়, তিনি সমস্যার বিচার করেছেন জনসমক্ষে, নাগরিক বিতর্কসভায়। অ্যাপোলোর মন্দিরের ডেলফির বাণী—'নিজেকে জানো' (Know thyself)—এই ধারণাকে সঙ্গে করে নিজের জীবনের নানা অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে মৃত্যুপথযাত্রী সক্রেটিস বলতে চান নৈতিকতার মধ্যেই আছে রাজনীতি এবং রাজকার্যের মতো মহৎকার্য (royal art) সমাধায় পরিচালনার দক্ষতা সঞ্চয় করতে হবে জ্ঞানের (Knowledge) মধ্যে।

(২) পরিবার প্রধান হোন, চিকিৎসক হোন, কাঠের মিস্ত্রি, শিক্ষক বা গায়ক যেই হোন না কেন তাঁদের কাজের বিচার হবে দক্ষতায়। সমস্ত গুণের মতো রাজনীতির গুণ হল জ্ঞান, যার উৎস হল ন্যায়। আইনের পথে চলা এবং অন্যায় কর্ম থেকে বিরত থাকাই হল ন্যায়বিচার।

(৩) সক্রেটিস মনে করেন ন্যায়ের সমস্যা ব্যক্তির সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ নয়, বিষয়টিকে রাষ্ট্র ও সমাজ সংগঠনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রকে সঠিকভাবে দেখালেই ব্যক্তির সঠিক অবস্থানও বোঝা যায়। সক্রেটিস অর্থাৎ প্লেটো চাইলেন যা স্বাভাবিক অর্থাৎ বড়ো অক্ষরগুলিকে (Capital Letters) আগে চেনাতে তার পর ছোটো অক্ষরগুলিকে দৃষ্টিগোচরে আনাতে।

(৪) বড়ো অক্ষর হিসাবে রাষ্ট্রকে আগে দেখাতে চান প্লেটো। কেমন এই রাষ্ট্র? প্লেটোর চোখে এই রাষ্ট্র হবে আদর্শ ন্যায়নির্ভর এক রাষ্ট্র। রাষ্ট্রেই সত্য ও সুন্দরের অবস্থান। ঐক্য, সংহতি, সমন্বয়, ভারসাম্য রক্ষাই এর কাজ। মানুষের অসংখ্য প্রয়োজন মেটাতে হয় রাষ্ট্রকে। তাই নির্ভরতা, আদানপ্রদান, সহযোগিতার নীতিতে চলে রাষ্ট্র। রাষ্ট্র প্লেটোর মতে, মানুষের যৌথ জীবনধারার এক সাংগঠনিক রূপ। শ্রমবণ্টনই রাষ্ট্রের শক্তি—আর এই শক্তি অর্জনে সাহায্য করছে সমাজের বিশাল কর্মযজ্ঞ। এই কর্মযজ্ঞে সামিল হয় তিনটি মূল শ্রেণি—উৎপাদক, যোদ্ধা ও শাসক। উৎপাদক শ্রেণি (কৃষক, কারিগর, শ্রমিক, ব্যবসায়ী) মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা মেটাবে। সামরিক বাহিনী দায়িত্ব নেবে দেশের নিরাপত্তা রক্ষার। শাসক শ্রেণির কাজ হল সুশাসন। শাসনের মধ্যে থাকবে দার্শনিকের প্রজ্ঞা ও মহত্ত্ব এবং রাজার যুক্তিবোধ সাহসিকতা ও দক্ষতা। ইনিই হলেন দার্শনিক রাজা (Philosopher king)।

(৫) যে নৈতিক গুণের উপর প্লেটোর রাষ্ট্র দাঁড়িয়ে আছে তা হল মহত্ত্ব (Wisdom), সাহস (Courage) ও মিতাচার (temperance)। কামনা বাসনা থাকলেও উৎপাদক শ্রেণি উদ্যম ও কর্মশক্তি নিয়োগ করুক। সামরিক বাহিনী পেশাদারি হলেও সাহসিকতা ও জীবনীশক্তির (spirit) প্রতীক। আর দার্শনিক রাজা হলেন মহত্ত্ব (Wisdom), যুক্তিবোধ ও বৌদ্ধিক গুণ ও দূরদৃষ্টির প্রকাশ।

(৬) রাষ্ট্রের এই তিন নৈতিক গুণাবলির উপরেও আছে একটি চতুর্থ গুণ। এই গুণ কোনো বিশেষ শ্রেণির একচেটিয়া নয়। এটি সেই গুণ যা সবার মধ্যে আছে। গ্রিক নগররাষ্ট্র, তার ঐতিহ্য ও সভ্যতা এই গুণকে লালন করেছে। এই চতুর্থ তথা সমন্বয়ী গুণটি হল ন্যায়বিচার। এই ন্যায়কেই ফিরিয়ে আনা, পুনঃস্থাপনের কথা বলেন প্লেটো।

জানবার কথা—প্লেটো মনে করেন, প্রতিটি কলার গুণ বিচার হবে তার উৎকর্ষ দিয়ে। চিকিৎসকের বিচার হবে রোগের নিরাময় গুণে ও শিক্ষকের বিচার হবে মনের বিকাশ সাধনের গুরুত্বে। শাসকের গুণ তাঁর শাসনের উৎকর্ষে। সর্বোৎকৃষ্ট শাসন ও নাগরিকের সর্বাধিক কল্যাণ সাধনই শাসকের সুশাসনের লক্ষণ। মহৎ ব্যক্তিই সুশাসনের অধিকারী। মহত্ত্ব, শক্তি ওবং সুখ ন্যায়নির্ভর শাসকের তিনটি গুণ।—প্লেটো।

প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্বের মূল কথা হল ঃ (১) গ্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র এথেন্সের সংকট রোধ করা এবং এর পূর্ব-গৌরবকে ফিরিয়ে আনা। (২) ন্যায়বিচার, কর্তব্য, নৈতিকতা, পরিচালনা, নাগরিক সম্পর্ক, আইন শৃঙ্খলা সব কিছুকেই গুরুত্ব দেবে তাঁর এই রাষ্ট্র (Republic) (৩) শাসক ও নাগরিক সকলেই এই ন্যায়ের রাষ্ট্র গড়ার কারিগর। উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিয়ে শুদ্ধ, ত্যাগী জীবনযাপনের আদর্শ মেনে চলবেন শাসক। (৪) প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র হল সেরা লোকেদের সেরা শাসন, ন্যায্য শাসন। দার্শনিকদের শাসন ও ন্যায্য আইনের শাসন প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র প্রকল্পের দুই পরিপূরক দিক। (৫) এই রাষ্ট্রে দার্শনিকেরা ক্ষমতাবান নয় বা ক্ষমতার জন্য লড়াই করেন না। এখানে ধনী-দরিদ্রের বিরোধ নেই, যুদ্ধ নেই। এই রাষ্ট্রে দার্শনিকদের জন্য জন্য রাষ্ট্র নয়, রাষ্ট্রের জন্য দার্শনিক। বন্ধু গ্লুকোঁ যখন বলেন, ভয় থেকে অরাজকতা থেকে, আতঙ্ক থেকে, মুক্ত হতে মানুষ বোঝাপড়ার ভিত্তিতে রাষ্ট্র, আইন ও ন্যায়ের পেছনে ছোটে, প্লেটো তখন বলেন, ভীতি নয়, রাষ্ট্র ও ন্যায়নীতির পেছনে আছে অন্তরের টান। (৬) প্লেটো জানেন তিনি যে আদর্শ রাষ্ট্রের কথা ভাবছেন, যে ন্যায়ের রাজ্যের কল্পনা করছেন তা চিত্রপটেই আঁকা থাকবে। বাস্তবে এর সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব নয়। রাজার ক্ষমতা যতদিন না দার্শনিকের ক্ষমতা হয়ে উঠছে, যতদিন না রাষ্ট্রক্ষমতা ও দর্শন মিলে মিশে একাকার হয়ে উঠছে, ততদিন অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকবেই এবং তাঁর এই আদর্শ রাষ্ট্র সূর্যালোক দেখবে না (Republic-V)।

সমালোচনা : প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্ব ও আদর্শ রাষ্ট্রের এই প্রকল্প সমালোচদের মতে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

(১) সমকালে সাফিস্টরা প্লেটোর তত্ত্বকে নস্যাৎ করেছেন তাঁদের গণতান্ত্রিক ভাবনার সাহায্যে। পেরিক্লিসের বন্ধু প্রোটোগোরাস (Protagoras) বলেছেন মানুষ এবং বাস্তবতার কষ্টিপাথরেই সব কিছুকে বিচার করতে হবে। প্লেটোর সক্রেটিস এই বাস্তববোধ দ্বারা পরিচালিত হন নি। সক্রেটিসের সঙ্গে বিতর্কে তিনি বলতে চেয়েছেন সব মানুষই শিক্ষা, মহত্ত্ব এবং রাজনৈতিক গুণাবলি অর্জন করতে পারে। বিশিষ্ট 'সফিস্ট' জর্জিয়াস (Georgias) সমতার মধ্যেই ন্যায়ের মনোভাব আছে বলে মনে করেন। হেলিনিক অন্তর্কলহের মধ্যে (স্পার্টা-এথেন্সের লড়াই) গ্রিসের যে সংকট তিনি দেখেছেন ঐক্য ও শান্তির মধ্যেই তার অবসান হতে পারে। থ্র্যাসিমেকাস সরাসরি প্লেটোর বিরোধিতায় নেমেছেন এবং বলেছেন রাজনীতি হল স্বার্থের ক্ষেত্র, এখানে ঈশ্বরের কোনো স্থান নেই। তাঁর কাছে সক্রেটিসের (প্লেটোর) ধর্মীয় ও নৈতিক অনুমান একরকম হঠকারিতা। তিনি চান বাস্তবের মিথ্যাকে উদ্ঘাটন করতে এবং যা কিছু খোলাখুলি সত্য তাকে উন্মোচিত করতে। ন্যায়বিচার কথাটাই তাঁর কাছে মিথ্যা এবং অবাস্তব। তিনি মনে করেন ন্যায় দুর্বলের পক্ষে নয়, শক্তিশালীর পক্ষেই দাঁড়ায়। সুতরাং রাষ্ট্র, সরকার, আইন সবই মিথ্যা। বাস্তব রাজনীতিতে সক্রেটিসের নৈতিক মানকে ব্যবহার করার অপচেষ্টাকে তিনি ভর্ৎসনা করেন। ন্যায়বিচার ও ন্যায্যতার কথা বলে বাস্তবে যা অন্যায্য তাকেই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন সক্রেটিস অর্থাৎ প্লেটো।

(২) পপার (Karl Popper) প্লেটোর তত্ত্বকে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী (Totalitaranism) আখ্যা দিয়ে বলেছেন রাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী কোনো কিছুকেই প্লেটো ন্যায়বিচার বলে মানতে পারেন না। তাঁর তত্ত্বে গণতন্ত্রের প্রতি সুবিচার করা হয়নি। শ্রেণিস্বার্থ বা সুবিধার নীতিকে তিনি প্রশ্রয় দিয়েছেন (The open Society and its Enemies,Vol-1)

(৩) ক্রসম্যান (R. H. Crossman), বার্কার, বার্ট্রান্ড রাসেল (Bertrand Russell) সকলেই প্লেটোর তত্ত্বের দুর্বলতা আবিষ্কার করেছেন। ক্রসম্যান প্লেটোর চিন্তায় উদার ভাবনার বা প্রগতির কোনো লক্ষণ দেখেন না (Plato Today)। বার্কার প্লেটোর ন্যায়বিচার প্রকল্পে আইনের স্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। রাসেলও প্লেটোর স্বৈরতান্ত্রিক ভাবনার নিন্দা করেছেন। (History of Western Philosophy)

(৪) মার্কসবাদীরা প্লেটোকে দার্শনিক ভাববাদের গুরু হিসাবে মেনে নিলেও, একথা মানতে চান না কেবলমাত্র বিরল মানুষের মধ্যেই দার্শনিক সত্তা উপস্থিত। প্লেটোর শাসক, সৈন্যদল ও অভিভাবক-রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে এই ধরনের ধাপে ধাপে অবস্থান ও অধীনতার নীতিকে তাঁরা স্বীকার করেন না। মার্কস প্লেটোর রিপাবলিকে বর্ণিত শ্রমবিভাগের নীতিকে মিশরীয় বর্ণভেদ ব্যবস্থার এথেন্সীয় আদর্শায়ন বলে বর্ণনা করেছেন (Capital, Vol-I)। শাসক শ্রেণির উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ বেশি, তাঁরা সোনার মতো মূল্যবান আর অন্যান্য শ্রেণি মূল্যের বিচারে কেউ রূপা, কেউ তামা আর লোহা—এই বিভাজন পুরাকাহিনির অনুবর্তন মাত্র।

১.৪.২ ন্যায়বিচার সম্পর্কে অ্যারিস্টট্‌ল

প্লেটোর আকাদেমির ছাত্র হলেও প্লেটোর রাজনৈতিক দর্শনের ছাপ অ্যারিস্টট্‌লের উপর তেমন ভাবে পড়েনি। বরং বলা যেতে পারে অ্যারিস্টট্‌ল ছিলেন প্লেটোর দার্শনিক প্রতিপক্ষ। রাজনীতির সঙ্গে আদর্শ ও নৈতিকতাকে মেলালেও প্লেটোর মতো আদর্শ ন্যায়ের রাজ্যের সন্ধান তিনি করেন নি। তিনি রাজনীতিবিদ্যার এক স্বাধীন মান প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, যার শুরু তাঁর Ethics রচনার সূত্রে এবং বিস্তার Politics গ্রন্থের মাধ্যমে। নীতিশাস্ত্রের জন্য তিনি দিয়েছেন সদাচারের বোধ, রাজনীতি শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় এল সুনীতির কথা। এখানেই তিনি ন্যায়বিচার সম্পর্কে প্লেটোর ভাবনার বিপরীতে স্থাপন করেছেন রাজনৈতিক ন্যায়ের (Political Justice) প্রতিপাদ্য। অ্যারিস্টটলের মতে, ন্যায়বিচার হল সদাচারের মহত্তম প্রকাশ। এটি হল আত্মা থেকে অর্জিত গুণ, যার মধ্যে নম্রতা, বদান্যতা, পৌরুষ, মহানুভবতা সব কিছুই থাকতে পারে এবং এই গুণাবলি একান্তভাবেই নীতিশাস্ত্রের বিষয়। কিন্তু রাজনীতিতে ন্যায়বিচারের প্রশ্নটি শুধুমাত্র ব্যক্তির আত্মগুণাবলির কথা নয়, মানব সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রসারিত। নীতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যায় ন্যায্যতার দুটি অর্থ করেছেন অ্যারিস্টট্‌ল—বণ্টন ভিত্তিক ন্যায় (Distributive Justice) এবং সংশোধনমূলক ন্যায় (Corrective Justice) যে ন্যায্যতার মান পাটিগণিতের নিয়ম মেনে চলে, যা সংশোধন যোগ্য (rectitude) এবং মানুষের সমান সম্পর্কের (equitable relation) উপর নির্ভরশীল। এখানে ন্যায়বিচারের মান আইন ও রাজনীতি। আইন ও রাজনীতির এই মানেই বিচার্য রাজনৈতিক নৈতিকতার কথা।

বণ্টনমূলক ন্যায়ের প্রশ্নে অ্যারিস্টটল বলেন সমাজের সাধারণ স্বার্থে মানুষের অবদান কতটা তা মেনেই স্থির হবে সুবিধা বণ্টনের নিয়ম এবং কার কতটা ভাগ তা স্থির হবে তার সম্মান, সম্পদ ও অর্থের নিরিখে। বিপরীতভাবে সংশোধনমূলক ন্যায় হল মানুষ শ্রমে কতটা সময় এবং শক্তি (গুণ) ব্যয় করে তা বিচার করে স্থির হবে দ্রব্যবণ্টনের সমতা। সংশোধনমূলক ন্যায়ের মধ্যেই বিনিময়, চুক্তি, দ্রব্যের ক্ষতি, শাস্তি ইত্যাদি থাকে। অ্যারিস্টট্‌লের ন্যায়ের এই দুটি রূপ যেন প্লেটোর সমতার দুই ধর্মকে ফিরিয়ে আনে। উভয় ক্ষেত্রেই সামাজিক-রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অসাম্যকে সমর্থন করার এক প্রবণতা লক্ষণীয়। প্লেটো যাকে বলেছেন সঠিক অসাম্য (Just inequality) অ্যারিস্টটল তাকেই বলেন অসম ন্যায় (unesual justice)

অ্যারিস্টট্‌লের ন্যায়ের এই নৈতিক দর্শন থেকেই তাঁর রাজনৈতিক তত্ত্বের তাৎপর্য এবং রাজনৈতিক ন্যায়ের স্বরূপকে চিহ্নিত করা যায়। তাঁর মতে, রাজনৈতিক ন্যায় তখনই সম্ভব যখন সমাজের স্বাধীন এবং সামাজিকভাবে সমমাত্রিক সদস্যের উপস্থিতি ঘটবে এবং এই ন্যায়ের লক্ষ্য হল এই সব মানুষের আত্মনির্ভর পরিভোগ (autarchy)। অ্যারিস্টট্‌ল রাজনৈতিক ন্যায় বলতে বোঝেন কর্তৃত্বের রাজনৈতিক রূপের এক নীতিকে (এই কর্তৃত্ব দাসের উপর প্রভু

বা সন্তানের উপর পিতার নয়)। এ হল মানুষের সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণের এক রাজনৈতিক পদ্ধতি। নীতিশাস্ত্রে অ্যারিস্টটল রাষ্ট্রব্যবস্থা ও তার বিভিন্ন রূপ নিয়ে যেখানে শেষ করেছেন, সেখান থেকেই শুরু হয়েছে তাঁর রাজনীতি শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণা। রাজনীতির এই প্রকল্পে স্থান পেল জটিল রাষ্ট্র সমগ্র, তার বিভিন্ন অঙ্গের বিভাজন এবং প্রতিটি অঙ্গের বিশেষত্ব, গুণ ও কাজ। জৈবিক ভাবনা ও আদর্শের অনুরাগী অ্যারিস্টট্‌ল প্লেটোর তুলনায় অনেকটাই বাস্তব, কারণ তাঁর তাত্ত্বিক সাধারণীকরণের পদ্ধতি ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে তুলনা টেনে রাজনৈতিক বাস্তবতাকে প্রকাশ করা।

অ্যারিস্টট্‌লের ন্যায়তত্ত্বের নির্যাস হল ঃ—(১) গ্রিক রাষ্ট্র ও তার নাগরিকেরা নৈতিক ভাবে বিকশিত (২) নৈতিকতার প্রশ্নে রাষ্ট্রের বাইরে থাকার অর্থ হয় অতি বিকশিত মানবতা অর্থাৎ দেবতা না হয় অবিকশিত প্রাণী অর্থাৎ পশু। রাষ্ট্রেই মানুষের পূর্ণতা এবং মানব সম্পর্কের শ্রেষ্ঠ রূপ রাষ্ট্র। (৩) উৎকৃষ্ট শাসন বলতে বোঝায় যেখানে স্বৈরশাসন নেই, সাধারণের কল্যাণে চলে যে শাসন। (৪) প্লেটোর মতো রাষ্ট্রের উদ্ভবের কোনো অর্থনৈতিক তত্ত্ব (জরুরী প্রয়োজন মেটানো) নয়, রাষ্ট্র তাঁর কাছে শ্রেয় কারণ তার মধ্যে আছে সুন্দরের প্রকাশ, (৫) সাম্য ও সুনীতির অভাব বা বিকৃতি থেকেই সৃষ্টি হয় বিক্ষোভ (৬) নৈতিকতার প্রশ্নে অ্যারিস্টট্‌লের অন্যান্য বিবেচনা যুদ্ধ অনায্য, শান্তি কল্যাণময়; রাজনৈতিক ন্যায় মূর্তিমান হয় আইনে। নাগরিকের উপকারে আসে এমন আইন তিনি চান, তবে ন্যায্য আইন অর্থে আইনের চোখে সমানাধিকার নয়, তিনি চান যোগ্যতায় সেরা লোকদের রাজনৈতিক সুবিধা। যে আইন রাষ্ট্রব্যবস্থার সঠিক রূপের (মিশ্র ব্যবস্থা) সঙ্গে সঙ্গতিশীল সেটিই ন্যায্য আইন।

সমালোচনা : অ্যারিস্টটলের তত্ত্ব ন্যায় ও ন্যায্যতার যে ধারণা দিয়েছে তা প্লেটোর মতো সর্বগ্রাসী না হলেও চরিত্রে গণতান্ত্রিক একথা বলা যাবে না। প্রথমত, যোগ্যতা এবং সামর্থ্য অনুসারে প্রাপ্তির তত্ত্ব অগণতান্ত্রিক নয়, তবে ন্যায়ের প্রশ্নে নাগরিক ও অ-নাগরিকের ভেদ বা অসাম্যের ন্যায্যতা প্রতিপাদনে তাঁর প্রচেষ্টা কোনোভাবেই গণতন্ত্রে সম্মত নয়। দ্বিতীয়ত, আইন, সমতা, অধিকারের সঙ্গে ন্যায়ের সম্পর্ক বিচারের অ্যারিস্টটলীয় পদ্ধতিও গ্রহণযোগ্য নয়। ব্যাবহারিক জগৎ থেকে উপকরণ নিলেও অ্যারিস্টটল কিন্তু বাস্তবের রাষ্ট্রকে আদর্শের শৃঙ্খলা পড়িয়েছেন। তৃতীয়ত, ন্যায়ের প্রশ্নে তাঁকে বণ্টনের তত্ত্বের প্রবক্তা বলা হয় অথচ অর্থনীতির মানে এই বণ্টন হয় না। তাঁর তত্ত্বে আগে আসে সুবিধা বিতরণের শ্রেষ্ঠত্বের ভাবনা এবং পরে আসে সংশোধনের মাধ্যমে কর্মীকে পুরস্কৃত করার নীতি। কাজ ও সামর্থ্য অনুসারে বণ্টনের সমাজতান্ত্রিক নীতিকে তাঁর তত্ত্বে যেমন অগ্রাহ্য হয়েছে তেমনি আজকের যুগের নাগরিক পছন্দ অনুসারে প্রাপ্তির ধারণাও অবহেলিত থেকে গেছে।

> রাজনীতিকে বিজ্ঞাননিষ্ঠ করার অ্যারিস্টটলীয় নীতি যতটা হেলেনিক (বিশেষ রাষ্ট্রকে উর্ধ্বে তুলে ধরার নীতি) ততটা সর্বজনীন নয়।

১.৪.৩ ন্যায়বিচার সম্পর্কে বার্কার-এর বিশ্লেষণ

ন্যায়নীতির প্রশ্নে প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের পরে অনেকেই তাঁদের মতামত পেশ করেছেন, তবে দীর্ঘদিন ধরেই এক্ষেত্রে বিশ্লেষণমূলক কোনো প্রত্যক্ষ আলোচনা হয় নি। বিংশ শতকের ত্রিশের দশকের শেষাশেষি ধারণাটি আবার ফিরে এল ইংরেজ অধ্যাপক স্যার আর্নেস্ট বার্কারের বিখ্যাত রচনা 'Principles of Social and Political Theory-র সৌজন্যে। প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের তত্ত্বে ছিল নগর রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতায় ন্যায়ের আদর্শবাদী উপস্থাপনা। বার্কার আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে একাধারে আইনি ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্লেষণকে সামনে রেখে ন্যায়ের প্রশ্নকে বিচার করেন। ন্যায়ের অর্থ, ধারণাটির উৎপত্তি, ন্যায়ের কাজ, ন্যায়ের রূপায়ণ—ন্যায় সম্পর্কিত নানা প্রশ্নের জবাব মেলে বার্কারের তত্ত্বে।

বার্কারের বিশ্লেষণের মূল ধারা হল ঃ

১. রাষ্ট্র আইনের উদ্দেশ্যের দ্বারা তাড়িত হলেও নৈতিকতা বা ন্যায়বোধকে উপেক্ষা করতে পারে না।

২. উৎপত্তিগতভাবে Justus ও Justitia শব্দ দুটির মধ্যে ন্যায়ের অর্থ রয়েছে। 'সংযোগ' ও 'সুসমঞ্জস' কথা দুটির মধ্যে ন্যায়ের অর্থ রয়েছে। বিভিন্ন মূল্যবোধকে সমন্বিত করা বা সামঞ্জস্য বিধান করার এক নীতি হিসাবেই ন্যায়কে দেখা হয়।

৩. ন্যায়ের উৎস সন্ধান করা যায় ধর্মে, প্রকৃতিতে, অর্থনীতিতে এবং নীতিশাস্ত্রে। মধ্যযুগে অ্যাকুইনাস প্রমুখ ন্যায়ের উৎপত্তিতে ধর্মের ভূমিকার কথা বলেছেন। স্টোয়িকরা এবং রোমক আইনজ্ঞরা ন্যায়কে বিশ্বজগৎ নিয়ন্ত্রণের একটি নীতি হিসাবে দেখেছেন। রুশ বিপ্লবী চিন্তায় অর্থনীতির বাস্তব ঘটনার মধ্যে ন্যায়ের সন্ধান করা হয়েছে। নীতিশাস্ত্র ন্যায়ের পেছনে দেখেছে মানুষের নৈতিক চেতনার প্রভাব।

৪. বার্কার ন্যায়ের প্রশ্নে ধর্ম, প্রকৃতি, অর্থনীতি বা নীতিশাস্ত্র কোনো কিছুর প্রভাবকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন না। তবে ন্যায়ের উৎস হলেও এগুলি কোনটাই একমাত্র উৎস নয়। ধর্মে সবার বিশ্বাস নেই, রাষ্ট্রও ধর্মকে ভিত্তি করে ন্যায় বলবৎ করতে গেলে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে। প্রকৃতির ধারনায় বাস্তবের চেয়ে ধর্মীয় বা পরমার্থিক প্রশ্ন বেশি করে আসে। অর্থনীতির মার্কসীয় ও প্রুঁধ প্রচারিত তত্ত্ব বা দ্যুগুই (Duguit) প্রচারিত অর্থনৈতিক সংহতির নীতিকে বর্জন করে বার্কার বলেন, আইন অর্থব্যবস্থাকে নির্ধারণ করে, অর্থব্যবস্থা আইনকে নয়। নীতিশাস্ত্রে আইনের বৈধতার গুণ নেই। বার্কার মনে করেন, আইনের কাজ একটি সর্বনিম্ন নৈতিক মান অর্জনে ব্যক্তিকে সাহায্য করা এবং আইন হবে সমষ্টিগত মানুষের বাহ্য আচরণ নিয়ন্ত্রণের সমরূপ নিয়ম, যা সকলের উপর সমানভাবে বাধ্যতামূলক। বার্কারের ন্যায়ের ভাবনায় আইন এসেছে নৈতিক আচরণের প্রয়োজনীয় বাহ্য শর্তকে সুনিশ্চিত করতে। বার্কার আইনগত ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়িয়ে বলেছেন, সহযোগিতার নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করে ব্যক্তির মহত্তম বিকাশ ঘটাতে জাতীয় সমাজকে একটি যথার্থ নিয়ম ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

৫. বার্কার বেন্থামের সুখবাদী নীতি (সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক সুখ) ত্যাগ করে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের কর্মক্ষমতার মহত্তম বিকাশেই সামাজিক ও আইনগত ন্যায় অবস্থান করে বলে মনে করেন। আত্মার মহত্তর, অব্যাহত কর্মশক্তির মধ্যে সুখ আছে—এই তত্ত্বও বার্কার মানেন না, কারণ এ সুখ কতিপয়ের। তিনি চান সেই সুখ যা সকলের বোধগম্য। বার্কার তার ধারণাকে বাস্তবায়িত করতে চান একটি সংগঠন পরিকল্পনার মাধ্যমে। এই পরিকল্পনায় শুধুমাত্র রাষ্ট্রের কর্তব্য পালন নয়, ব্যক্তির উদ্যোগ ও কর্মপ্রচেষ্টাও থাকবে। এটি হল উন্নয়নের একটি সমভোগ ব্যবস্থার নির্মাণ-প্রকল্প।

৬. বার্কার ন্যায়ের প্রশ্নে অধিকারের সঙ্গে এর সম্পর্ক কি সে প্রশ্নও বিচার করেছেন। বার্কার বিকাশের উপযোগী বাহ্য শর্ত হিসাবে দেখেন আইনকে আর অধিকার বলতে বোঝেন ব্যক্তির বিকাশের স্থিরিকৃত ও সংরক্ষিত শর্তাবলিকে। রাষ্ট্র ও আইন যে ন্যায়ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত অধিকার সেই ব্যবস্থারই ফল। ন্যায় থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো অধিকার নেই। অধিকার কতকগুলি সাধারণ নীতি মেনেই বণ্টিত হয়। অ্যারিস্টটল একেই বলেন বণ্টনমূলক ন্যায়। বার্কারের কাছে এই নিয়ম হল পদ্ধতিগত নিয়ম (Procedural rules)। বার্কার মনে করেন ন্যায়ের স্বার্থেই রাষ্ট্র এগুলি অনুসরণ করবে। তবে অ্যারিস্টটলের বণ্টনের নীতি নয় বার্কারের মতে ন্যায় যদি হয় সামাজিক নিয়ম ব্যবস্থা, যা রাষ্ট্রের সকল সদস্যের ব্যক্তিত্বে নিহিত যাবতীয় সামর্থ্যের সম্ভাব্য মহত্তম বিকাশসত্তাকে পুষ্ট বা উৎসাহিত করতে সচেষ্ট তবে ন্যায়ের স্বার্থেই এই পদ্ধতিগত নিয়মগুলিকে সামাজিক নিয়মব্যবস্থায় উৎপন্ন বলে ধরা যায়। বার্কার এই পদ্ধতিগত নিয়মাবলির মধ্যেই আনেন স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর নিয়মাবলি যার সূত্র হল ন্যায়। স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর নীতি অধিকার

বণ্টনের ক্ষেত্রে সমান গুরুত্বপূর্ণ। ন্যায় বার্কারের চোখে সমন্বয় বা সম্বাদ (Syntheis)। ন্যায়কে অনুসরণ করেই স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর নীতি হয়ে ওঠে পরস্পরের পরিপূরক।

৭. বার্কারের মতে ন্যায়ের দুটি কাজ—ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সংযোগ সাধন এবং নীতির সঙ্গে নীতির সংযোগসাধন। বিভিন্ন নীতিগুলি (স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী) পরস্পরের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হতে পারে। এমনকি স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ (পৌর, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক) পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে। ন্যায় বার্কারের চোখে মানব সম্বন্ধের এক বিন্যাসব্যবস্থা, অধিকার বণ্টনের বিভিন্ন নীতির এক বিন্যাস যা চূড়ান্ত ও মৌলিক মূল্যবোধের দ্বারা নির্ণীত।

৮. বার্কার রসকো পাউন্ডের (Roscow Pound) বাস্তববাদী (Pragmatic) ব্যাখ্যার ন্যায় অতীতের ভাবনা আজকের দিনে অচল, আজকের যুগে চাই সামাজিক গোষ্ঠীগুলির চাহিদার এক সমসূত্র গড়ে দেওয়া—এই ধারণাকে মানেন না। ন্যায়কে সামাজিক চাহিদার ভারসাম্য রক্ষার দাঁড়িপাল্লা হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। সব চাহিদা সমান মূল্যবান, সামাজিক চাহিদা মুখ্য, মানুষের আত্মবিকাশের প্রশ্নটি গৌণ পাউন্ডের এই বক্তব্যে বার্কারের সায় নেই। বার্কার চান ন্যায়ের সার্থক রূপায়ণ। এক্ষেত্রে তিনি গুরুত্ব দেন মানুষের সামাজিক মেলামেশা, ন্যায় রূপায়ণের আইনগত সংস্থা এবং শাসনতান্ত্রিক নীতি এবং বাস্তব কিছু নিয়মকে সংঘবদ্ধ রূপদান।

- সমালোচনা : বার্কারের ন্যায়ের এই তত্ত্ব সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। প্রথমত, তার চিন্তা বড়ো বেশি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী এবং প্রচলিত ইংরেজ জীবনের ভাবধারার ঊর্ধ্বে উঠে তিনি ন্যায়ের কথা বলেন না। দ্বিতীয়ত, সমাজতত্ত্বের ভাবনায় আলোচিত হলেও ন্যায়ের প্রশ্নে সমাজ বা গোষ্ঠীর দাবিকে তিনি তেমন গুরুত্ব দেন না। যে আইন ব্যবস্থার আড়ালে ন্যায়ের ভাবমূর্তি তিনি স্থাপন করেন, সেই আইন কতটা ন্যায্য এ প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয়। তৃতীয়ত, ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা ন্যায়ের সংরক্ষণে কি ভূমিকা নিয়েছে এ প্রশ্নও থেকে যায়।

১.৪.৪ ন্যায়বিচার প্রশ্নে রল্‌স-এর তত্ত্ব

ন্যায়বিচার সম্পর্কে জন রল্‌স-এর A Theory of Justice (1971) এক তাৎপর্যপূর্ণ ভাবনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীসময়ে উদারবাদ যখন তার গণতান্ত্রিক ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে ব্যর্থ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই যখন যুদ্ধ, জাতিসমস্যা, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, রাষ্ট্রের ব্যয়বৃদ্ধির চাপ ইত্যাদি কারণে রাষ্ট্রের বৈধতা ও বিশ্বস্ততা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ঠিক সেই সময়ই রলস এগিয়ে এসেছেন তাঁর সমাজবিন্যাসের নব আদর্শ নিয়ে। উদারবাদেরই এক বামপন্থী, সংশোধিত রূপকে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। সংকটকালীন এই অবস্থার নিরাময় হিসাবেই উঠে এল তাঁর ন্যায়বিচারের তত্ত্ব।

> **জানবার কথা**—১৯৫৭ সালেই রলস 'Journal of Philosophy'-তে 'Justice of Fairness' নামে এক প্রবন্ধ লিখেছেন। এই সময় থেকে ন্যায়কে কেন্দ্রীয় ভাবনা করে শুরু হল উদারনীতিবাদকে নতুন করে অভিষিক্ত করার রলসীয় গবেষণাগত প্রকল্প।

নতুন প্রকল্পের যে রূপরেখা রল্‌স পেশ করেন তার চিন্তাপদ্ধতি অভিনব। তিনি চাইলেন জন লকের (John Locke) চুক্তিবাদের ঐতিহ্যকে সামনে রেখে বেন্থামীয় সুখবাদের নীতি ও তার্কিক অভিজ্ঞতাবাদের ধারাকে বর্জন করতে এবং রুশো ও কান্টের গণতান্ত্রিক ও নৈতিক দৃষ্টিকে রাষ্ট্রচিন্তায় ফিরিয়ে আনতে। 'ভারসাম্যের প্রতিফলন' (reflective equililibrium) হল পদ্ধতির ধারা। এর বিশিষ্টতা হল (১) সিদ্ধান্তকে প্রতিমুহূর্তে পরীক্ষা করে যেতে হবে, কারণ আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতির সঙ্গে নৈতিক যুক্তির ফাঁক থাকতে পারে, (২) প্রাথমিক বা প্রারম্ভিক অবস্থানের ক্ষেত্রে

সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হবে, কারণ নৈতিক বিশ্বাস ও মৌলিক নীতির মধ্যে ধারাবাহিকতা যেন ছিন্ন না হয়, (৩) ন্যায়ের স্বর্তঃস্ফূর্ত ধারণাকে দার্শনিক যুক্তি দ্বারা সংশোধন করা যেতে পারে। যুক্তি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরিমার্জনার মাধ্যমেই ন্যায়ের এই গঠনমূলক পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়াই রলস্-এর গবেষণাগত প্রকল্পের লক্ষ্য।

রল্‌স-এর ন্যায়বিচার প্রকল্পের অনুমানগুলি হল ঃ

১. মানুষ এক 'প্রারম্ভিক অবস্থানের' (Original Position) মধ্যে ছিল অনেকটা সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রকৃতির রাজ্যের (State of nature) মতো। এই অবস্থায় মানুষের জ্ঞান, বিচারবুদ্ধি তেমন ছিল না। এ যেন অজ্ঞতার এক ঘোমটা বা পর্দা (Veils of ignorance)। মানুষ জানে না সমাজে তার স্থান কী, শ্রেণি-পরিচয় কী, মর্যাদা কী, সম্পদের ভাগ-বণ্টন কীভাবে ঘটছে। চুক্তিতে অংশ নিলেও মানুষের সমাজবোধ সেভাবে গড়ে ওঠে নি এই প্রারম্ভিক অবস্থায়।

২. অজ্ঞ হলেও ভালো কিছু পাবার আগ্রহ মানুষের আছে এবং নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার্থেই নতুন সমাজ (ন্যায়ের সমাজ) গঠনে তারা আগ্রহী। তারা বুঝেছে বোঝাপড়ার মাধ্যমেই আসবে এই নতুন অবস্থা।

৩. চুক্তিবদ্ধ অজ্ঞ মানুষ যে যুক্তির পথে চলেছে লক থেকে এই শিক্ষা নিয়ে রল্‌স বলেছেন, তারা স্বাধীনতা রক্ষার কথা ভেবেছে। সকলের ভালো হোক এ ভাবনাও মানুষের ছিল না তা নয়, রুশোর (Rousseau) এই ভাবনায় রল্‌স আলোকিত হয়েছেন। আবার কান্টের (Kant) অনুসরণে তিনি একথাও বলতে চান নিজেদের নৈতিক মানবিক ব্যক্তিত্ব তুলে ধরতেও মানুষের ইচ্ছা বা আগ্রহের অভাব ঘটে নি।

৪. চুক্তি বা বোঝাপড়ার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হবে উদার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ। ন্যায্য বণ্টন, ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থ রক্ষা, আর চুক্তি ও সমাজের প্রতি আনুগত্য উদার ন্যায়ভিত্তিক সমাজের আদর্শ নীতি।

৫. সকলের কথা ভেবে মানুষ চায় তার প্রাথমিক চাহিদা (স্বাধীনতা, সুযোগ, আয়, সম্পদ ও আত্মমর্যাদা) মিটুক। এই চাহিদা ব্যক্তিসর্বস্ব নয়, সামাজিক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই এই চাহিদার বণ্টন ও সর্বাধিক পরিতৃপ্তি ঘটবে। অজ্ঞ বলেই তারা আপন-পর জানে না, প্রাপ্তির প্রশ্নে তার ভাগ কতটা তা জানে না। তার হিংসা নেই। সরলতা, বিনয় ও মহত্ত্বই তার গুণ।

৬. এই সব সরল, অজ্ঞ, মহৎ মানুষের জন্য চাই পক্ষপাতহীন, ন্যায় নির্ভর সুন্দর এক ব্যবস্থা। ন্যায়ের সুন্দর ও শিষ্ট প্রকাশ (Justice as Fairness) হল : মানুষ জানে না জন্মদিনের কেকটি কাটা হলে তারা কে কতটা পাবে, কিন্তু তাদের সরল বিশ্বাস দিয়ে তারা বোঝে, যথাসম্ভব সঠিকভাবেই সকলের মধ্যে এর বণ্টন হবে। এইভাবেই রল্‌স যাচাই করে নিলেন মানুষের অবস্থান, তাদের ঝোঁক, তাদের পছন্দের এলাকা (স্বাধীনতা) এবং কীভাবে বোঝাপড়ার মাধ্যমে অর্জন করা যাবে ন্যায়ের এক সত্যসুন্দর ব্যবস্থা।

রল্‌স-এর প্রকল্পে ন্যায়বিচার্যের যে নীতিটি পেশ করা হল তা এইরকম ঃ

- সমস্ত সামাজিক মূল্যবোধ—স্বাধীনতা ও সুযোগ, আয় ও সম্পত্তি, এবং আত্মমর্যাদার ভিতকে সমভাবে বণ্টন করতে হবে যদি না এই সমস্ত মূল্যবোধগুলির কোনো একটি বা সবগুলির অসম বণ্টন সবার সুবিধার্থে হয় ('All social value—liberty and opportunity, income and wealth and the bases of self-respect are to be distributed equally unless an unequal distribution of any, or all, of these values is to be everyone's advantage'—John Rawls—A theory of Justice (1971) Chap II, Section 11)
- রলস্ ন্যায়ের দুটি নীতি ও পছন্দের দুটি নিয়মের কথা বলেছেন। ন্যায়ের দুটি নীতি হল ঃ (১) প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক স্বাধীনতা ও সমানাধিকার (২) সকলের জন্য সঠিক বা ন্যায্য সুযোগের নীতি, প্রথম নীতিটি হল ন্যায়ের মূলনীতি (Core Prineple) দ্বিতীয় নীতিটি হল বেশি-কম নীতি (Maximin Principle)

জানবার কথা—প্রথম বা মূল নীতি: রল্‌স-এর কথায় প্রথম নীতিটি হল অন্যান্য ব্যক্তির ব্যাপক মৌলিক স্বাধীনতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই প্রত্যেক ব্যক্তির সমতুল্য স্বাধীনতার সমানাধিকার থাকবে।

দ্বিতীয় নীতি বা বেশি-কম নীতি : এই নীতির দুটি ভাগ ঃ

(ক) সামাজিক আর্থিক সুবিধাকে এমনভাবে ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তা প্রত্যেকের সুবিধার্থে কাজ করে এবং বিশেষভাবে অনগ্রসর মানুষের সাহায্যে লাগে।

(খ) সামাজিক আর্থিক অসাম্যের ব্যবস্থাপনা এমনভাবে হবে যাতে ন্যায্য সমান সুযোগের অবস্থায় পদ ও কার্যালয় সকলের কাছে উন্মুক্ত থাকে।

- ন্যায়ের দুটি নীতির পছন্দের বিশ্লেষণে গিয়ে রলস্ বলেছেন প্রথম বা মূলনীতিটি হল সাম্যের নীতি এবং দ্বিতীয় বা বেশি-কমের নীতিটি হল পার্থক্যের নীতি। সাম্যের নীতি অর্থাৎ ১ নং নীতি বেশি-কম নীতির (২নং নীতি) অগ্রবর্তী। বেশি-কম নীতির দুটি ভাগ, যার প্রথমটি (অর্থাৎ ক), দ্বিতীয়টি (অর্থাৎ খ) তুলনায় পছন্দের নিরিখে পরবর্তী। পছন্দের প্রশ্নে রলস্ এর যুক্তি (১) অর্থনৈতিক সুবিধার কারণে ন্যায়ের প্রথম নীতির অন্তর্ভুক্ত স্বাধীনতার মধ্যে অগ্রাধিকার নিয়ে দরাদরি যুক্তিসংগত নয়। (২) সাম্যের অবস্থা থেকে অপসরণ তখনই ন্যায্যতা পাবে যখন তা সুবিধা বা লাভে পরিণত হয়। সমাজের সুবিধার্থে অসাম্যকে মেনে নেওয়া যায়। বেশি-কম নীতি অসাম্যের নীতি বটে তবে তাকে পছন্দ করা যায় অনগ্রসর মানুষের সুবিধার্থে। যোগ্যতার মান নির্ধারণের প্যারেটো নীতি সম্পদ বণ্টনের যে মান নির্ধারণ করেছে (খোলাখুলি বিনিময়) তাতে বেশ কিছু মানুষের ক্ষতি বা পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। ভাগ্য, ক্ষমতা, অতীতের অন্যায় এসব যোগ্যতার নীতি রল্‌স-এর পছন্দ নয়। (৩) রলস্ চান বাজার সামাজিক নীতির দ্বারা পরিচালিত হোক, যা কতিপয়ের অন্যায্য সুবিধা পাবার হাত থেকে অধিকাংশকে রক্ষা করবে। ভাগ্য অন্বেষণের স্বাভাবিক ব্যবস্থা রলস্ নৈতিকভাবে স্বেচ্ছাচারী মনে করেন। (৪) রল্‌স চান সম্পদ বণ্টনের অসাম্যের পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেতে ন্যূনতম সামাজিক মান কার্যকর হোক, গড়ে উঠুক সমাজে সহযোগিতার এক সঠিক ব্যবস্থা। (৫) সুযোগের সমানাধিকারের (২ খ) প্রশ্নে রল্‌স চান সবরকম বৈষম্যের অপসারণ। প্রতিভা বা যোগ্যতাকে ব্যবহার করে অতিরিক্ত আয় বা সম্পদ সৃষ্টির প্রবণতা তাঁর কাছে মূল্য পায় না।

জানবার কথা—রল্‌স-এর তত্ত্বে পছন্দের অগ্রাধিকার

১. স্বাধীনতার সমানাধিকার নীতি

২. সুযোগের ন্যায্য সমতা

৩. বেশি-কম নীতির সুযোগ্য বণ্টন-ব্যবস্থা

- ন্যায়বিচারের রূপায়ণের প্রশ্নে রল্‌স সাংবিধানিক গণতন্ত্রের ধারণাকেই গুরুত্ব দেন। সাম্য, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, বণ্টনমূলক ন্যায়, সমাজকল্যাণ, মূল স্বাধীনতা সংরক্ষণ, সামাজিক-আর্থিক সুবিধাদানে, দরাদরির নীতির অনুপস্থিতি তাঁর ন্যায়ের রাজ্য তথা সাংবিধানিক গণতন্ত্রের নীতি। তাঁর উদারবাদ বামপন্থায় উত্তীর্ণ হয় উদার

গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের পাশাপাশি অবস্থান, মানবতা, নৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রসার এবং সর্বোপরি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের ধারণাকে প্রসার করার ভাবনায়। (Rawls : Political Liberalism, 1993, The Law of the People, 1999)

সমালোচনা : রল্‌স-এর ন্যায়বিচার তত্ত্বের প্রকল্প উদারবাদী মহলে স্বীকৃতি পেয়েছে। জন স্টুয়ার্ট মিলের পর রাজনৈতিক দর্শনে তাঁর অবদানকে সংগঠিত ও সবচেয়ে গভীর অবদান বলে মান্য করা হল। পত্র-পত্রিকায় (Amirican Political Science Review, The New York Times Book Review) বইটি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেল। ধনতন্ত্রের এমন উদারভাষ্য, সাংবিধানিক গণতন্ত্রের মধ্যে ন্যায়কে সন্ধান করার এমন উদ্যোগ আগে দেখা যায় নি। তবে দক্ষিণপন্থী উদারবাদী মহলে, মার্কসবাদী ও সমষ্টিবাদী তত্ত্বে রল্‌স-এর ধারণা সমালোচিত হয়েছে। প্রথমত, তাঁর তত্ত্ব ভ্রান্ত, অনুমান-নির্ভর, উদারবাদকে সমাজবাদের আলোকে ব্যাখ্যা করার হাস্যকর প্রয়াস, প্রচলিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বৃত্তে ন্যায়ের রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা সমালোচকেরা পছন্দ করেন নি। দ্বিতীয়ত, কান্টের নৈতিক ভাবনা, লকের চুক্তিবাদ, রুশোর জনকল্যাণের দর্শনকে ন্যায়ের একটি খাঁচায় তুলে আনার চেষ্টা সফল হতে পারে না, কারোর চিন্তার প্রতিই সুবিচার করতে পারে না বলেও সমালোচকদের অভিযোগ। তৃতীয়ত, কিছু তাত্ত্বিক প্রশ্ন। নজিক রল্‌স-এর ন্যায়ের নীতি, বণ্টনের নীতিকে মানেন না। তিনি চান রাষ্ট্র কল্যাণ রাষ্ট্র নয়, প্রহরী রাষ্ট্র (সম্পত্তির প্রহরা) হিসাবে কাজ করুক। হায়েক-এর মতো কেউ কেউ সরাসরি রল্‌স-এর তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া না জানালেও কল্যাণ রাষ্ট্রের তত্ত্ব দিয়ে পুঁজিবাদের সমাজতন্ত্রের নীতির কাছে আত্মসমর্পণের প্রবণতাকে পছন্দ করেন না। অন্যদিকে মার্কসবাদ রল্‌স-এর মার্কিন সাংবিধানিক ভাবনার প্রতি অতিরিক্ত আনুগত্যের নীতিতে আস্থাশীল নয়। তাঁরা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের মধ্যেই ন্যায়কে আবিষ্কার করেন। সমষ্টিবাদী তত্ত্বে (Communitarian thery) রল্‌সকে শোধনবাদী উদারবাদী বলে অভিযুক্ত করা হয়। উদারবাদী সমাজের সামাজিক সংকট, গণঅংশগ্রহণের অবনতি, সামাজিক দায়িত্বের অভাব রল্‌স-এর ন্যায়তত্ত্বের তেমনভাবে আসে নি বলে কৌমবাদীরা (মাইকেল স্যান্ডাল, চার্লস টেলর প্রমুখ) মনে করেন। নয়া রক্ষণশীল চিন্তাবিদ মাইকেল ওয়ালসার মনে করেন শুধু সমতার উপাদানেই ন্যায়ের প্রকাশ ঘটবে একথা ঠিক নয়। ন্যায়ের প্রশ্নে সামাজিক বৈচিত্র্য, মেধা, প্রতিভাকে অস্বীকার করা যাবে না।

১.৪.৫ ন্যায়বিচার প্রসঙ্গে অন্যান্য তত্ত্ব

নয়া উদারবাদী (Neo-Liberalism) তত্ত্ব ন্যায়বিচার প্রসঙ্গে কিছু নতুন ভাবনার অবতারণা করেছে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রচিন্তায় বিশেষ প্রভাব ফেলেছেন রবার্ট নজিক ও ফ্রেডেরিক হায়েক। রল্‌স-এর বামপন্থার উদারবাদের বিপরীতে এঁরা প্রচার করেন উদারবাদের দক্ষিণপন্থী ভাবনা। কল্যাণকর রাষ্ট্রের মাধ্যমে মার্কিন উদারবাদী চিন্তায় সমাজতন্ত্রের প্রবেশাধিকার ঘটেছে, অতি ক্ষমতাপ্রবণ রাষ্ট্রের প্রসার ঘটেছে ফ্রেডেরিক হায়েক (F. A. Hayck) তাঁর 'The Road to Serfdom' গ্রন্থে এ আশংকা প্রকাশ করেছেন। হায়েক তাঁর উদার-গণতান্ত্রিক সমাজের মডেলে উদারবাদের প্রচলিত আদর্শগুলিকেই ফিরিয়ে আনেন। ন্যায়ের দৃষ্টি নিয়ে নয় স্বাধীনতার দৃষ্টি নিয়ে সমাজকে দেখেছেন তিনি। তিনি চান (১) সম্পত্তি বা সম্পদের মূল্য নির্ধারিত হবে ব্যক্তির পছন্দ অনুসারে (২) অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণে সরকারের যথাসম্ভব কম হস্তক্ষেপই বাঞ্ছনীয় (৩) মুক্ত অর্থনীতি ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যই ন্যায়ের পথ।

হায়েকের দক্ষিণপন্থী উদারবাদের এই ভাবনাই সরাসরি প্রকাশ পেল রবার্ট নজিকের-এর 'Anarchy State and Utopia' (1974) গ্রন্থে। নজিক চেয়েছেন ন্যূনতম এক রাষ্ট্র, যেখানে রাষ্ট্র থাকবে কিন্তু তার বাড়াবাড়ি থাকবে না। নজিকের তত্ত্বে ন্যায়ের সামাজিক ভাবনা নয়, প্রাধান্য পেল ন্যায়ের পদ্ধতিগত (Procedural) নীতি। নজিকের তত্ত্বের মূল কথা হল ঃ

১. পুঁজিবাদই ন্যায়ের ভিত্তি, উদারবাদ নয়। রাষ্ট্র কি লক্ষ্যে অগ্রসর হবে বা বণ্টনের কি নীতি নেবে এটা মূল

প্রশ্ন নয়। মূল কথা হল, ন্যায়ের মতো কোন স্থির নীতি বা বিশ্বাসকে সামনে রেখে নয়, বণ্টনের প্রশ্নে থাকবে স্বাভাবিক প্রবণতা মেনেই পুরস্কার দেবার নীতি। এক্ষেত্রে পদ্ধতি হল ব্যক্তির গুণ, পরিশ্রম, উদ্যোগ অনুসারেই তাকে সম্পদ পেতে সাহায্য করা।

২. সম্পদের আহরণের তত্ত্ব হল, বলপ্রয়োগ বা মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে ব্যক্তি যদি সঠিকভাবে তার শ্রম প্রয়োগ করে সম্পদ সৃষ্টি বা বিনিময় করে, সৎ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সম্পদের মালিকানা পায় তবে তা ন্যায্য।

৩. ব্যক্তির সম্পত্তির মালিকানা লাভের এই ন্যায্য অধিকার পেতে রাষ্ট্র ব্যক্তিকে বাধা দেবে না, তাকে সুরক্ষিত করবে। নজিকের রাষ্ট্রভাবনায় লঘু রাষ্ট্রের (Minimal State) ধারণা সমর্থন পেয়েছে। রাষ্ট্রের কাজ ব্যক্তিকে শুধুমাত্র সুরক্ষা দেওয়া। এই অর্থে রাষ্ট্র Night watchman state ছাড়া অধিক কিছু নয়।

৪. রাষ্ট্রের অভিভাবকত্ব নয়, নজিক চান ব্যক্তির প্রতিভা ও গুণের স্বীকৃতি। পুঁজিবাদী সমাজের ব্যবসায়িক প্রবণতা, মুক্ত বাণিজ্য অর্থনীতির মধ্যেই আছে ব্যক্তির মুক্তি।

নজিকের তত্ত্বে মানুষের সুস্থ ও মহৎ জীবনের আশ্বাস আছে কিনা, সমাজ ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ প্রচার পায় কিনা এ প্রশ্ন তুলেছেন পরবর্তীকালের উদারবাদীরা। নজিকের পুঁজিবাদী সমাজের প্রতি আগ্রহ বা সামাজিক নৈতিকতার প্রতি বিরাগ মার্কসবাদী চিন্তায় মূল্য পায় না। মার্কসবাদীদের চোখে সমাজতন্ত্রই প্রাথমিক ভাবে ন্যায়ের রাজ্য। পুঁজিবাদী সমাজের স্ববিরোধিতা, শ্রমিকের বিচ্ছিন্নতা, অভাব ও দুর্দশা থেকে মুক্ত হতে চাই (১) প্রলেতারীয় গণতন্ত্র অর্জনের কাজ। (২) অর্থনীতির বিপ্লবী রূপান্তর ও পুনর্গঠন এবং (৩) সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশ। মার্কসবাদ চায় সামাজিক ন্যায়ের (Social Justice) প্রকাশ ঘটুক। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নতি ও পরিচালনা, পুঁজির শাসন ও আধিপত্যের অবসান, শ্রমের মর্যাদা ও উপযুক্ত পরিবেশ এবং প্রকৃত উচ্চমানের এক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই গড়ে উঠবে সামাজিক ন্যায়ের পরিবেশ। মার্কসবাদ মনে করে সমাজতন্ত্র যখন তাঁর সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছবে, যখন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সমভোগবাদী সমাজে (Communist Society) উত্তীর্ণ হবে তখনই সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে। সামাজিক বৈষম্যের অবসান, সামাজিক শৃঙ্খলা, সামাজিক দায়িত্ব, সামাজিক নিরাপত্তা ও শান্তি—সামাজিক ন্যায়ের এই চারটি প্রধান লক্ষণ কার্যকর হবে সমভোগবাদী সমাজে। এই সমাজের নীতি হল : প্রত্যেকে তার সামর্থ্য ও প্রয়োজন মতো পাবে। প্রাচুর্য ও সমবণ্টন এনে দেবে শোষণমুক্ত, শ্রেণিহীন এই সমাজ।

মার্কসবাদ যে সমাজের আদর্শকে প্রতিস্থাপন করেছে সেখানেও যে ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি তার প্রমাণ (১) সমভোগবাদ বা সাম্যবাদ অর্জিত হয় নি (২) সমাজতন্ত্রের মডেল নিয়ে মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের ভাবনার সঙ্গে পরবর্তীকালের সমাজবাদী ভাবনার অমিল। কাউটস্কি, প্লেখানভ, রোজা লুক্সেমবার্গ, ট্রটস্কি মার্কসবাদের প্রচলিত ধারা বা কাজকর্মের সঙ্গে একমত হন নি (৩) স্তালিনের আধিপত্যবাদ, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিচ্যুতি, সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন সমাজতান্ত্রিক নৈতিকতাকে কিছুটা প্রশ্নের মুখে ফেলেছে সন্দেহ নেই।

সমষ্টিবাদী বা কৌমবাদী তত্ত্বে (Commutarian theory) সমষ্টিচেতনা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সহযোগিতার যে আদর্শ প্রচারিত হয় তা ন্যায়ের আদর্শের পরিপূরক। উদারবাদের ব্যক্তিব্যঞ্জক ও নবউদারবাদের বাজার অর্থনীতির ভাবনা যে সমাজের নৈতিক ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয় এই প্রশ্নকে সামনে রেখে এঁরা যে নৈতিক সমাজের আদর্শকে পেশ করেন তা হল ঃ (১) বোঝাপড়া ও ঐক্যত্যের প্রসার (২) সামাজিক মূল্যবোধকে গুরুত্ব দান (৩) সমতাকে সামনে রেখে কল্যাণমূলক সংস্কার (৪) অবাধ ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতার রাজনীতির পরিবর্তে সমষ্টিচেতনা ও দায়িত্বের প্রসার (মাইকেল স্যান্ডাল যাকে বলেছেন Politics of Common Good)। সমষ্টিবাদ ভোগবাদী জীবন থেকে নাগরিক সমাজকে বিরত থাকার কথা বললেও, কমিউটারিয়ান আদর্শ মার্কিন মূল্যবোধকে অস্বীকার করে নি। নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার সমর্থকের চোখে সমষ্টিবাদ নগর সভ্যতার যে হতাশব্যঞ্জক চিত্র অঙ্কন করেছে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

১.৫ উপসংহার

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই রাষ্ট্রচিন্তায় ন্যায়বিচারের ভাবনা একতরফা নয়, এর নানা মুখ, নানা ভাষা, নানা বিশ্লেষণ। এই ধারণাকে বিতর্কের মাধ্যমে সন্ধান করতে করতে প্লেটো দিলেন এক আদর্শ রাজ্যের মডেল ও আদর্শ শাসকের ধারণা। অ্যারিস্টটল ন্যায়ের বণ্টন ও সংশোধনের সমস্যাকে বিচার করেছেন। বার্কার ধারণাটিকে আইন ও অধিকারের সঙ্গে সংযুক্ত করে সমন্বয়ের এক সূত্র সন্ধান করেন। জন রল্‌স ন্যায়ের সত্যসুন্দর ব্যবস্থা হিসাবে সাম্যের ভাবনায় আলোকিত হলেও, সমাজের সামগ্রিক সুবিধার্থে অসাম্যেরও যে প্রয়োজন আছে সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নব্য উদারবাদীরা ন্যায্য সম্পত্তির সংরক্ষণ ও মুক্ত বাণিজ্যের ভাবনায় আলোকিত হয়ে ন্যায়ের প্রশ্ন বিচার করেন। মার্কসবাদীরা ন্যায়কে দেখেন পুঁজিবাদী বৈষম্যের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণ ও ক্রমশ এই সমাজের সাম্যবাদী সমাজে উত্তরণের মান হিসাবে। সমষ্টিবাদী তত্ত্বর প্রবক্তাগণ ন্যায়কে সামাজিক মূল্যবোধ হিসাবে দেখেন এবং নাগরিকের সুচেতনার উপর আস্থা রাখেন। সমগ্র আলোচনা থেকে শিক্ষার্থী পাঠক অন্তত এই ধারণা পেতে পারেন যে ন্যায় বিচার শুধুমাত্র উপলব্ধির ব্যাপার নয়। কেমন ভাবে একে অর্জন করা সম্ভব এবং এক্ষেত্রে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব কী এ প্রশ্নও তাৎপর্যপূর্ণ।

> **জানবার কথা**—ন্যায়বিচারের নানা মান—মহত্ত্ব, ধর্ম, নীতি, দণ্ড, কূটনীতি, অর্থ ও সম্পদ লাভ, বণ্টন, সুখ, কল্যাণ, স্বাধীনতা, সমতা, আইন, শান্তি ও মানবিকতা। প্রশ্ন হল শ্রেষ্ঠ মান কী এবং একে অর্জন করার শ্রেষ্ঠ পন্থা কী।

১.৬ গ্রন্থসূচী

১. Plato : The Republic (Everyan's Edition)

২. Aristotle- Ethics; Politics (Jowett Translated)

৩. Ernest Barker : Principles of Social and Political Thoary (Oxford University Press, London, 1951)

৪. John Rawls : A Theory of Justice (Oxford University Press, 1971)

৫. দেবাশিস চক্রবর্তী : রাষ্ট্রবিজ্ঞান : তত্ত্ব ও প্রতিষ্ঠান (সেন্ট্রাল এডুকেশন্যাল এন্টারপ্রাইজেস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা, ২০১২); রাষ্ট্রচিন্তার ধারা (ওই, ২০১২)

১.৭ নমুনা প্রশ্নাবলি

১.৭.১ বড়ো (রচনাত্মক) প্রশ্ন

প্রশ্নের মান—১৮

১. ন্যায়বিচারের সংজ্ঞার্থ দাও। ন্যায়বিচার সম্পর্কে প্লেটোর ধারণা বিশ্লেষণ করো।

২. ন্যায়বিচার সম্পর্কে বার্কারের মতামত ব্যাখ্যা করো।

৩. ন্যায়বিচার সম্পর্কে রল্‌স-এর তত্ত্ব আলোচনা করো।

১.৭.২ মাঝারি প্রশ্ন

প্রশ্নের মান—১২

১. ন্যায়বিচারের অর্থ লেখো। ন্যায়বিচার সম্পর্কে অ্যারিস্টট্‌লের ধারণা ব্যাখ্যা করো।
২. ন্যায়বিচার সম্পর্কে প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের ধারণার একটি তুলনামূলক আলোচনা করো।
৩. ন্যায়বিচার সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্বগুলির একটি সার-সংক্ষেপ লেখো।

১.৭.৩ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

প্রশ্নের মান—৭

১. ন্যায়বিচার সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণা লেখো।
২. ন্যায়বিচার সম্পর্কে সমষ্টিবাচক তত্ত্বের মূল কথা কী সংক্ষেপে লেখো।
৩. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো ঃ
   (ক) বণ্টনমূলক ন্যায়
   (খ) রল্‌সীয় ন্যায়ের মূল নীতি ও বেশি-কম নীতি
   (গ) সামাজিক ন্যায়

একক ২ ❐ সাম্য

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য
২.২ ভূমিকা
২.৩ সাম্যের অর্থ
২.৪ সাম্যের বিভিন্ন রূপ
২.৫ সাম্যের বিভিন্ন তত্ত্ব ও সাম্যের প্রশ্নে বিতর্ক
২.৬ বার্কার ও ল্যাস্কির ভাবনায় সাম্য
২.৭ উপসংহার
২.৮ গ্রন্থসূচী
২.৯ নমুনা প্রশ্নাবলি
২.৯.১ রচনাত্মাক প্রশ্ন
২.৯.২ মাঝারি উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন
২.৯.৩ সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন

২.১ উদ্দেশ্য

বর্তমান এককে রাষ্ট্রচিন্তা ও রাষ্ট্রতত্ত্বের এক বহু আলোচিত ধারণা সাম্য বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এই এককে প্রধান বিচার্য বিষয় হল ঃ

- সাম্যের অর্থ সম্পর্কে শিক্ষার্থী পাঠককে অবহিত করা এবং সাম্যের বিভিন্ন রূপ কী সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা।
- রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে সাম্য সম্পর্কে যে অভিজ্ঞ ধারণা ও মতামতগুলি রয়েছে তা জেনে নেবার সঙ্গে সঙ্গে সাম্যের তাত্ত্বিক কাঠামো ও বিন্যাসটি কি তা বুঝে নেওয়া।
- সাম্য সম্পর্কে বিংশ শতকের দুই বিশিষ্ট রাষ্ট্রচিন্তাবিদ আর্নেস্ট বার্কার ও হ্যারল্ড ল্যাস্কির (H. J. Laski) ভাবনা-চিন্তাকে সংক্ষেপে উপস্থিত করা।
- আলোচনার সংক্ষিপ্তসার টেনে শিক্ষার্থী পাঠককে এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব উপলব্ধি বা সিদ্ধান্ত কি হতে পারে সে ব্যাপারে সহায়তা করা।

২.২ ভূমিকা ঃ সাম্যের তাৎপর্য

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সাম্যের ধারণাটির গুরুত্ব বা তাৎপর্য পায় প্রধানত তিনটি কারণে (১) সমাজ ও রাষ্ট্র-রাজনীতির জগতে অসাম্য, বৈষম্য, অন্যায় যেভাবে গভীর ক্ষতের মতো বসে গিয়েছে তার প্রেক্ষিতেই সাম্যের প্রশ্নকে বিচার করা জরুরি। সাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই অন্যায়ের উপসম সম্ভব। অসাম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনগুলির মাধ্যমেই অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিকারের চেষ্টা হয়েছে, যদিও সবক্ষেত্রে পুরোপুরি সাফল্য আসে নি। ইতিহাসে প্রমিথিউস ও

স্পার্টাকাসের লড়াই, ইংরেজ বিপ্লব, আমেরিকার বিপ্লব, ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, এশিয়া ও আফ্রিকার গণসংগ্রাম, লাতিন আমেরিকার মুক্তিযুদ্ধ সবকিছুর অভিজ্ঞতা থেকেই সাম্যের তাৎপর্যকে চিহ্নিত করা যায়। (২) সাম্য যে ন্যায়নির্ভর সমাজের ভিত্তি, সাম্যের তাত্ত্বিক ও গবেষকের মতামত থেকেই শিক্ষার্থী সে ধারণা পেতে পারেন। রাষ্ট্রচিন্তার বিকাশে সাম্য যে শুধুমাত্র একটি মূল্যবোধযুক্ত বিষয় (Issue) হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে তা নয়, রাজনৈতিক ভাবধারার বিবর্তনে এর অবদানকে সামনে রেখেও প্রশ্নটিকে বিচার করা যায়। সমতা নতুন জীবনধারা, বিশ্ববোধ, বিশ্ববীক্ষার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে, মানবমুক্তির সম্ভাব্য গ্যারান্টি বলে পরিচিতি পায়, এক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও নাগরিকের দায়িত্ব কী সেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে তুলে ধরে। (৩) সমতার তাৎপর্য শুধু তত্ত্বে নয়, প্রয়োগেও। ন্যায়ের খাতিরে সমতার বিচার বা সমতা দিয়ে স্বাধীনতার বিচার নিঃসন্দেহে যুক্তিযুক্ত, তবে সমতাকে স্বাধীন চিন্তা ও মানবিকতার প্রেরণা হিসাবে দেখা সম্ভব কিনা এ বিষয়টিকে শিক্ষার্থী পাঠক তাঁর বিবেচনায় স্থান দেবেন আশা করা যায়। সমতার যে একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতা আছে এই বাস্তব সত্য আবিষ্কারের মধ্যেই আছে এর প্রকৃত তাৎপর্য।

২.৩ সাম্যের অর্থ

রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে ন্যায়ের মতোই সাম্যের অর্থবিচারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রতাত্ত্বিকেরা দ্বিধাবিভক্ত। অতীতে পিথাগোরিয়ান সমষ্টিভাবনায় পারস্পরিক সহযোগিতা, বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার যে ভাবনা ছিল তা সমতার ভাবধারাকে প্রতিফলিত করেছে। ভারতে বুদ্ধ (Buddha), মোৎসজি (Motsaji), পারস্যে জরাথুস্ত্র (Jarathustra) বা গ্রিসে সফিস্ট ভাবনায় সাম্যের বাণী ছিল। সাম্যের প্রশ্নে সমস্ত লোক জন্মসূত্রে স্বাধীন এবং স্বর্গীয় (ঐশ্বরিক) সম্পর্কে সমান এই ভাবনা চিনে প্রচার করেন মোৎসজি। বুদ্ধের চিন্তায় সাম্যভাব প্রচার পেয়েছে অষ্টমার্গের নৈতিক-আত্মিক ভাবনায়। জরাথুস্ত্র শিখিয়েছেন পারস্পরিক ভালোবাসা, ক্ষমা ও শান্তিতে থাকতে। গ্রিসে সফিস্ট ভাবনা অনুসারে সাম্যের কথা শুনিয়েছেন প্রোট্যাগোরাস : মানুষ নিজেই সব কিছুর পরিমাপক (Man is the measure of all things)। সফিস্ট ভাবনার অন্যান্য আদি পথিকৃৎ হলেন জর্জিয়াস (Gorgias), প্রডিকাস (Prodicus), অ্যান্টিফন (Antiphon) এবং পরবর্তী প্রজন্মের সফিস্ট হিসাবে পরিচিত ক্যালিক্লিস (Callicles), থ্রাসিমেকাস প্রমুখ। এথেন্সের রাজনৈতিক আলোকবর্তিকার অগ্রদূত সফিস্টরা বিশ্বাস করেছেন, প্রত্যেক শ্রেণির মধ্যেই আছে বিশেষ গুণ (জর্জিয়াস)। শ্রম ও দায়িত্বশীলতা, গুণেই সামাজিক প্রগতির সন্ধান পাওয়া যাবে (প্রডিকাস)। আইন ও রাজনীতির অসম ও কর্তৃত্বপরায়ণ প্রবণতার নিন্দা করেন থ্রাসিমেকাস।

> জানবার কথা—অষ্টমার্গ বা অষ্টপথ হল সঠিক দর্শন, সঠিক চিন্তা, সঠিক বাণী, সঠিক কর্ম, সঠিক জীবনযাত্রা, সঠিক প্রয়াস, সঠিক অভিনিবেশ ও সঠিক ধ্যান।

মধ্যযুগে সিসেরোর (Cicero) ভাবনায় সমতার ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে। সিসেরোর মতে, ভুলভ্রান্তি, কু-অভ্যাস ও মিথ্যা মতামত দ্বারা পরিচালিত হলেই মানুষের মধ্যেই সমতাবোধ বাধাপ্রাপ্ত হয়। প্রাকৃতিক আইনের (Jus Naturale) পেছনে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রাধান্য পেলেও সিসেরো এর পেছনে দেখেন মানুষের উপলব্ধি ও সমাজমুখী মন। প্রত্যেক মানুষ এবং প্রত্যেক জাতিভুক্ত মানুষ নিজের বিচারবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা অনুসারে ভালো-মন্দ বুঝতে সমর্থ। একের অপরের উপর প্রভুত্বের নীতি প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সিসেরো সমতার যে অর্থ বা নীতি প্রচার করেছেন সেখানে (১) সমতা হল নৈতিক প্রয়োজন; (২) প্রাকৃতিক আইন এই নৈতিক প্রয়োজনকে স্বীকার করে; (৩) নাগরিক অধিকার পাবার ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে ভেদনীতি বাঞ্ছনীয় নয়; (৪) প্রাকৃতিক আইনের চোখে সব মানুষ, জাতি সমান এবং সহযোগিতা ও আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ।

আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তায় লক (Locke), রুশো, বেন্থাম (Jeremy Bentham) হবহাউস (Hobhouse), বার্কার, ল্যাস্কি সকলের ভাবনায় সাম্যের কথা এসেছে। লক বলেছেন,

- প্রাকৃতিক নিয়ম সমস্ত মানুষের জন্য দাবি করে শান্তি ও নিরাপত্তা।
- স্বাভাবিক অবস্থা হল 'সমতার অবস্থা যেখানে সমস্ত ক্ষমতা ও সমস্ত আইন পারস্পরিক, কেউ কারোর চেয়ে বেশি পাচ্ছে না।, (Selected Philosophical writings, John Locke, P-7-8)

রুশো মনে করেন, আদিম অবস্থায় অর্থাৎ অস্তিত্বের প্রথম পর্বে মানুষ সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যেই ছিল। কিন্তু জ্ঞান ও শিল্পকলার সূচনা, সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই সুখ রইল না। সমতা অন্তর্ধান করলো। মানুষের জীবনে শ্রম আর সম্পত্তির আবির্ভাবের হাত ধরেই এল দাসত্ব ও দারিদ্র। রুশো মনে করেন, সম্পত্তিতে 'আমার-তোমার' ভাবনা থেকেই দেখা দিল অসাম্য। রুশো যখন বলেন 'মানুষ জন্মেই স্বাধীন কিন্তু সর্বত্র শৃঙ্খলে আবদ্ধ' (Man is born free but everywhere he is in chains) তখন তিনি এটাই বোঝাতে চাইলেন নতুন সমাজ ও তার আইন দুর্বলের পক্ষে শৃঙ্খল আর ধনীর পক্ষে ক্ষমতা। (Rousseau : Social Contract) বেন্থাম সাম্যের ব্যবস্থা হিসাবে 'বহুজনের হিতসাধনের' বাণী শোনালেন। হবহাউস সমতার পরিবেশ আবিষ্কার করেন মানুষের নৈতিক ও মানবিক ভাবনার বিকাশে, সমাজ বন্ধনের মধ্যে।

> জানবার কথা—রুশো শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র নয়, জনশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকেই সাধারণের কল্যাণের হাতিয়ার হিসেবে দেখেছেন। রাষ্ট্রের উৎপীড়নমূলক ভূমিকা ও বৈষম্যের মধ্যে তিনি দেখেন সত্যকার রাষ্ট্রের বিচ্যুতি।

সাম্যের মর্মবাণীটি উদ্ধার করা যায় ১৭৭৬ সালে ঘোষিত আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণায় ঃ 'সব মানুষের সৃষ্টি সমানভাবে এবং তাদের দেওয়া হয়েছে কিছু অপ্রত্যর্পণযোগ্য অধিকার (১৭৭৬ সালের স্বাধীনতার ঘোষণা)। ১৭৮৯ সালে ফরাসি মানবিক ও নাগরিক ঘোষণায় প্রায় একই কথা বলা হল ঃ সমস্ত মানুষ স্বাধীনভাবেই জন্মেছে এবং মর্যাদায় ও অধিকারে তারা সমান। ঊনবিংশ শতকেই সাম্যের ভাবনা রীতিমত প্রচারে আসে। সমতা বা সাম্যের প্রশ্নে সাধারণভাবে যে সব অর্থ উঠে আসে তা হল ঃ (১) অধিকার, স্বাধীনতা, বন্ধুত্ব, সহযোগিতা, ভালবাসা, মানবতা, ন্যায়ের গুণাবলি সমতার মধ্যে আছে। (২) সমতা বহু-মাত্রিক ধারণা (Multi-Dimentional) ধারণাগত বৈষম্য থাকলেও এর মূল কথা হল সকলের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া এবং প্রতিটি মানুষকে তার নিজেকে উপলব্ধি করার ব্যবস্থা সৃষ্টি করা। সাম্যের পরিস্থিতিতেই স্বাধীনতার প্রকৃত উপলব্ধি সম্ভব। (৩) ইতিবাচক অর্থে সাম্য হল সকলের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগের ব্যবস্থা। নেতিবাচক অর্থে সাম্য হল বিশেষ সুবিধার অনুপস্থিতি। মার্কস থেকে ল্যাস্কি সকলেই সমতার দর্শনের আধুনিক প্রচারক।

২.৪ সাম্যের বিভিন্ন রূপ

সাম্য ধারণাটির সূক্ষ্ম বিচারের খাতিরে সাম্যের বিভিন্ন রূপ কী সে প্রশ্নও পাঠকের বিবেচনায় থাকা দরকার। সাম্যকে প্রধানত স্বাভাবিক সাম্য, সামাজিক সাম্য, রাজনৈতিক সাম্য, আর্থনীতিক সাম্য—এই ভাবে শ্রেণিবিভক্ত করা যায়।

ক. স্বাভাবিক সাম্য **(Natural Equality)** ঃ স্বাভাবিক সাম্য হল, প্রকৃতি সবাইকে সমানভাবে সৃষ্টি করেছে। প্লেটো বা অ্যারিস্টট্‌লের অসাম্যের ভাবনার বিপরীতে দাঁড়িয়ে নির্বিকারবাদী দার্শনিকেরা (Stoic Philasophers) রোমক চিন্তাবিদ সিসেরো, খ্রিষ্টিয় ভাবনায় 'পিতা ঈশ্বরের রাজ্যে মানুষের অবস্থান ভ্রাতৃপ্রতিম' এই ধারণা প্রচার

পেয়েছে। রুশো তাঁর 'Discourse on the Origin of Inequality' তে বলেছেন নৈতিক ও সরল মানুষ কীভাবে সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ভেদাভেদ ও বৈষম্যের সম্মুখীন হল।

খ. সামাজিক সাম্য **(Social Equality)** ঃ প্রাকৃতিক সাম্য সাম্যের এক আদর্শ ও নৈতিক অবস্থান। সামাজিক সাম্য বাস্তবে সাম্য কী তার কথা বলে। সাম্য ছাড়া যে মানুষের সামাজিক অস্তিত্বই বিপন্ন সামাজিক সাম্যে একথাই বলা হয়েছে। কোনো কৃত্রিম কারণে (জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বংশ, লিঙ্গ বা শ্রেণি ভেদাভেদ) মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ করা চলে না। শিক্ষার সমতা, সামাজিক ক্ষেত্রে সমান নিরাপত্তা এই সাম্যের দৃষ্টান্ত।

(গ) রাজনৈতিক সাম্য **(Political Equality)** ঃ রাজনৈতিক সাম্য হল ক্ষমতার অলিন্দে সকলের সমান প্রবেশাধিকার। রাজনীতির গণতান্ত্রিক পরিবেশ রাজনৈতিক সাম্যের প্রধান শর্ত। রাষ্ট্র শাসনে শ্রেষ্ঠত্ব, প্রভুত্ব, ক্ষমতার অতিরিক্ত কেন্দ্রীভবন রাজনৈতির সাম্যের অন্তরায়। ভোটাধিকার, আইনের চোখে সমানাধিকার (Equality before law), সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে সকলের সমান সুযোগ রাজনৈতিক সাম্যের কিছু দৃষ্টান্ত।

(ঘ) অর্থনৈতিক সাম্য **(Economic Equality)** ঃ অর্থনৈতিক সাম্য ছাড়া অন্যান্য সাম্য অর্থহীন। কাজের অধিকার, মজুরির অধিকার বেকারত্ব ও বার্ধক্যে নিরাপত্তা অর্থনৈতিক সমতার দাবি করে। অর্থনৈতিক ক্ষমতা কতিপয়ের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়া, সমান কাজ ও পরিশ্রমে সমান মজুরির ক্ষেত্রে ভেদাভেদ, কাজের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, কাজের ক্ষেত্রে অবসর বা নিরাপত্তার অভাব অর্থনৈতিক সাম্যের ধারণাকে কলুষিত করে।

(ঙ) সাম্যের অন্যান্য ক্ষেত্র **(Other areas of Equality)** ঃ সমতার অন্যান্য কতকগুলি ক্ষেত্র হল ঃ সঠিক আইনি ও বিচারব্যবস্থার উপস্থিতি, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা, জাতি-রাষ্ট্রের ভেদাভেদ ও বৈষম্যের অনুপস্থিতি এবং মানবাধিকার রক্ষার উপযুক্ত আন্তর্জাতিক বাতাবরণ। ব্যক্তিগত সামর্থ্যে প্রত্যেকেই যাতে সমানভাবে তার অধিকার ভোগ করতে পারে সমতার প্রশ্নে সেটিও এক গুরুত্বপূর্ণ দিক।

২.৫ সাম্যের বিভিন্ন তত্ত্ব ও সাম্যের প্রশ্নে বিতর্ক

সাম্যের প্রকৃতি বিচারে সাম্য বিষয়ক তাত্ত্বিক বিতর্কটিকে তুলে ধরা রাষ্ট্রচিন্তার একটি বিশেষ প্রবণতা। ইতিপূর্বেই শিক্ষার্থী জেনেছেন সাম্যের প্রশ্নে অতীতের এবং আধুনিক ধারণা কী। বর্তমান আলোচনায় বিভিন্ন তত্ত্বকে সামনে রেখে সাম্য বিষয়ে মূল বিতর্কটিকে তুলে ধরার চেষ্টা হবে। অতীতে সাম্যের কোনো তাত্ত্বিক ভিত্তি ছিল না। স্টোয়িক, সফিস্ট দর্শনে সব মানুষই সমান, প্রকৃতির চোখে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ নেই এই ধারণা প্রচারে এলেও বাস্তবের নিরিখে সাম্যের যাচাই হয় নি। অষ্টাদশ শতকেই সাম্যের একটি দার্শনিক ভিত্তি রচিত হয় রুশো, টমাস পেইন (Thomas Paine) প্রমুখের লেখার সূত্রে। সাম্যের অর্থ, প্রকৃত চরিত্র নিয়ে রীতিমত বিতর্ক শুরু হয়ে গেল ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে। এই যুগেই আমরা পেলাম সাম্যের উদারবাদী ও সমাজতান্ত্রিক ভাবনা। এই পর্বেই বেশ কিছু মঞ্চ তৈরি হয়েছে সাম্যের প্রশ্নে রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল ভাবনাকে সামনে রেখে। সাম্যের নব উদারবাদী ভাবনায় (Neo-Liberal) এই প্রবণতা স্পষ্ট। লিঙ্গ-সাম্যের (Gender- Equality) প্রশ্নে নারীবাদী ভাবনাও (Feminism) আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তায় নজর কেড়েছে।

২.৫.১ সাম্যের উদারবাদী ভাবনা

সাম্যের উদারবাদী ভাবনার সূত্রটি লক, রুশো, মঁতেস্কু বা পেইনের আলোচনার সূত্র ধরে গড়ে উঠলেও এর প্রেক্ষাপটটি ছিল পুঁজিবাদ তথা ধনতন্ত্রের বিজয়ের যুগ। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের গর্ভে নতুন যে ধনতান্ত্রিক সমাজ ও সম্পর্কের উদ্ভব

হল এবং রূপলাভ করল তার সূচনা ও বিকাশ ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপ (ইতালি, নেদারল্যান্ড, ব্রিটেন, ফ্রান্স হয়ে উঠেছে পুঁজিবাদের অনুকূল পরিবেশ) হলেও উনবিংশ শতকেই তা জমাট বেঁধেছে। অষ্টাদশ শতকের আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধ ও ফরাসি বিপ্লবের পরিস্থিতি উনবিংশ শতকে একটি পরিপক্ক রাজনৈতিক মতবাদ হিসাবে উদারবাদের উদ্ভবে সাহায্য করেছে। উদারবাদ সমতার প্রশ্নে যে মতবাদকে প্রচার করে তা হল ঃ

- ধর্ম, প্রকৃতিবোধ, সমাজ, রাষ্ট্র সব কিছুকেই বিচারবুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে।
- রাষ্ট্র ও শাসনের রূপ পরিবর্তনের অধিকার জনগণের আছে। জনগণই হবে নতুন ইতিহাসের নির্ধারক শক্তি।
- সমাজের বিশৃঙ্খলা ও অন্যায্যতার প্রশ্নে প্রাধান্য পেল বিচক্ষণ ও ন্যায়পরায়ণ আইন। শাসনের অনাচার রোধে উদারবাদী ভাবাদর্শে স্থান পেল ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রশ্ন, নাগরিক হিতাহিতের ভাবনা এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব এবং সাংবিধানিক-রাজনৈতিক সংস্কার।
- সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে রাষ্ট্রের প্রভুত্বের সীমা নির্ধারিত হল। এই সঙ্গে এটাও বলা হল সাম্যের দাবি কোনো অবিমিশ্র (absolute) দাবি নয়। এর মধ্যে বৈচিত্র্য যেমন থাকবে, প্রয়োজনে এর সীমাও বেঁধে দিতে হবে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি, মানবিকতার প্রেরণা, গণতন্ত্রের দ্রুত বিকাশ আধুনিক কালের দার্শনিক-সামাজিক-রাজনৈতিক ভাবনায় উদারবাদের প্রেরণা সন্দেহ নেই। উদারবাদই গড়ে দিল অধিবিদ্যার (Metaphysics) সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করে বাস্তবতার পথে যাত্রার অভিমুখ। মার্কসের পূর্বে এই অভিমুখ গড়ার কাজ সম্পন্ন করেছেন কান্ট, মিল, বেন্থাম। জ্ঞানের এই ভাবাদর্শ বহুধাপি হলেও বা প্রভেদমূলক হলেও উচ্চমূল্য পেয়েছে এঁদের নরমপন্থা ও নতুনের সঙ্গে মানিয়ে নেবার কারণে। তবে এই উদারবাদী ব্যাখ্যার সীমাবদ্ধতা হল (১) সাম্যের প্রশ্নে কিছু অনুমানকে প্রস্তাবাকারে পেশ করা (যেমন আইনের চোখে সমানাধিকার, সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষের বেশি মাত্রায় হিতসাধন, সামাজিক শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ রক্ষা) হয় মাত্র, বাস্তবে এগুলির কার্যকারিতার প্রশ্নে তেমনভাবে মনোযোগ না দেওয়া (২) ব্যক্তিমালিকানা ব্যবস্থার অবসানের কথা এঁরা বলেন না, সাংবিধানিক সংস্কারের গন্ডি টেনেই এরা সন্তুষ্ট (৩) সাম্যের ক্ষেত্রে সামাজিক-রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত হলেও সমাজ পুনর্গঠনের প্রশ্নে, সামাজিক সম্পর্কের প্রশ্নে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটে নি। অগ্রগতির একটা ধাপেই থেমে যায় সাম্যের নির্মিতি।

২.৫.২ সাম্যের প্রশ্নে মার্কসবাদী ভাবনা

উনবিংশ শতকের রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে মার্কসবাদ এনেছে সম্পূর্ণ নতুন এক প্রবাহ। উনবিংশ শতকেই জার্মানি ও রাশিয়ায় প্রগতিশীল আন্দোলনের একটি ধারা রাজনৈতিক সাহিত্যে ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করেছে এক সারি মনীষীর সৌজন্যে। এঁদের মধ্যে ছিলেন রাশিয়ায় পেস্তেল (Pestel), মুরাভিয়েভ (Muraviev) গের্ৎসেন (Gertsen), দস্তয়েভস্কির (Dostaevaski) মতো একদল বুদ্ধিজীবী। সামাজিক অন্যায় ও পীড়ন এবং স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে একরকম জেহাদ ঘোষণা করেছেন এঁরা। জার্মানিতে একই সময়ে কার্ল মার্কস (Karl Marx), ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস (F. Engels) বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের ভাবনা প্রচার করে বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের কাছে বিপুল শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছেন। সাম্যের প্রশ্নেই বাকুনিন (M. A. Bakunin), প্রুঁধো (P. J. Proudhon) এবং সমকালের নব-হেগেলীয় (Neo-Heglian) বলে পরিচিত আর্নল্ড রুগে (Arnild Ruge), ফয়েরবাখ (Feuerbach) প্রমুখের সঙ্গে বিতর্কে নেমেছেন মার্কস-এঙ্গেলস। সাম্যের প্রশ্নে মার্কসবাদ প্রচার করেছে সমাজ সংগঠনের এক গঠনমূলক ভাবনা। সাম্যের ভাবনায় প্রতিফলিত হল একাধিক নীতি :

- পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আধিপত্য ও শোষণের চরিত্রকে উদ্‌ঘাটন করা;
- প্রলেতারিয়েতকে শাসক শ্রেণির পদে উন্নীত করা, গণতন্ত্রের সংগ্রামে জয়লাভ করা;

- সর্বহারার একনায়কত্ব ও বিপ্লবের মধ্য দিয়ে প্রথমে আসবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং অন্তিমে আসবে সমভোগবাদ;
- সমাজতন্ত্রের সাম্যের নীতি হল 'প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুসারে ও শ্রম অনুসারে প্রাপ্তি'। সমভোগবাদে এই নীতি হল, 'প্রত্যেকের সামর্থ্য ও প্রয়োজন অনুসারে প্রাপ্তি'।
- সমভোগবাদী সমাজে (১) আমলাতান্ত্রিক ও শ্রেণি আধিপত্যযুক্ত শাসন থাকবে না; (২) প্রভুত্ব ও অধীনতার সম্পর্ক দূর হবে; (৩) পুরোনো সমাজের স্থান নেবে সমিতি (৪) প্রতিষ্ঠিত হবে সমবায়, সহযোগিতা (৫) সামাজিক শ্রম, সৃজনী শক্তি সব কিছু মিলে রূপায়িত হবে এক আত্মসক্রিয়তার সমাজ।

সাম্য সম্পর্কে মার্কসবাদের স্পষ্ট অভিব্যক্তি ঃ যতদিন সমাজে শ্রেণিবিরোধ থাকবে ততদিন সমতা অর্জন সম্ভব নয়। সাম্যের দুটি বিশেষ ভাবনা মার্কসবাদে তাৎপর্যপূর্ণ—অর্থনৈতিক সমতা এবং মানবিক সমতা। সমাজতান্ত্রিক সমাজ এই অর্থনৈতিক সমতার ভিত্তি প্রস্তুত ও ক্রমশ দৃঢ় করবে। সমভোগবাদী সমাজ মানবতাবাদী সমাজ। এখানে মানবিক মুক্তি প্রকাশ পায় ব্যক্তি-মানুষের সমগ্র মানুষে (Concept of whole man) রূপান্তরে। প্রকারান্তরে মার্কস যেন রুশোর সেই নৈতিক, উচ্চমূল্যের মানবিক মূল্যবোধকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন সাম্যভিত্তিক এই সমাজে। উদারবাদের মতো সমতা এখানে কোনো সীমিত, নিয়ন্ত্রিত ভাবনা নয়, সম্পূর্ণভাবেই ইতিবাচক। নৈতিক, মানবিক প্রগতির এই ভাবনায় অসাম্য অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেল। এই সাম্যবাদে সকলের সমান সুযোগ থাকবে, প্রত্যেকের চাহিদা ও প্রয়োজন মিটবে কিন্তু শ্রম ছাড়া রুটি মিলবে না। অর্থনৈতিক ক্ষমতার পুঞ্জীভবন রোধ করে, সমষ্টিগত মালিকানা ও সামাজিক শ্রমের ভাবনাকে স্বীকৃতি দিয়ে সাম্যবাদ সমতার ধারণাকে ইতিবাচক ও প্রগতিশীল করেছে।

সাম্যের এই প্রগতিশীল ভাবনা কতটা কার্যকরি ও বাস্তব এ প্রশ্ন বিভিন্ন মহল থেকেই উঠেছে। সমতাবাদের নৈতিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক ভাবনা তার্কিক বিচারে উত্তীর্ণ হয় না। প্রথম প্রশ্ন— কোনো জোর করে চাপানো আবেগ-অনুভূতির আবেদন নয়, সমতাকে বিচার করতে হবে বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরিখে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এটাই আশা করা হয় ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য, পরিস্থিতি ও পরিবেশগত পার্থক্য অনুসারেই সাম্যের ধারণাকে বিচার করা জরুরি। অসাম্য অবশ্যই বর্জনীয়, কিন্তু পার্থক্যের বৈধতা বা প্রয়োজনীয়তাকে ক্ষেত্রবিশেষে যাচাই করে নেওয়া দরকার। বিজ্ঞান চেতনা এটা বুঝতে অসমর্থ নয় যে খোলাখুলি বৈষম্য বা বিভেদের প্রচেষ্টা হলে তার পরিণাম কী হতে পারে। দ্বিতীয়ত, সাম্যের প্রশ্নে অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদ (Economic Determinism) শেষ কথা হতে পারে না। প্রচলিত কাঠামো বা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন, আর্থ-সামাজিক সমতার প্রশ্নে মার্কসীয় রচনাবলি 'জার্মান ভাববাদ' (German Idealism), পুঁজি (Capital), রাজনৈতিক অর্থনীতির সমালোচনার ভূমিকা (Preface to a Critique of Political Economy), দর্শনের দারিদ্র (Poverty of Philasophy) কমিউনিস্ট ইস্তাহার (Communist Manifesto), ফ্রান্সে শ্রেণিসংগ্রাম (Class Struggle in France, 1848-50), গোথা কর্মসূচির সমালোচনা (Critique of Gotha Programme), এঙ্গেলস-এর অ্যান্টি ড্যুরিং (Anti-Duhring) বা লেনিনের 'কী করতে হবে' (What is to be done) অর্থনীতির প্রশ্নকেই বিচার করেছে। পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রবণতাই যে শ্রমিক শোষণের কারণ, উদ্‌বৃত্ত মূল্য গ্রাস করে অসাম্যের যে বীজ রোপিত হয়, শ্রমিকের বিযুক্তির (Alienation) মূল কারণ যে পুঁজির কেন্দ্রীভবন, ধনতান্ত্রিক অমানবিক বৈশিষ্ট্য, অবাধ নীতি, এদিকে তাকিয়ে মার্কস-এঙ্গেলস সমাজ পরিবর্তনের যে বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দেন তা অনস্বীকার্য হলেও, মার্কসীয় নিয়তিবাদ (বুর্জোয়ায় পতন ও প্রলেতারিয়েতের জয়লাভ) শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয় নি। সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব ও ব্যবহারের মধ্যে অসঙ্গতি থেকে গেছে, দলীয় আমলাতন্ত্র ও আধিপত্য শেষপর্যন্ত সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং সমাজতন্ত্রের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে। শ্রমিকের বিপ্লবী চেতনায়, শ্রমিক ঐক্যে ফাটল ধরেছে। সাম্যবাদের কমিউনিস্ট নীতি বিপর্যস্ত হয়েছে সাম্যবাদ অর্জিত হয় নি।

২.৫.৩ সাম্যের নব-উদারবাদী ভাবনা

সাম্যবাদের উদারতত্ত্ব এবং মার্কসীয় তত্ত্ব সরাসরি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে উদারবাদের দক্ষিণপন্থী ব্যাখ্যায়। সমাজের বাস্তব ও যুক্তিসঙ্গত পুনর্গঠন হবে সাম্যের মূল্যে নয়, স্বাধীনতার কথা মাথায় রেখে। উদারবাদের প্রচলিত ফরাসি, ব্রিটিশ বা স্কটিশ ধারায় নয়, এমনকি হবহাউস, গ্রিন বা কল্যাণকামী রাষ্ট্রভাবনা নয়, এঁদের কাছে প্রাধান্য পেল ব্যক্তি স্বাধীনতাকে প্রসারিত করার প্রয়োজনে রাষ্ট্রকে প্রয়োজন মতো ব্যবহার করার নীতি। সমতার নীতি নয়, মুক্ত বাজার হল এঁদের কাছে স্বাধীনতার শর্ত। রল্‌স স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত জীবনের জন্য সাংবিধানিক গণতন্ত্রের নীতিতেই আস্থা প্রকাশ করেছেন। নজিক মনে করেন বোঝাপড়া ও সহযোগিতার নীতি ছেড়ে উদ্যমী ব্যক্তির সঠিক ভাবে অর্জিত সম্পত্তিকে সুরক্ষিত করার কাজে রাষ্ট্র হবে সুরক্ষার শক্তি (Protective agency)। নজিকের মতে, নৈতিকতার এই নতুন সমাজে সমতা নয়, প্রতিযোগিতা, উদ্যোগ, ন্যায্যভাবে সম্পত্তি অর্জনই হল প্রধান কাজ। রাষ্ট্র এই মুক্ত পরিবেশ গড়ে দেবার কাজে নিযুক্ত থাকবে। ইতিপূর্বে হায়েকও বলেছেন প্রতিযোগিতার মধ্যেই আছে সামাজিক উন্নতি, অগ্রগতির উপযুক্ত পথ (হায়েক The Constitution of Liberty 1961, Law, Legislation and Liberty, 1982)।

প্রশ্ন হল নজিক বা হায়েকের তত্ত্ব সাম্যের তত্ত্ব নয়, স্বাতন্ত্র্যবাদী ও ভোগবাদী জীবনের এক বেদ। এঁদের তত্ত্বে রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক হলেও প্রতিযোগিতা ও মুক্ত সমাজের স্বার্থে সীমিত। সমতাভিত্তিক স্বাধীনতার এক তত্ত্ব রলস্ পেশ করেছেন ঠিকই তবে সেখানে মার্কিন গণতন্ত্রের উদারবাদী নীতিই হয়েছে ন্যায় তথা সাম্যভিত্তিক সমাজের আদর্শ। কৌতূহলের বিষয় হল নজিক বা হায়েকের ভাবনায় রলসীয় নীতি একেবারেই মূল্য পায় না, মূল্য পায় না সমান সংরক্ষণের নীতি বা নাগরিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতার নীতি। ঘুরে ফিরে আসে মুক্ত সমাজ, ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বার্থ, যা মার্কসীয় ধারার তো বটেই, রলসীয় ধারার সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে। বিস্ময়কর হল সাংবিধানিক রাষ্ট্র হবে মুক্ত বাজারের গ্যারান্টি—সমতা নয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই নতুন সমাজের শক্তি। প্রশ্ন ওঠে এই নতুন সমাজের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে, এই নতুন সমাজের প্রতি মানুষের আনুগত্যের ভিত্তি নিয়ে।

২.৫.৪ সাম্যের নারীবাদী ভাবনা

রাষ্ট্রচিন্তার সমতার ভাবনাকে নতুন করে ফিরিয়ে এনেছেন নারীবাদীরা। নারীবাদের দৃষ্টিতে মূল প্রতিক্রিয়া হল : রাষ্ট্রতত্ত্বে লিঙ্গ। প্রভুত্বের ভাবনাকে এঁরা নিন্দা করেন, প্রচলিত রাষ্ট্রতত্ত্বের পুরুষতান্ত্রিক স্রোতের তথাকথিত মূল স্রোতের (Melestream or Mainstream) ভাষা, ভাবনা, বিধি নিয়ম এঁরা মানেন না। নারীত্ব নির্মাণের পুরুষতান্ত্রিক ভাষা (সিমোন দ্য বোভোয়ারের কথায় (Second Sex) নারীত্বের সংজ্ঞা, নারীর প্রান্তিকীকরণ (Marginalization) এঁদের কাছে ভেদনীতি বলে চিহ্নিত। এঁদের মধ্যে সমতার ধারাগুলি হল:

১। **উদারবাদী ধারা,** যার মূল কথা রাষ্ট্রতত্ত্বের পুরোনো কাঠামো বজায় রেখে নারীকে এর সঙ্গে যুক্ত করার ভাবনা। ম্যারি উলস্টনক্র্যাফট (Marry Wollstonecraft) এই ভাবনাকে প্রথম প্রচার করেন তাঁর Vindication of the Rights of Women (1972) গ্রন্থে। হ্যারিয়েট টেলর, লুসিক্রিয়া মোট, এলিজাবেথ স্ট্যানটন সকলেই নারীর এই সমানাধিকার নীতির সমর্থক।

২। র‍্যাডিকাল ধারা: এঁদের মতে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব আজ অচল হয়ে পড়েছে। এঁদের দৃঢ় ধারণা হল প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের সমালোচনা করো, আবার নতুন করে গড়ো। পুরুষতন্ত্রের নির্মিত তত্ত্বকে ভেঙে এঁরা চান নারীর সপক্ষে আমূল সংস্কারবাদী ভাবনা।

৩। বিনির্মাণের তত্ত্ব : এক্ষেত্রে মূল ভাবনা হল তর্ক ও বিতর্কের মধ্যে পুরোনোকে জানা, তাকে সমালোচনা এবং তার পুনর্বিন্যাস। বিনির্মাণ ও পুনর্বিন্যাসের এই ধারাই' 'descrontruction, Reconstruction' নামে পরিচিত হল।

নারীবাদ সমতার প্রশ্নে গৃহবধূর নৈতিকতা ছেড়ে, বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা ছেড়ে, প্রচলিত ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত বিতর্ক (Private-Public Debate) অতিক্রম করে লিঙ্গ-সাম্যের ভাবনাকেই শেষপর্যন্ত লালন করতে চায়। পুরুষের মতোই তাদের অধিকার ও ক্ষমতার জগতে সমতা আসুক, নারীকে নিয়ে সংগঠিত ভাবনা চলুক, জাতীয় সীমা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নারী আন্দোলন বিস্তারিত হোক, সন্ত্রাস ও বিশ্বায়ন সৃষ্ট বিপন্নতা কাটিয়ে নারীজাগরণের নতুন গতি আসুক—এটাই নারীবাদী রাজনীতির নতুন গতি।

২.৬ সাম্যের প্রশ্নে বার্কার ও ল্যাস্কির মতামত

রাষ্ট্রচিন্তার নানা ধারার নিরিখে সমতার ভাবনাকে বিচার করে আলোচনার এই অংশে সমতার প্রশ্নে দুই যশস্বী ব্যক্তিত্বের বক্তব্যের সারাংশ তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে প্রধানত বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থী কোনো নতুন ভাবনার খোরাক পেতে পারেন এই সম্ভাবনাকে সামনে রেখে। ইংরেজ বৌদ্ধিক ঘরানায় লালিত বার্কার সাম্যের কোনো তাত্ত্বিক ভাবনায় না গিয়ে সমতাকে অধিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি ধারণা হিসাবেই ভেবেছেন এবং ব্যক্তি ও সমাজজীবনে এর তাৎপর্যকে বিচার করেছেন। সাম্যের প্রশ্নে বার্কারের ভাবনার নির্যাস হল:

* সাম্য অধিকার বণ্টনের এক পদ্ধতিগত নিয়মাবলি, যা ন্যায়ের অনুসরণে গঠিত এবং ন্যায় থেকে উদ্ভূত এক নিয়ম।
* সাম্য হচ্ছে শুরু, সমাপ্তি নয়। এর সমাপ্তি নির্ভর করে মানুষের উপর। মানুষ একে কীভাবে নেবে, এর জন্য কি করবে এটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এটি একার ব্যাপার নয়, সকলের।
* সাম্যের দুটি দিক—আইনগত ও সামাজিক সাম্য। আইনগত সাম্য হল আইনের চোখে সাম্য। বৈধ সংস্থা রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে নাগরিক এই সমতা ভোগ করে। আইনগত সাম্য এলেই ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ হবে তা নয়। চাই সামাজিক সাম্য। পরিপূর্ণ শিক্ষা দিয়ে মানুষের সামর্থ্যকে সমান করা বা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ দ্বারা মানুষের আর্থিক সঙ্গতির সমতাবিধানই হল সামাজিক সাম্য।
* বার্কার বলেন, সমতা পরিবর্তনশীল ধারণা। আগে ধারণা ছিল সামাজিক যোগ্যতা অর্জন করলেই সাম্যের আইনগত যোগ্যতা আসে। আজকের দাবি হল আইনের যোগ্যতার গুণেই সামাজিক যোগ্যতা আসবে।
* বার্কার মনে করেন আইনের চোখে সমতার ধারা গ্রাহ্য হলেও আইনগত সমস্যা থেকেই গেছে। অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্যয়ভার বহনে অসাম্য থাকলে সকলের পক্ষে অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সমান ক্ষমতা লাভ সম্ভব নয়।
* সামাজিক সাম্য প্রসঙ্গে বার্কারের মতামত শিক্ষাপ্রদ :

১। আজও আর্থিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সাম্যের সমস্যা আছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে অসাম্য দূর করার ব্যবস্থা হলেও কতিপয়ের সঙ্গে অধিকাংশের ব্যবধান থেকেই গেছে। ওই ব্যবধান সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে সাম্য বজায় না থাকার কারণ হল মানসিক আগ্রহ ও ক্ষমতার দিক থেকে মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য এবং কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে মানসিক উপাদনের বিভিন্নতা।

২। আর্থিক ক্ষেত্রে সমবণ্টনের পথ দুর্গম। কারখানা আইনের মাধ্যমে কিছু ব্যবস্থা হলেও এক্ষেত্রে বিংশ শতকের আগে সমস্যার সুরাহা হয়নি। মর্যাদার প্রশ্নে পরিচালক ও কর্মীদের মধ্যে সমান অবস্থা সৃষ্টি সম্ভব কিনা এবং সম্পত্তি ও আয়ের ক্ষেত্রে বণ্টনের অসাম্য সংশোধন বা তার পদ্ধতিগত প্রশ্নে সমস্যা আছে। রাষ্ট্র এক্ষেত্রে এগোলেও (যেমন ধনীদের আয়ের উপর তারতম্যমূলক কর স্থাপন করে পুঁজির কেন্দ্রীভবন রোধ বা আইনের সাহায্যে গরিবের আয় বৃদ্ধি) অসাম্য থেকেই গেছে।

* বার্কার মনে করেন আইনগত সাম্যকে বাস্তবায়িত করতে গেলে আর্থিক সাম্য একান্ত প্রয়োজন। সম্পত্তি অর্জনের ক্ষেত্রে অসাম্যকে সংশোধন করা প্রয়োজন নৈতিকতার স্বার্থেই।

সাম্যের প্রশ্নে ল্যাস্কির ভাবনা অবশ্যই চিত্তাকর্ষক। বার্কার সাম্য ও স্বাধীনতার প্রশ্নে স্বাধীনতাকে আগে রেখেছেন। তাঁর যুক্তি সাম্য বিভাজন আনে, কিন্তু স্বাধীনতার লক্ষ্য মানুষকে একত্রিত করা। ল্যাস্কি স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে এই ধরনের পার্থক্য করেন না। তিনি মনে করেন, স্বাধীনতা ও সাম্য একই আদর্শের দুটি পিঠ। সাম্য স্বাধীনতার উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করে। সমতা হল স্বাধীনতার বাস্তবায়ন। অ্যালেক্স তকভিল (A. Tocqueville) বা লর্ড অ্যাকটনের (Lord Acton) মতো সাম্য বলতে তিনি সকল মানুষের প্রতি একই আচরণ (Identity of Treatment) বোঝেন না। আবার সমতা বলতে একথাও মানেন না সবার শ্রমের সমান পুরস্কার থাকবে। সমতার প্রশ্নে তিনি মনে করেন, সকলের ব্যক্তিত্বের বিকাশে সমান সুযোগ। বার্কার সমতার প্রশ্নে রাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন নি কিন্তু আইনি সংশোধন চেয়েছেন। লাস্কি কিন্তু সমতার ব্যাপারে রাষ্ট্রের কৃতিত্ব তেমন উল্লেখযোগ্য এমনটা মনে করেন না। তিনি লক্ষ করেছেন, একজনের পরাধীনতার মূল্যেই এসেছে অন্যের স্বাধীনতা। অসাম্যের জগতে কতিপয়ের ইচ্ছাই মর্যাদা পেয়েছে এবং রাষ্ট্রের উপর তারাই আধিপত্য করেছে।

সাম্যের তিনটি মানদণ্ড উপস্থিত করেছেন ল্যাস্কি : (১) কোনো বিশেষ সুবিধার উপস্থিতি থাকবে না। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কার্যালয়ে চাকরি পাবার ক্ষেত্রে নাগরিকের মধ্যে কোনো পৃথকাচরণ করা যাবে না। (২) সকলের পর্যাপ্ত সুযোগের খোলাখুলি উপস্থিতি থাকবে। সমতার এই ব্যবস্থায় প্রতিটি নাগরিকই যাতে তার মন ও বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করার সুযোগ পায়, বিশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতিভার অপচয় না ঘটে, প্রত্যেক কাজের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ থাকে সেটা দেখতে হবে। (৩) সামাজিক লভ্যাংশের ভাগ সকল নাগরিককে কীভাবে দেওয়া যাবে সমতা হল এই সমানুপাতিকতার সমস্যা। এটি মূলত অর্থনৈতিক সমস্যা, ল্যাস্কির মতে এ হলো প্রাথমিক প্রয়োজনের পর্যাপ্ততার সমানুপাতিকতা। একদল অভুক্ত থাকবে আর অন্যদল পর্যাপ্তভাবে পাবে এই বিভেদের অপসারণ চাই। এর অর্থ সকলকে একই হারে বেতন বা আর্থিক সুবিধা দেওয়া নয়। দেখা দরকার এক্ষেত্রে ব্যাপক কোনো ব্যবধান যেন না থাকে। ল্যাস্কি চান মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে সম্পদের প্রয়োজন বা মূল্য নির্ধারিত হোক। ল্যাস্কি চান শুধু সম্পদের সমতা নয়, আর্থিক ক্ষমতারও সমতা। এর জন্য প্রয়োজন শিল্পের জগৎ থেকে শৃঙ্খলমুক্ত দায়িত্বহীন ইচ্ছার অপসারণ অর্থাৎ সঠিক নীতির ভিত্তিতে গৃহীত হোক সিদ্ধান্ত। জনস্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত শিল্পগুলির (ব্যাংক, কয়লা, বিদ্যুৎ, পরিবহণ, খাদ্য ও বাসস্থানের যোগান ইত্যাদি) ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও সরকারি নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক সমতার স্বার্থেই। ল্যাস্কি চান না শিল্পক্ষেত্রে প্রভু-ভৃত্যের এক যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াক (Laski : Grammar of Politics)।

পুঁজিবাদ নয়, ল্যাস্কির আস্থা সমাজতন্ত্রে। জনগণের সামাজিক স্বার্থ ও আর্থিক নিরাপত্তার স্বার্থে সমাজতন্ত্রকেই তিনি স্বাগত জানান তাঁর 'Liberty in Modern State' 'Democracy in Crisis' প্রভৃতি গ্রন্থে। তবে সমাজতান্ত্রিক সমাজের কঠোর ও নিষ্পেষনের শাসন নিয়েও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি চান সেই সমাজতন্ত্র, সুস্থ জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র হবে যার ভিত্তি। সাম্যের প্রশ্নে তাঁর সুপারিশ আর্থিক ও রাজনৈতিক পীড়ন নয়, মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটুক, রাষ্ট্র হয়ে উঠুক দায়িত্বশীল।

২.৭ উপসংহার

ন্যায়বিচারের মতো সাম্যের প্রশ্নে রাষ্ট্রতাত্ত্বিকদের মধ্যে ঐকমত্য নেই। সাম্যের অর্থ বিচারেই হোক বা তাত্ত্বিক নির্মাণেই হোক এক্ষেত্রে মূল বিতর্ক হলো সাম্যের মান বা মাত্রা কি হবে এবং সাম্যের সঠিক পরিবেশ কোনটি। রক্ষণশীল, প্রতিক্রিয়াশীল, প্রগতিশীল কত কথাই না সাম্যের প্রশ্নে এসে পড়েছে। বিংশ শতকে সাম্যের ভাবনায়

লিঙ্গ-সাম্যের প্রশ্নও বিচারে এসেছে। সাম্যের সঙ্গে আইন, স্বাধীনতা, গণতন্ত্রকে সম্পর্কে এনে আলোচনা চলেছে। সমতা যে রাজনীতির স্তরেই বাঁধা পড়েনি, অর্থনীতিই যে এর মূলাধার রাষ্ট্রচিন্তায় এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসটি লক্ষণীয়।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই সাম্যের গতি অমোঘ। সাংবিধানিক-আইনি ব্যাখ্যা এই অমোঘ গতির ন্যায্যতা আংশিকভাবে প্রতিপাদন করেছে এবং এর তীব্রতা অনুভূত হয়েছে র‍্যাডিক্যাল তথা সাম্যবাদী ভাবনায়। সাম্য যে কোনো অলীক ভাবনা নয় শিক্ষার্থী পাঠক একথা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। শুধু তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে নয়, রাষ্ট্রভেদে সাম্যের অবস্থান যে এক থাকে না, এটাও লক্ষণীয়। সঠিক প্রয়োগেই ধারণাটি সফল রূপ পেতে পারে। সমতার পক্ষে সামাজিক আন্দোলন ও জনমত সৃষ্টিই এক্ষেত্রে শেষ কথা।

জানবার কথা—সমতা হল সামাজিক বিকাশের চালিকা শক্তি, স্বাধীনতা ও অধিকারের গ্যারান্টি।

২.৮ গ্রন্থসূচী

১. William T Bluhm : Theories of the Political System. Classical Political Thought and Modern Political Analysis (Prentice Hall of India, 1981)

২. Subrata Mukherjee, Sushila Ramaswami : A History of Political Thought: Plato to Marx (Prentice Hall of India Private Limited, New Delhi 2002)

৩. J. C. Johari : Contemporary Political Theory Basic Concepts and Major Trends (Sterling Publishers Pvt Ltd New Delhi, 1980)

৪. E. Barker : Principles of Social and Political Theory (London, Oxford University Press, 1951)

৫. Harold. J. Laski : A Grammar of Politics (George Allen and Unwin, London, 1951)

৬. দেবাশিস চক্রবর্তী : রাষ্ট্রবিজ্ঞান : তত্ত্ব ও প্রতিষ্ঠান (সেন্ট্রাল এডুকেশন্যাল এন্টারপ্রাইজেস (প্রা.) লিমিটেড কলকাতা (২০১২); রাষ্ট্রচিন্তার ধারা (ওই, ২০১২)

২.৯ নমুনা প্রশ্নাবলি

২.৯.১ রচনাত্মক প্রশ্ন (বড়ো)

প্রশ্নের মান ১৮

১. রাষ্ট্রচিন্তার অন্যতম বিষয় হিসাবে সাম্য ধারণাটির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করো।

২. সাম্য সম্পর্কে উদারবাদী ও মার্কসবাদী ভাবনা ব্যাখ্যা করো।

৩. সাম্যের অর্থ ও বিভিন্ন রূপ কী কী আলোচনা করো।

২.৯.২ মাঝারি ধরনের প্রশ্ন

প্রশ্নের মান ১২

১. সাম্যের বিভিন্ন রূপগুলি বর্ণনা করো।
২. সাম্য সম্পর্কে বার্কার ও ল্যাস্কির ভাবনা বিষয়ে আলোচনা করো
৩. মন্তব্য সহ সাম্যের উদারবাদী ব্যাখ্যাটি বিশ্লেষণ করো।

২.৯.৩ সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

প্রশ্নের মান ৭

১. সাম্যের অর্থ বিচার করো।
২. সাম্যের মার্কসীয় ভাবনা সংক্ষেপে লেখো।
৩. টীকা লেখো :
(ক) সাম্য সম্পর্কে নব উদারবাদী ধারণা
(খ) সাম্য সম্পর্কে নারীবাদী ভাবনা
(গ) বার্কারের বিশ্লেষণ অনুসারে আইনগত ও সামাজিক সমতা
(ঘ) ল্যাস্কির বিশ্লেষণ অনুসারে সাম্যের তিনটি মানদণ্ড।

একক ৩ ☐ স্বাধীনতা

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য
৩.২ ভূমিকা
৩.৩ স্বাধীনতার অর্থ
৩.৪ স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ ও রক্ষাকবচ
৩.৫ স্বাধীনতার বিভিন্ন তত্ত্ব
৩.৬ উপসংহার
৩.৭ গ্রন্থসূচী
৩.৮ নমুনা প্রশ্নাবলি
৩.৮.১ রচনাত্মক প্রশ্ন
৩.৮.২ মাঝারি প্রশ্ন
৩.৮.৩ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

৩.১ উদ্দেশ্য

বর্তমান এককের উদ্দেশ্য হল

(১) রাষ্ট্রচিন্তায় স্বাধীনতা কথাটির তাৎপর্য চিহ্নিত করতে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা।

(২) স্বাধীনতার অর্থ নির্ণয়ের মাধ্যমে ধারণাটিকে উপলব্ধি করতে সহায়তা করা এবং স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপগুলি সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কোন্ পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা স্বার্থক হয়ে ওঠে প্রসঙ্গত সেটাও বিচার্য্য।

(৩) স্বাধীনতার প্রশ্নে যে তাত্ত্বিক বিতর্ক আছে তাকে বিচার-বিশ্লেষণ করা এবং

(৪) স্বাধীনতার বিচারে একথাই প্রতিষ্ঠা করা যে অবিমিশ্র নয়, স্বাধীনতা একটি আপেক্ষিক (Relative) ধারণা।

৩.২ ভূমিকা

রাজনীতির জগৎকে প্রতিফলিত এবং সক্রিয়ভাবে অভিব্যক্ত করে যে চেতনা তা হল মানুষের স্বাধীনতার চেতনা। রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাস গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় কখনও স্বাধীনতার লক্ষ্য হয়েছে ক্ষমতা, কখনও তার অভিমুখ হয়েছে মুক্তির সংগ্রাম, আবার কখনও তা হয়েছে প্রকৃত সত্য ও যুক্তির পথে চলার পরম উপলব্ধি। স্বাধীনতার বোধ ও মানের ক্ষেত্রে অতীতে ও মধ্যযুগে সচেতনভাবে কোনো তাত্ত্বিক মডেল গড়ে ওঠে নি। দার্শনিক-রাজনৈতিক অবস্থানটি এই সময় একটা ছকে-বাঁধা পথেই চলেছে। রেঁনেসাসের যুগ থেকে পরবর্তী বছরগুলিতে (বেশ কয়েক শতক ধরে) দৃষ্টিভঙ্গিগত একটা পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। রাষ্ট্র শিল্পকর্মের এই নতুন ধারায়, রাষ্ট্র-রাজনীতির জ্ঞান-বিজ্ঞানে স্বাধীনতা সম্পর্কে তাত্ত্বিক জ্ঞান ও মডেল নির্মাণের ধারাবাহিকতায় স্থান করে নিল স্বাধীনতার চর্চা। স্বাধীনতার এই চর্চায় সকলেই যে স্বাধীনতার পক্ষে বলেছেন তা নয়। স্বাধীনতা ও অধীনতার প্রশ্নে রাষ্ট্রের ভূমিকা কি

হবে এ প্রশ্নে কারোর অবস্থান নরমপন্থী, কারোর বা চরমপন্থী। অন্যদিকে স্বাধীনতার প্রশ্নে নাগরিকের অবস্থানও দ্বিমেরুতে। কেউ চান অবাধ স্বাধীনতা, অর্থাৎ স্বাধীনতার প্রশ্নে কোনো আপস নয়। আবার এই স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন সমতাবাদীরা। তাঁরা চান স্বাধীনতা ও সমতার সহাবস্থান।

রাষ্ট্রতাত্ত্বিকেরা রাষ্ট্র ও নাগরিকের এই অবস্থানের দিকে লক্ষ রেখেই নির্মাণ করেন স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁদের তত্ত্ব। উদারবাদ, জাতীয়তাবাদ, মার্কসবাদ, নারীবাদ, নব উদারবাদ, সমষ্টিবাদ—রাষ্ট্রতত্ত্বে স্বাধীনতার প্রশ্নে সকলের ভাবনাই গুরুত্ব পেয়েছে। তবে মূল তাত্ত্বিক বিবেচনা অর্থাৎ স্বাধীনতা যে তাৎপর্যপূর্ণ এবং রাষ্ট্রচিন্তায় এর আবেদন যে গভীর সে প্রশ্নে কোনো সংশয় নেই। স্বাধীনতার তাৎপর্য সম্পর্কে প্রথমেই বলা যায়, এর একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে এবং ধারণাটির ঐতিহাসিকতাকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, এত বহুল প্রচলিত এবং বহুচর্চিত ধারণা দ্বিতীয়টি আর আছে কিনা সন্দেহ। ন্যায়, সাম্য, অধিকার সব কথাই আলোচনা ও বিতর্কে আসে, কিন্তু স্বাদে, গন্ধে আনন্দে ভরপুর এমন এক পরিবেশের স্থান মানুষের মনে আসে সর্বাগ্রে। স্বাধীন ব্যক্তি, স্বাধীন জাতি, স্বাধীন দেশ—কথাগুলি কতটা অর্থবহ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কথায় আর প্রয়োগে ব্যবধান থাকলেও, প্রাপ্তিতে অনিশ্চয়তা ও সংশয় থাকলেও স্বাধীনতার সন্ধান ও এর সুরক্ষার তাগিদটাই শেষ পর্যন্ত থেকে যায়। তৃতীয়ত স্বাধীনতার দীর্ঘ ঐতিহ্য, এর সুখানুভূতি, একে রক্ষা করার তাগিদ স্বাধীনতাকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে তাতে কোনো প্রশ্ন নেই। মূল প্রশ্ন হলো স্বাধীনতার প্রাসঙ্গিকতা বিচার হবে কোন্ পথে? এথেন্সের গণতান্ত্রিক মানে অথবা সক্রেটিসের মহৎ জ্ঞানের মানে (জন স্টুয়ার্ট মিল যেভাবে ভেবেছেন) অথবা জনসম্মতি, সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা জন অংশগ্রহণের আধুনিক গণতন্ত্রের ভাবনাকে সঙ্গী করে অর্জিত হবে প্রকৃত স্বাধীনতা—এসব প্রশ্নই স্বাধীনতার বিচারে আসে সর্বাগ্রে।

৩.৩ স্বাধীনতার অর্থ

স্বাধীনতার অর্থ বিচারে একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হলো 'স্বাধীনতা' (Freedom) না 'মুক্তি' (Liberty) —ধারণাগতভাবে কোন্‌টি প্রাসঙ্গিক? রাষ্ট্রতাত্ত্বিকদের মধ্যে এ প্রশ্নে মতভেদের অবকাশ থাকলেও বা কোনো কোনো মহলে স্বাধীনতার চেয়ে 'মুক্তি' কথাটি বেশি অর্থবহ মনে হলেও, বর্তমান আলোচনায় কথাদুটিকে বিনিময়যোগ্য ভেবেই বিচার করা হয়েছে। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ স্বাধীনতার উপর রাষ্ট্রতত্ত্বে আরোপ করা না হলেও একথা বলা হয় বা ভাবা হয় : মানুষ স্বাধীন এই অর্থে যে সে নিজের অধীন। স্বাধীনতা হল মুক্ত বাতাসের মতো যা স্বচ্ছন্দে বহমান, ব্যাহত হলেই এর গতি রুদ্ধ হয়। অন্যদিকে উদারবাদী মহলে 'মুক্তি' কথাটিই প্রচলিত এবং লাতিন 'Liber' কথাটি থেকে এর উৎপত্তি। মুক্তি কথাটি নিয়ে মতভেদ আছে। পরবশ্যতা বা বন্ধন থেকে মুক্তি, শাসন থেকে মুক্তি, মিথ্যা বা অসাড় যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত চিন্তা থেকে মুক্তি (জেফারসন)—নানা কথাই এ প্রসঙ্গে উঠে আসে। মিল 'মুক্তি' কথাটি সামনে রেখেই বলেছেন, 'আমি হলাম পিটার, যে তার প্রভুকে মানে না ('And I am Peter, Who denied his Master—Autobiography') অল্প বয়সেই বিজ্ঞ, জ্ঞানী মিল সুখবাদের মোহ ত্যাগ করে, পাটিগণিতিক নিয়ম ছেড়ে গুণের বিচারেই আসক্ত হন। তিনি স্বাধীনতার উপর যে ধ্রুপদী ব্যাখ্যা দেন তার শিরোনাম 'On Liberty.' পুস্তকাকারে প্রকাশিত বইটি হলো 'Utilitarianism, Liberty and Representative Government (1864)। তাঁর কথায়, স্বাধীনতা হল একমাত্র বস্তু যা মানুষ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে পেতে চায় (The sole end for which mankind are warranted individually and collectively)। তাঁর মতে, নিজেকে বাঁচানোই (Self-protection) স্বাধীনতা। স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত উক্তি ঃ নিজের উপর, নিজের মন ও দেহের উপর মানুষ সব কিছুর ঊর্ধ্বে (Over himself, over his body and mind individual is supreme)। ইতিপূর্বে লক স্বাধীনতাকে দেখেছেন স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গ্যারান্টি হিসাবে; কান্ট যুক্তিবাদী মানুষকে ও তার ভালোমন্দ বিচারের ক্ষমতাকে বলেছেন স্বাধীনতা। মঁতেস্কুর

(Montesquieu) বিচারে স্বাধীনতা হল সরকারি স্বেচ্ছাচার ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিষেধ। সরকারি ক্ষমতার বণ্টনকেই তিনি স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে দেখেন। স্বাধীনতাকে 'মুক্তির সংগ্রাম' হিসাবে (act of Liberation) দেখেছেন উদারবাদীরা। বার্কার মনে করেন, স্বাধীনতা হল আইনগতভাবে স্বীকৃত অধিকার ভোগের ক্ষমতা (Liberty ..... is legally recognised power of enjoying the rights)। বার্ক (Edmond Burke) বলেন, স্বাধীনতা হবে মনুষ্যোচিত, নৈতিক ও নিয়ন্ত্রিত। বার্কারেরও মত, স্বাধীনতা নৈতিক ব্যক্তিত্বের সর্বোচ্চ মূল্যবোধ থেকে উদ্ভূত বলে তা ব্যক্তির প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। আপেক্ষিক ও নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতাকে বার্কার স্বাধীনতার সর্বজনীন ও সর্বাধিক মাত্রা হিসাবেই ভাবেন। এক্ষেত্রে স্বাধীনতা হল, অন্যের সমপরিমাণ ও অনুরূপ স্বাধীনতার সঙ্গে প্রত্যেকের স্বাধীনতা ভোগের ক্ষমতা এবং স্বাধীনতা ভোগের জন্য চাই সুনির্দিষ্ট কিছু কর্মক্ষমতার উপলব্ধি (Barker, Principles of Social and Political Theory)

স্বাধীনতা কথাটিকে আরও সোজাসুজি ও প্রাঞ্জলভাবে পেশ করেছেন অধ্যাপক ল্যাস্কি। স্বাধীনতা বলতে তিনি বুঝেছেন : সেই পরিবেশের সযত্ন সংরক্ষণ যার মধ্য দিয়ে মানুষ নিজেকে উপলব্ধি করার সুযোগ পাবে ('By Liberty I mean the eager maintenance of that atmosphere in which men have the opportunity to be their best selves'—A Grammar of Politics)

স্বাধীনতা বলতে ল্যাস্কি কিন্তু নিয়ন্ত্রণবিহীনতাকে বোঝেন না। তাঁর স্পষ্ট উপলব্ধি, স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণবিহীন নয়। হত্যা করার অধিকার থেকে বিরত করে, রাষ্ট্র আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। চলাচলের নির্দেশ মেনেই আমাকে গাড়ি চালাতে হবে। সন্তানদের শিক্ষা দেবার কথা বলে রাষ্ট্র আমার স্বাধীনতা কেড়ে নেয় না। স্বাধীনতার প্রশ্নে ল্যাস্কি তিনটি শর্ত পরিপূরণের কথা বলেন : (১) বিশেষ সুবিধার অনুপস্থিতি (২) কিছু সংখ্যকের খেয়ালখুশি বা অনুগ্রহের উপর স্বাধীনতা নির্ভরশীল নয় (৩) রাষ্ট্র পক্ষপাতদুষ্ট হবে না।

ল্যাস্কির স্বাধীনতা চিন্তা একটি স্থির বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে থাকে নি ভেবে অনেকেই ল্যাস্কির ভাবনার সঙ্গে সহমত প্রকাশ করেন নি। গ্রিনের উদারবাদ তাঁর স্বাধীনতা ভাবনায় স্থান পেয়েছে, আবার A Grammar of Politics এর (1925) পরবর্তীকালে লিখিত 'Liberty in the Modern State' (1930) গ্রন্থে তিনি ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রশ্নে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে প্রতিকূল ভেবেছেন। 'Grammar' এ ল্যাস্কি সমাজতান্ত্রিক চিন্তার অনুগামী হলেও তাঁর অবস্থান কখনও বহুত্ববাদী, কখনও আন্তর্জাতিকতাবাদী। আবার পরবর্তীকালে তাঁর ভাবনা মিলে মিশে যায় খ্রীষ্টীয় সমাজবাদ ও ফ্যাবিয়ান সমাজবাদের ধারায়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, মানবিক চেতনা, সামাজিক কল্যাণ তাঁর ভাবনায় এসেছে, আবার একথাও ঠিক সমাজ ও প্রতিষ্ঠানের অসম ও অন্যায় নীতির বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়েছেন। রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক শাসনের কঠোরতা ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক একথা তিনি বলেছেন, আবার ব্রিটিশ শ্রমিক পার্টির শৃঙ্খলার নামে আধিপত্য, কঠোর শাসনের নিন্দা করতেও তাঁর বাধে নি।

স্বাধীনতার ভাবনায় নৈতিকতা, উদার ও সংযমী উপলব্ধি, গণতন্ত্রের আবেদন, সমাজতন্ত্রের আকর্ষণ, সমাজের বিচিত্র ও প্রতিযোগী মূল্যের ঘাত প্রতিঘাত—নানা কথাই এসেছে। স্বাধীনতার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় এই আলোচনা আসবে। তবে স্বাধীনতার ধারণাগত উপলব্ধি আরও সহজ ও সরল হতে পারে যদি এ বিষয়ে তাত্ত্বিক জটিলতার মধ্যে যাওয়ার আগে স্বাধীনতার রূপ কি বা কেমনভাবে একে পাওয়া সম্ভব সে বিষয়ে শিক্ষার্থী পাঠক কিছু জেনে নিতে পারেন। পরবর্তী এককে এ বিষয়েই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

> জানবার কথা—নিয়ন্ত্রণের অনুপস্থিতি (absence of restraint) এবং নিয়ন্ত্রণের চাপ (Burden of Constraint)—স্বাধীনতার প্রশ্নে কোনটি বড়ো এ প্রশ্নের মীমাংসা আজও হয় নি। মূল কথা হল স্বাধীনতা নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করেই চলবে।

৩.৪ স্বাধীনতার নানা রূপ ও রক্ষাকবচ

স্বাধীনতার অর্থ স্পষ্ট হয় স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপগুলিকে বোঝা গেলে। মিল, ল্যাস্কি, মার্কস সকলেই এ প্রসঙ্গে এসেছেন। প্রধানত প্রাকৃতিক, সামাজিক, ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক—স্বাধীনতার বিভিন্নরূপকে এইভাবেই শ্রেণিবিভাজন করা হয়। এক্ষেত্রে কিছুটা অন্যভাবে বিভাজনটি এসেছে।

(১) **প্রাকৃতিক স্বাধীনতা (Natural Liberty) ঃ** এটি হল স্বাধীনতার পূর্ণ প্রকাশ। এক্ষেত্রে যেমন ইচ্ছা চল, যেমন খুশি চল, এরকম এক স্বর্তঃস্ফূর্ত ধারণাই চালু। প্রকৃতির রাজ্যে এ স্বাধীনতা ছিল, পৌর সমাজে এই স্বাধীনতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে, হব্‌স এরকমই মনে করেন। প্রায় একই কথা অন্য সুরে বলেছেন রুশো। রুশো আদিম কালের রীতিনীতি, সরলতার মধ্যে দেখেন স্বাধীনতা, যা প্রকৃতির হাতেই সজ্জিত। আদিম সমাজে সম্পত্তি ছিল না, আপন-পর ভেদ ছিল না। তবে এই অবস্থা শেষ পর্যন্ত সম্ভব ছিল না। সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে স্বাভাবিক স্বাধীনতার এই যুগ শেষ পর্যন্ত সম্ভব ছিল না। সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে স্বাভাবিক স্বাধীনতার এই যুগ শেষ হল। চুক্তির মাধ্যমে মানুষ পেল পৌর স্বাধীনতা। সামাজিক চুক্তিতে রুশো সমিতির এমন এক রূপ সন্ধান করলেন যাকে বলা হল 'সাধারণের ইচ্ছা' (General will)। এই ইচ্ছার বলে প্রত্যেকে সবার সঙ্গে মিলিত হবে। সম্পত্তি ও স্বাধীনতা যা কিছু দিয়েছে প্রত্যেকের তার ওপর অধিকার আছে। সমগ্রেই আছে তার অভিপ্রায়, অহংবোধ, আবার এর মধ্যেই সে খুঁজে পায় জীবন ও ঐক্যের মূল্য।

(২) **সামাজিক স্বাধীনতা (Social Liberty) ঃ** এটি হল সামাজিক সংগঠনের সদস্য হিসাবে মানুষের স্বাধীনতা। এখানে স্বাধীনতা থাকবে সামাজিক আনুগত্য ও বাধ্যবাধকতার সীমায়। স্বেচ্ছাচার, আগ্রাসন, দমন নয়, এর মধ্যেই থাকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা (ল্যাস্কির মতে জীবনের ব্যক্তিগত সম্পর্কে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে জানার সুযোগ), ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (মর্যাদা, স্বাস্থ্য, সম্পত্তি অর্জন ও ভোগ, আঘাত ও ভীতি থেকে সুরক্ষার স্বাধীনতা, চুক্তির স্বাধীনতা। রাজনৈতিক স্বাধীনতাও এর মধ্যে পড়ে। এখানে আছে স্বাধীন মতপ্রকাশ, সংগঠন, সরকারি ক্ষেত্রে সমান প্রবেশাধিকারের স্বাধীনতা, শিক্ষার স্বাধীনতা, সংস্কৃতির স্বাধীনতা, পরিবার গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণের স্বাধীনতা। অবশ্যই **অর্থনৈতিক স্বাধীনতা** সামাজিক স্বাধীনতার মৌল শর্ত। কাজের স্বাধীনতা, মজুরির স্বাধীনতা, অবসরের স্বাধীনতা, এই স্বাধীনতার কিছু দৃষ্টান্ত।

(৩) **জাতীয় স্বাধীনতা (National Liberty) ঃ** জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এই স্বাধীনতার মধ্যেই পড়ে। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ, ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, চিনের বিপ্লব, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলির স্বাধীনতার লড়াই স্বাধীনতার এই পর্যায়েই পড়ে।

(৪) **আন্তর্জাতিক স্বাধীনতা (International Liberty) ঃ** এক্ষেত্রে স্বাধীনতার মধ্যে পড়ে যুদ্ধের বিপদ থেকে রাষ্ট্রের সুরক্ষা, আগ্রাসন ও সন্ত্রাস থেকে মানুষের মুক্তি, মানবাধিকারের (মনুষ্যত্বের মর্যাদা) জন্য লড়াই।

স্বাধীনতার প্রশ্নে রুশো, কান্ট, গ্রিন, বোসাংকে (Bosanquet) প্রমুখ চেয়েছেন **নৈতিক স্বাধীনতা** (Moral freedom)। এটি হল মানুষের অপরিহার্য গুণের প্রতি সম্মান। কান্ট একে বলেছেন 'স্ব-আরোপিত কর্তব্য পালনের অনুজ্ঞা' (self-imposed imperative of duty) এবং 'বাস্তব ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য' (autonomy of the rational will)। হেগেলের কাছে প্রশ্নটি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ও শৃঙ্খলা, ব্র্যাডলের কাছে 'মানুষের অভিমুখ ও কর্তব্য' (My station and its duties) , গ্রিনের কাছে সকলের ভালোর জন্য আত্মোপলব্ধি (self-realization for Common good)। স্টোয়িক ভাবনায় স্বাধীনতার প্রশ্নে এসেছে সৎ ও মানবিক ভাবনা। প্রচলিত অসম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা হিসাবেই এঁরা মানবিক স্বাধীনতার (Human Freedom) কথা বলেছেন। জন স্টুয়ার্ট মিল স্বাধীনতার কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে

বেছে নিয়েছেন ব্যক্তির চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে। ব্যক্তিগত রুচি ও পছন্দের স্বাধীনতাকেও তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে স্বাধীনতার বিভাজন প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য আত্মসম্পর্কিত এলাকায় (self-regarding action)। ব্যক্তি নিজের গুণাবলিকে অগ্রাধিকার দেবে, লালন করবে। ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝে ভালোকে গ্রহণ করা ও মন্দকে বর্জন করা তার কাজ। অন্যান্যদের সম্পর্কিত এলাকায় (other regarding activities) সমাজের দিকটিকে বিবেচনা করে ব্যক্তি স্বাধীনতা সীমিত থাকবে। নিজের এলাকায় ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন, সমাজের অনুপ্রবেশ বাঞ্ছনীয় নয়, অন্যের এলাকায় এই হস্তক্ষেপ হতে পারে। শেষ বিচারে সমাজের ভ্রান্ত ও অন্যায় হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেন মিল।

স্বাধীনতার প্রশ্নে ল্যাস্কি রাজনৈতিক স্বাধীনতা (রাষ্ট্রকার্যে সক্রিয় অংশগ্রহণ), অর্থনৈতিক স্বাধীনতার (রুটি রোজগারের নিরাপত্তা ও সুযোগ) সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার (যা কেবল ব্যক্তিকেই স্পর্শ করে, যেমন ধর্মাচরণ, ন্যায়ের আদালতে আইনি সংরক্ষণ) কথাও বলেন। বার্কার আবার স্বাধীনতাকে ব্যক্তি বা পৌর স্বাধীনতা (ব্যক্তি হিসাবে মানুষের স্বাধীনতা), রাজনৈতিক স্বাধীনতা (নাগরিক হিসাবে ব্যক্তির স্বাধীনতা) এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (কর্মী হিসাবে ব্যক্তির স্বাধীনতা) এই তিনটি মানে ভাগ করেছেন।

স্বাধীনতার রক্ষাকবচ (Safeguard) হিসাবে সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের (Leviathan) কথা বলেছেন হব্‌স। লক বলেছেন নিয়মতান্ত্রিক শাসনের কথা, রুশো চেয়েছেন প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসন, মঁতেস্কু বলেছেন স্বৈরী শাসনের অবসানে রাষ্ট্রক্ষমতায় আইনি, শাসনতান্ত্রিক ও বিচার প্রক্রিয়ার স্বতন্ত্রীকরণ। বেন্থাম বহুসংখ্যক মানুষের সর্বোচ্চ সুখের জন্য চান রাষ্ট্র, তার সংবিধান ও আইনের সুসংগঠিত প্রয়োগ। মিল বলেন, স্বাধীনতার জন্য প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র কাম্য কিন্তু যথেষ্ট নয়। তিনি চান না সরকার বেশি তৎপর হোক, তিনি চান প্রশাসনিক ও পরিচালনগত দক্ষতা। সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের বিপদ তার অজ্ঞতা, অকর্মণ্যতা, মাঝারি মানুষদের আধিপত্য। উন্নত মানের ব্যক্তি, উন্নত রুচি ও কৃষ্টিই স্বাধীনতার গ্যারান্টি। বার্কার ব্যক্তি স্বাধীনতাকে পদ্ধতিগত নিয়মের মধ্যে আনতে চান এবং বলেন বৈধতা ও আইনবদ্ধতার গুণেই এর সার্থকতা। স্বাধীনতার সাফল্যের পেছনে এর শুধুমাত্র আইনি সুরক্ষাই যথেষ্ট নয়। স্বাধীনতার দুটি শর্ত হল : (১) প্রত্যেকের স্বাধীনতা ভোগের সমান ও অনুরূপ সুযোগ (২) সুনির্দিষ্ট কিছু কর্মক্ষমতা উপলব্ধির জন্য সকলের স্বাধীনতা ভোগের প্রয়োজনীয়তা। বার্কার অবশ্য শেষ পর্যন্ত ন্যায়ের রাজ্যেই স্বাধীনতার প্রাপ্তিকে দেখেন। ন্যায়ের রাজ্যে স্বাধীনতার সঙ্গে সাম্যের বা স্বাধীনতার বিভিন্ন ধারার বিরোধ থাকবে না। স্বাধীনতার গ্যারান্টি হিসাবে উদারবাদীরা সীমিত রাষ্ট্রের কথা বলেন, আর নব উদারবাদীরা বলেন মুক্ত বাণিজ্যের কথা। মার্কসবাদ চায় সেই স্বাধীনতার রাজ্য যেখানে স্বাধীনতা হবে প্রয়োজনের উপলব্ধি। (Engels, Anti-Duhring)

জানবার কথা— স্বাধীনতার মূল রক্ষাকবচগুলি হল ঃ

(১) সাংবিধানিক সংস্কার
(২) ক্ষমতার বণ্টন
(৩) বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা
(৪) দায়িত্বশীল গণতন্ত্রের প্রসার
(৫) নাগরিক শিক্ষার বিকাশ
(৬) আর্থিক সমতা
(৭) সদাসতর্ক জনমত।

৩.৫ স্বাধীনতার বিভিন্ন তত্ত্ব

স্বাধীনতার মূল তাত্ত্বিক হিসাবে আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তায় যাঁরা বিশেষ পরিচিত তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন (১) সাবেকি দার্শনিকেরা (২) সপ্তদশ শতকের ইংরেজ রাষ্ট্র-দার্শনিক জন লক (৩) অষ্টাদশ শতকের রাষ্ট্রতাত্ত্বিক জাঁ জাঁ রুশো ও মঁতেস্কু (৪) উনিশ শতকের রাষ্ট্রতাত্ত্বিক ও সমাজ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল, কার্ল মার্কস ও ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস (৫) বিংশ শতকের রাষ্ট্রচিন্তাবিদ লেনিন এবং অবশ্যই ঈশাইয়া বার্লিন (Isaiah Berlin) ও নারীবাদী ভাবনার প্রবক্তাগণ।

(১) সাবেকি দার্শনিক ভাবনা (Traditional Philosophical Thought)

ভূমিকাতেই বলা হয়েছে অতীতে বা মধ্যযুগে স্বাধীনতার প্রশ্নে মতামত ছিল, কিন্তু ধারণাগত বা তাত্ত্বিক কোনো মডেল এই সময় গড়ে ওঠে নি। একটা ধরাবাঁধা ছকেই প্রবাহিত হয়েছে স্বাধীনতা সম্পর্কে ধারণা। রাজনীতি সম্পর্কে তাত্ত্বিক প্রস্তাব অ্যারিস্টটল বা সিসেরোর সূত্রে অবশ্যই এসেছে। তবে স্বাধীনতা প্রসঙ্গে এঁদের তাত্ত্বিক দায় রাজনৈতিক মতবাদের আকারে প্রকাশ পায় নি। একথা সত্য অতীতের বা মধ্যযুগের জ্ঞান থেকে অতি সামান্য হলেও যা চুইয়ে পড়েছে (Trickle down) তার মর্মকথা হল ঃ

- দেবতাই হলেন শাসক, শিক্ষক ও বিচারক। সাধারণ মানুষ ঐহিক বিধান মেনেই পরিচালিত হন। পুরাকালীন ভারত, মিশর, ইহুদি, রোম সর্বত্রই শাসনের সম্পর্ক ছিল আধিপত্য ও আনুগত্যের।
- স্বাধীনতা নয়, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণায় যা ছিল তা হল আচরণবিধি এবং এর মান্যতার প্রশ্ন।
- জ্ঞানের সার্বভৌমিকতা প্রচার পেলেও সক্রেটিস সাধারণ মানুষকে কাজের জগতেই, উৎপাদনের কর্মযজ্ঞেই ব্যাপৃত রেখেছেন। শাসিতের গুণ বা স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনি নীরব থেকেছেন।
- প্লেটোর ন্যায়ের রাষ্ট্রে (The Republic) সাধারণের স্থান একেবারে পেছনের সারিতে। তারা স্বাধীন নয়। মর্যাদায় অ্যারিস্টটলের রাষ্ট্রেও সাধারণ মানুষের স্থান অনেক নীচে, তাদের নাগরিক অধিকার নেই। যে গণতন্ত্রের উপর তিনি আস্থা রেখেছেন সেখানে (পলিটি) মাঝারিয়ানার দাপট। কার্যক্ষেত্রে এই শাসন বিরল। আজকের দিনে যাকে আমরা গণতন্ত্রের শাসন বলে মানি অ্যারিস্টটলের কাছে তার কোনো মূল্য নেই, কারণ এ শাসন হল স্বৈরী শাসন। সবচেয়ে বড়ো কথা মানুষের শাসন নয়, আইনের শাসন তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য। তাঁর এই আইনের শাসনে মানুষের উন্মত্ততা নেই, আছে শৃঙ্খলা, স্থায়িত্ব।
- রোমে দাসব্যবস্থার বিকাশ, শোষণ ও পীড়ন, বিচ্ছিন্নতা স্বাধীনতার পক্ষে যায় না। সিসেরো বা স্টোয়িকদের ভাবনায় স্বাধীনতা এসেছে প্রকৃতিবাদের হাত ধরে। আইন শাস্ত্রের বিকাশ হলেও (ব্যবহারশাস্ত্র) স্বাধীনতা উচ্চমূল্য পায় নি। দাসপ্রথা হিতকর, প্রভুর শাসনে দাসেদের কলুষতা কেটে যাবে—এই যুক্তি স্বাধীনতার পক্ষে যায় না।
- অ্যাকুইনাস (Thomas Aquinas) বিদ্রোহকে পাপ মনে করেছেন। ঈশ্বর প্রবর্তিত শৃঙ্খলার মধ্যে ঊর্ধ্বগুন অধস্তনের কর্তৃত্ব ও অধীনতার নীতিকে সমর্থন করেছেন।
- সংস্কার আন্দোলনের প্রবক্তা লুথার ক্যাথলিক পীড়ন থেকে মানুষের মুক্তির ভাবনা প্রচার করেছেন এবং পোপের করুণা ও মার্জনা কেনার নীতিকে আক্রমণ করে মানুষকে এর বিরুদ্ধে সংগঠিত করেছেন। তবে সংস্কার আন্দোলনের তত্ত্ব দিয়ে সমকালের কৃষক আন্দোলনকে তিনি সমর্থন করেন নি। সামাজিক আর্থিক স্বাধীনতার প্রশ্নে এই অপসরণ প্রগতিশীলতায় উত্তীর্ণ হয় না।

২. স্বাধীনতা প্রশ্নে লক (Locke on Freedom):

স্বাধীনতার প্রশ্নে তাত্ত্বিক কাঠামোটি সর্বপ্রথম গড়ে দেন জন লক। ইতিপূর্বে জন মিল্টনের (John Milton), 'Areopagitica' (1644) স্বাধীনতার প্রশ্নে সত্যের জয়, মিথ্যার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী একথা প্রচারে এনেছেন; লেভেলার নেতা জন লিলবার্ন (John Lilburn) বা ডিগারপন্থী জেরার্ড উইনস্ট্যানলি (Gerrard Winstanly) স্বাধীনতার প্রশ্নকে তুলে ধরেছেন। উইনস্ট্যানলি 'Law of Freedom' স্বাধীনতার প্রশ্নকে তুলে ধরেছেন। উইনস্ট্যানলি 'Law of Freedom' গ্রন্থে বলেছেন, আহারের সংস্থান না হলে মানুষের জীবনই বৃথা। অন্যদিকে রাজনীতিবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা হলেও হব্‌স স্বাধীনতার প্রশ্নে কিছুই বলেন নি এবং মানুষকে দেখিয়েছেন কলহপ্রিয়, হিংস্র জীব হিসাবে। স্বাধীনতা নয়, বাঁচার প্রয়োজনে মানুষের সামনে তিনি তুলে ধরেন নিয়মের দণ্ড। আর ঠিক এখানেই লকের স্বাধীনতা তত্ত্বের সার্থকতা। লক যে উদারবাদী তত্ত্ব তুলে ধরেন তা ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী। স্বার্থপর, কলহপ্রিয়, মানবতাবোধ বর্জিত মানুষ নয়, লকের তত্ত্বে স্বাধীনতা হল মানুষের সুবুদ্ধি ও নৈতিকতাবোধ দ্বারা পরিচালিত সামাজিক স্বার্থ ও কল্যাণের উপযোগী স্বাধীনতা। হব্‌স স্বাধীনতার সংকোচন করে কর্তৃত্ব ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার যে দলিল পেশ করেছেন লক তার বিপরীতে স্থাপন করেছেন স্বাধীনতার এক উদারবাদী কাঠামো। এই উদার স্বাধীনতার বৈশিষ্ট্য হল:

- স্বাধীনতার সংকোচন নয়, সুরক্ষা ও প্রসারই হল আসল কথা।
- স্বাধীনতা মানুষের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত।
- জীবন, স্বাধীনতা, সম্পত্তিকে নিরাপদ করতেই চুক্তির মাধ্যমে এক বৈধ কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা করেছে মানুষ।
- লক যে স্বাধীনচেতা মানুষকে দেখান সে সম্পদ সচেতন হলেও, ভোগী হলেও, ন্যায়বোধ ও সুবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত। স্বাভাবিক অবস্থা পূর্ণ স্বাধীনতার অবস্থা হলেও স্বাধীনতার সুরক্ষার কোনো সংগঠন এই অবস্থায় ছিল না। স্বাভাবিক অবস্থা থেকে রাজনৈতিক সমাজে উত্তরণের আবশ্যিকতা এখানেই। রাজনৈতিক সমাজে নাগরিক হিসাবে স্বাধীনতা ভোগের পাশাপাশি কর্তব্যপালন, নিয়ম মেনে চলা, আবার স্বাধীনতা ব্যাহত হলে প্রতিরোধ ও বিদ্রোহের অধিকারকে লক স্বীকার করেছেন।
- স্বাধীনতার গ্যারান্টি হিসাবেই লক চেয়েছেন নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র। হব্‌সের রাষ্ট্রদানবের (Leviathan) তত্ত্ব খারিজ করে লক প্রচার করেছেন নিয়মতন্ত্রের রাজ্য, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা ও সংকল্প কাজ করবে, সীমিত ও দায়িত্বশীল সরকারের নীতি কার্যকর হবে। মানুষের অধিকার, সম্মতি আর সরকারের দায়িত্ব পালনই এখানে শাসনের সীমা।

লকের তত্ত্বের বৈপ্লবিক ভাবনা হল স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আভাস। তবে স্বাধীনতার এই তত্ত্ব অসাড় প্রতিপন্ন হয় দুটি কারণে। প্রথমত, হুইগ উদারবাদী ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত এই স্বাধীনতা যেন বৃহৎ স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। সম্পদশালীর অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও আধিপত্যকে তিনি ক্ষুণ্ণ করতে চাননি। দ্বিতীয়ত, প্রতিরোধ ও অভ্যুত্থানের প্রশ্নে লকের তত্ত্ব সংশয়বাদী। শান্তিপূর্ণ পথেই প্রতিরোধ কাম্য। সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে অর্থাৎ নৈতিকভাবে সরকার ভেঙে পড়বার আশংকা থাকলেই মানুষের পক্ষে সরকার পরিবর্তনের আমূল বিপ্লবী পন্থা ব্যবহার করা সম্ভব। লকের সংশয়বাদ আরো খোলাখুলি প্রকাশ হয়ে পড়ে আইন প্রণয়নী ক্ষমতার সৃষ্টি এবং এর ক্ষমতা সম্পর্কে লকের প্রস্তাবে যা সবক্ষেত্রে কার্যকর হয় না। আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়া কেমন হবে, সম্পত্তি সংরক্ষণের প্রশ্নেই এর অবদান বেশি থাকবে কিনা এ সব প্রশ্নে লকের সুপারিশগুলি যথেষ্ট নয়। ক্ষমতা বিভাজনের প্রশ্নে তাঁর ভাবনায় পরিকল্পনার ছাপ নেই। লকের চিন্তা উদ্দেশ্যবাদী কিন্তু মার্কিন রাজনীতির, গণতন্ত্রের ঐতিহ্যের প্রভাব তাঁর উপর বেশি পড়েছে তার প্রমাণ এদেশের রাজনীতি বিশেষজ্ঞরা তাঁদের সাংবিধানিক ভাবনার সঙ্গে লকের ভাবনার মিল আছে ভেবেই অনুপ্রাণিত হন। সম্পত্তির প্রশ্নে লক-এর ভাবনা অহংবাদী। উদীয়মান বণিক সমাজ, তাদের ধনবর্ধন ও সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি, একচেটিয়া মালিকানা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁর মনোভাব বড়ো বেশি উদার। রাষ্ট্র তথা সরকারকেই সম্পদ অর্জন, ভোগ সঞ্চয়ের এজেন্ট হিসাবে দেখেন তিনি। সম্পদ ও শ্রেণির তাড়নায় গৌরবময় বিপ্লবের মাধ্যমে রাজতন্ত্রের

প্রত্যাবর্তনের পথ প্রশস্ত করতে তাঁর ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। সম্পত্তির প্রশ্নে এই সরকার বণিকতন্ত্রের বিরোধিতা করবে না এই শর্তেই তার প্রত্যাবর্তন ঘটেছিল।

৩. রুশো ও স্বাধীনতার প্রশ্ন (Rousseau on Freedom)

স্বাধীনতার প্রশ্নে রুশো 'Discourse'-এ যা বলেন, 'Social Contract'-এর সঙ্গে তার অসঙ্গতি থাকলেও পাশাপাশি রেখে বিচার করলে দেখা যাবে দুটি ক্ষেত্রেই তাঁর ভাবনা চিত্তাকর্ষক। স্বাধীনতার প্রশ্নে প্রকৃতির রাজ্যের অবস্থান রুশোর কাছে ছিল মর্ত্যের স্বর্গ (Heaven of Earth)। স্বাধীনতার এই রাজ্যে মানুষ স্বাধীন, অল্পেই সন্তুষ্ট, সম্পদ ও ভোগ করায়ত্ত করতে উৎসাহী নয়, সহজ সরলভাবেই, সকলের সঙ্গে মিলেমিশে বেঁচে থাকার ইচ্ছাই ছিল প্রবল। যুদ্ধ, হতাশা, অবিশ্বাস, নিপীড়ন শব্দগুলি ছিল মানুষের অজানা, অচেনা। পরস্পর নির্ভরতার এই শান্তির রাজ্য থেকে নতুন অজানা রাজ্যে প্রবেশ করবার অনিবার্য পরিস্থিতি রুশোর পছন্দ ছিল না কিন্তু মেনে নিতে হয়েছে। এর **প্রথম** কারণ অপর্যাপ্ত সম্পদের উপর ক্রমবর্ধমান মানুষের চাপ, সম্পত্তির উদ্ভব এবং আদিম সরলতা ও সুখের তিরোধান। **দ্বিতীয় কারণ**, নিজের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই নতুন সমাজ গড়ার প্রয়োজন মানুষ তা অনুভব করেছে। নতুন সমাজ তাকে বুদ্ধি, সাংগঠনিক ক্ষমতা দিয়েছে এবং স্বাধীনতাকে নতুন করে পাবার শক্তি দিয়েছে। স্বাধীনতার আগেকার আবেগ, আদান-প্রদান, সুখ রইল না ঠিকই, সামাজিক ন্যায় ও সুবিচার রক্ষার সুযোগ সে হারালো একথা মনে রেখেই মানুষ নতুন সমাজে প্রবেশ করেছে তিনটি কারণে: (১) ওই সমাজ মানুষের চিন্তাভাবনা ও সমাজবোধকে নতুন স্তরে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। সরলতার স্থান নিয়েছিল চেতনা ও বুদ্ধিবিবেচনা (২) এই বিবেচনা বোধই স্বাধীনতার সঙ্গে সংগতি রেখে নতুন সমাজ গঠনের কাজে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। (৩) চুক্তির মাধ্যমে উদ্ভূত নতুন পৌর ও রাজনৈতিক সমাজে মানুষ মিলিতভাবে সৃষ্টি করলো স্বাধীতার ও সমাজশৃঙ্খলার এক অভিনব সমাজবোধ।

রুশোর নতুন প্রকল্পের (Social Contract) অভিনবত্ব হল: (১) সমাজ ও শাসনকে বৈধ এবং মানুষের উপযোগী করে তোলা। Discourse-এ প্রকৃতির রাজ্য ও রাজনৈতিক সমাজের অবস্থান পরস্পরবিরোধী হলেও Social Contract-এ এই দুই সমাজ পরস্পরের পরিপূরক। স্বাধীনতা ও কর্তৃত্ব এখানে পাশাপাশি থাকে। (২) চুক্তি ও বোঝাপড়া হল সেই সর্বসম্মত নীতি যা বিচ্ছিন্ন শক্তিকে একত্র করে, সৃষ্টি করে সম্মিলিত শক্তি (রুশো যাকে বলেছেন সাধারণের ইচ্ছা অর্থাৎ General Will) (৩) সমষ্টি শক্তি জাগ্রত হয় বহুলোকের একত্র অবস্থানে। এই সমষ্টি শক্তি সৃষ্টি করে যে সমাজকাঠামোর তার কাজ হল স্বাধীনতার এক নতুন পরিবেশ গড়ে দেওয়া। (৪) এখানে পৃথক পৃথক ভাবে ব্যক্তি তাদের ইচ্ছা ও স্বাধীনতা অপরের কাছে অর্পণ করে না। সকলের শক্তি নিয়ে গড়ে ওঠা এই সমাজ হয়ে ওঠে সকলের আশ্রয় ও সুরক্ষার কেন্দ্র। সকলের সঙ্গে মিলে, নিজেকে প্রত্যেকের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে মানুষ পায় স্বাধীনতার নতুন যুগ : এ শাসন তার নিজেরই শাসন; আর এই শাসন যখন নিজেরই শাসন সে শাসন মান্য করার মধ্যে স্বাধীনতা হারানোর কোনো গ্লানি নেই। (৫) এই সমাজের তাৎপর্য হল মানুষ এর কাছে সবকিছু নিঃশেষ উৎসর্গ করে। যা সে হারায় তাই সে ফিরে পায় আরো বেশি করে। সকলের শক্তি দিয়ে নিজের স্বাধীনতা রক্ষা।

রুশোর স্বাধীনতা তত্ত্ব সমাজগঠনের এক তত্ত্ব। এর মধ্যে আছে স্বাধীন মানুষের ঐক্যবদ্ধ, মিলিত শক্তির সূত্র : সমাজ সংহতি। এই সমাজে রাজার হাতে নয়, ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে জনগণের হাতে। জনগণই এখানে ক্ষমতার কেন্দ্র হিসাবে নাগরিক, আর আইনের অধীন বলে প্রজা। নতুন সমাজে স্বাধীনতা এল পৌর ও নৈতিক স্বাধীনতা হিসাবে আর নৈতিক ও বৈধ সমতা হল স্বাধীনতার সুখ। স্বাধীন মানুষ যে নতুন শক্তি পায় (সাধারণের ইচ্ছা) সেখানে সার্বভৌম শক্তি এক ও অভ্রান্ত, অবিভাজ্য, অ-হস্তান্তরযোগ্য। এই ইচ্ছা শুধু গণস্বার্থের কথা ভাবে, কোনো ব্যক্তিস্বার্থ বা ভিন্নস্বার্থ নয়। দলগত স্বার্থ বা গোষ্ঠীতন্ত্রও এখানে প্রধান্য পায় না। অসীম এই শক্তি বা ক্ষমতার কাছে উচ্চ-নীচ ব্যবধান নেই, এখানে আইন ন্যায্য, উদার, কল্যাণকামী কারণ সাধারণের কল্যাণসাধন ছাড়া এর আর কোনো ভাবনা নেই। রুশোর প্রকল্পে আইন আছে, স্বাধীনতা আছে। এ আইন সকলের প্রয়োজনেই সকলের আদেশ। আইনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট: কোনো নির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র স্বার্থে এই আইন পরিচালিত হবেনা।

রুশোর স্বাধীনতার রাজ্যে আইনসভা আছে কিন্তু প্রতিনিধি নেই। প্রজারাই সুসংবদ্ধ, সুসংহত নাগরিকমণ্ডলী হিসাবে আইন প্রণেতার দায়িত্ব নেবেন। এই আইনপ্রণেতা ব্যক্তিকে সমাজশক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি, সংযম, জ্ঞান তাকে প্রকৃত আইনপ্রণেতার ভূমিকায় দাঁড়াতে সাহায্য করে। তিনি কোনো মানবিক প্রবৃত্তির দাস নন, মানবরূপী এই সম্মিলিত ব্যক্তি সিদ্ধপুরুষ। মানুষকে পূর্ণ থেকে পূর্ণতর করে তুলতে, তাকে এক উন্নত নৈতিক শক্তি হিসাবে জাগরিত করতে তিনি নিবেদিত। রুশো চান আইন প্রণেতা জনতার ভাষায় আইনের রূপদান করুন। স্বাধীনতার পরিবেশ হিসাবে আইনের কথা বললেও রুশোর কাজে শৃঙ্খলাই উচ্চমূল্য পেয়েছে। আইন ও সংবিধান চাপিয়ে দেবার আগে মানুষকে আইনের উপযুক্ত করে তোলা ও জাতির সামাজিকীকরণের কথা বলেন রুশো।

রুশোর স্বাধীনতার রাজ্যের (গণরাজ্য) গুণ তার আত্মনির্ভরশীলতা। প্রাচীনের স্থির ও অটল বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এখানে মিলে গেছে নবীনের উদারতা। কুসংস্কার এখানে নেই, নেই আক্রান্ত হবার ভয়। এই রাষ্ট্রের আকারে ভারসাম্য আছে, আছে সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, আছে সাম্য ও সহযোগিতার নীতি।

> জানবার কথা—রুশোর স্বাধীনতা রাজ্যের সমতার নীতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রুশো বলেন, কোনো নাগরিক এতটা প্রাচুর্যের মধ্যে থাকবে না, যাতে সে অপরকে কিনতে পারে, আবার এতটা গরিব হবে না যাতে সে অন্যের কাছে নিজেকে বিক্রি করতে বাধ্য হয়।

রুশোর তত্ত্বে স্বাধীনতা যে বিরাট অসঙ্গতি, স্যাবাইন এ প্রশ্ন তুলেছেন (The Paradox of Freedom)। প্রথমত, তার গণরাষ্ট্রের সদস্যদের জন্য স্বাধীনতার কোনো তালিকা তিনি দেন না। সাধারণের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল স্বাধীনতা কতটা মূল্যবান, সাধারণের মঙ্গলের সঙ্গে স্বাধীনতার বিরোধ আছে কিনা এ প্রশ্নে রুশো কিছু বলেন না। দ্বিতীয়ত, রুশোর তত্ত্বে জ্যাকোবিন স্বাধীনতার যে ছাপ আছে তাতে রোবসপিয়েরের স্বৈরাচার যেন স্বাধীনতার এক ভ্রান্তি বলে মনে হয়। তৃতীয়ত, সংঘস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বিষয়ে রুশো বড়ো বেশি রক্ষণশীল। রুশোর গণইচ্ছার প্রকল্পে আইন আছে অথচ আইনসভা, প্রতিনিধি, সরকারের স্থান নেই। গণমানস যে ছিন্নমস্তা লেভিয়াথানের (Hearnshaw) আকার নেবে না তার কোনো নিশ্চয়তা আছে কী? আইনের বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণের স্বাধীনতা রুশো দেননি।

৪. মঁতেস্কু ও স্বাধীনতা (Montesquieu and Freedom):

চার্লস লুই দ্য মঁতেস্কু তাঁর স্বাধীনতার প্রকল্প রচনা করেছেন রুশোর পূর্বে। তাঁর অমূল্য গ্রন্থ 'Spirit of the Laws' (1748) এক্ষেত্রে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। রোমের ইতিহাস পড়ে, দেশে দেশে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে এবং ফরাসি রাজতান্ত্রিক অপশাসন ও সামাজিক সংকটের প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর বলিষ্ঠ ভাবনা প্রচারিত হল। ফরাসি জ্ঞানলোক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা মঁতেস্কু তাঁর উদার অথচ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বুঝেছেন :

- সংযমী শাসনেই আছে মানবতার মুক্তি।
- নিরাপদ ও সুনিশ্চিত পরিবেশই স্বাধীনতার মূল কথা।
- তবে জীবনের সুরক্ষা নয়, এর সঙ্গে চাই চিন্তাভাবনা ও আত্মবিকাশের সুযোগ।
- শক্তি যেমন ঘৃণার বস্তু, স্বাধীনতা তেমনি ভালোবাসার বস্তু। তবে স্বাধীনতার অর্থ আবেগ নয়, নিজের পছন্দমত শাসন বেছে নেওয়া নয় বা নিজের খেয়ালখুশি মতো চলা নয়। স্বাধীনতার অর্থ স্বাতন্ত্র্যও নয়।
- মানুষের কাছে অধীনতা নয়, আইনের অনুমোদিত সব কিছু করার অধিকারই হল স্বাধীনতা। স্বেচ্ছাচার ও ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ হলে, আইনের সঠিক, স্থায়ী এবং বাস্তব নিয়ন্ত্রণ এলেই স্বাধীনতার প্রকৃত পরিবেশ রচিত হবে।
- স্বাধীনতার পক্ষে রাষ্ট্রশক্তিকে সে সংযমের পরীক্ষা দিতে হবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণই তার প্রধান পদক্ষেপ। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের মূল কথা : একই হাতে সব ক্ষমতা থাকলে সবকিছুই ধ্বংস হবে। আইন প্রণয়নী ও

কার্যনিবাহী ক্ষমতা একই হাতে বা ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হলে স্বাধীনতা বলে কিছু থাকবে না। আবার বিচার বিভাগকে আইন প্রণয়নী ও কার্যনির্বাহী ক্ষমতা থেকে পৃথক করা না গেলেও স্বাধীনতা বলে কিছু থাকতে পারেনা। বিচারবিভাগের সঙ্গে আইনপ্রণয়নী ক্ষমতা মিলে গেলে প্রজার জীবন ও স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারী নিয়মের অধীন হয়। শাসন বিভাগীয় বা কার্যনির্বাহী ক্ষমতার সঙ্গে বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতার সংযুক্তি ঘটলে তার পরিণাম হবে আরো ভংয়কর। এক্ষেত্রে বিচারকই হবেন হিংসা ও পীড়নের সূত্র। সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে যদি একই ব্যক্তি বা সংস্থার হাতে সব ক্ষমতা জড়ো হয়।

মঁতেস্কুর স্বাধীনতার এই তত্ত্ব ও স্বাধীনতারক্ষার সমাধান রাষ্ট্রচিন্তায় বিশেষ অবদান রেখেছে। মঁতেস্কুর প্রধান অবদান হলো ক্ষমতার সুবিভাজনের মধ্যেই তিনি স্বাধীনতার প্রকৃত পরিবেশ সন্ধান করেন। একথা তিনি বুঝেছিলেন প্রচলিত ব্যবস্থার সংস্কার না হলে স্বাধীনতা অর্জন করা যাবে না। সুবিচার, মানবতা, সহিষ্ণুতার পথেই আসবে স্বাধীনতা। ফরাসি সমাজের পুনর্গঠনে তাঁর তিনটি বাণী হল শান্তি, স্বাধীনতা ও সমতা।

৫. স্বাধীনতা প্রসঙ্গে জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill on Liberty)

স্বাধীনতা সম্পর্কে অ্যাডাম স্মিথের (Adam Smith) অবাধ স্বাধীনতার ভাবনা, বেন্থামের হিতবাদী ভাবনা উদারবাদের ধ্রুপদী দলিল হলেও বা অষ্টাদশ শতাব্দীর আলোকিত যুগে (Age of Enlightenment) স্বাধীনতার নতুন ভাব, ভাষা ও রূপের সন্ধান পাওয়া গেলেও, টমাস পেইন (Thomas Paine) বা জেফারসন (Jefferson) স্বাধীনতার সপক্ষে আবেদন জানালেও স্বাধীনতার পক্ষে জোরালো যুক্তি পেশ করেছেন জন স্টুয়ার্ট মিল। স্বাতন্ত্র্যবাদের ধ্রুপদী ব্যাখ্যার এক অসাধারণ নিদর্শন হল মিলের 'স্বাধীনতা' শীর্ষক (On Liberty) দীর্ঘ প্রবন্ধ। উদারবাদের অন্যতম প্রবক্তা মিল স্বাধীনতা বলতে 'যেমন খুশি চল' ধারণায় বিশ্বাসী নন। স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে গ্যারান্টি বলতেও তিনি দ্বিধাগ্রস্ত। মিল মনে করেন, স্বাধীনতা হল ব্যক্তি ও সমষ্টির মূল প্রত্যাশা। স্বাধীনতার সম্মান না থাকলে সমাজ বাঁচে না। কিসে এই সম্মান? মিলের মতে,

- স্বাধীনতা হল মানুষের আত্মশক্তির, নিজস্ব মৌলিক চিন্তাভাবনার, তার বিচিত্র দৈহিক, মানসিক শক্তির পূর্ণ বিকাশ।
- উন্নত মানের ব্যক্তিই উন্নত সমাজের কারিগর। এক্ষেত্রে মিলের অকাট্য যুক্তি, একজন উন্নত রুচি ও কৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি এই গুণ থেকে বঞ্চিত ন'শো নিরানব্বই জন ব্যক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ।
- মিল চেয়েছেন ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা ও মতপ্রকাশের বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটুক। এই স্বাধীনতা ভ্রান্ত মতের বিরুদ্ধতা করে, সত্যের সঙ্গে পরিচিত হতে সাহায্য করে। প্রতিষ্ঠিত বা প্রবল মত কখনো সত্যের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। বিরোধী বা বিপক্ষ মতকেও গ্রহণ করা দরকার। উভয় মতের বিনিময়েই প্রকাশিত হবে প্রকৃত সত্য। শ্রেষ্ঠ মতটি গঠনে যত্নবান হবে ব্যক্তি ও সরকার। ভুল বোঝা ও তার সংশোধন এর মধ্যেও আছে স্বাধীনতা।
- মানুষের বুদ্ধি ও বিবেচনাকে লালন করতে হবে। প্রতিটি বিষয়েই নিজের এবং প্রতিপক্ষের চিন্তাকে গ্রহণ করতে হবে। ব্যক্তির ব্যক্তিগত রুচি, পেশা, পছন্দের স্বাধীনতা ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক। ব্যক্তির মানসিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ হবে উপলব্ধি, বিচারবুদ্ধি, চিন্তার বৈচিত্র্য, মানসিক তৎপরতা, নৈতিক পছন্দ-সব কিছুকে কাজে লাগিয়ে।
- বৃক্ষের মতোই ব্যক্তিকে বেড়ে ওঠার ও বিকাশের সুযোগ দিতে হবে। এর অর্থ ব্যক্তির কামনা-বাসনার ইচ্ছাকে উৎসাহিত করা। মিল চান শৃঙ্খলার মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ। ব্যক্তির পারদর্শিতা ও প্রতিভা যেন জনমতের তলায় চাপা পড়ে না থাকে। মিল চান সমষ্টিগত মাঝারিয়ানার ভিড়ে (Collective Mediocrity) যেন ব্যক্তিগত অভিনবত্ব হারিয়ে না যায়। স্বাধীনতা মিলের কাছে গুণের সম্মান, গুরু-পূজো (Hero-Worship) নয়।

- স্বাধীনতা বলতে মিল প্রথা, শৃঙ্খলা ভেঙে পরিবর্তনকে বোঝেন না, ব্যক্তিত্বের বিকাশে চারিত্রিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে বোঝেন।
- মিলের চোখে ব্যক্তির নিজের এলাকায় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়। অপরাপর এলাকায় এই স্বাধীনতা সীমিত থাকবে।

এক পরিপক্ক সভ্য সমাজের জন্য মিল প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের সুপারিশ করেন। তবে এই সরকার যদি নিষ্ক্রিয় অলস মানুষদের দ্বারা পরিচালিত হয় তবে স্বাধীনতার পরিবেশ থাকে না। এই সরকার তৎপর, দক্ষ, দায়িত্বশীল হলেই এর সাফল্য আসবে এবং স্বাধীনতার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

মিলের স্বাধীনতা তত্ত্ব সম্পূর্ণভাবেই স্বাধীনতার মুক্তিকামী ভাবনা (Liberatarian view) একথা হয়তো বলা যাবে না, তবে তাঁর স্বাধীনতা তত্ত্বকে শ্রেষ্ঠতাবাদী, শ্রেণি পক্ষপাতযুক্ত, বেশিমাত্রায় রাজনৈতিক বলে অভিযুক্ত করা হয়। স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনিও সংশয়বাদী। জন প্ল্যামানেজ (John Plamenatz) মনে করেন, ব্যক্তিত্ববাদ ও সামাজিকতার মধ্যে মিলের ভারসাম্য বিধানের প্রয়াস উপলব্ধি করা যায় না (Man and Society, Vol-II)। বার্কার বলেন, মিল শূন্যগর্ভ স্বাধীনতা ও অস্পষ্ট ব্যক্তিত্বের ধারণাকে প্রচার করেছেন (Barker : Political Thought in England) গণতন্ত্রকে স্বাধীনতার শর্ত বললেও মিল কিন্তু প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত। সব মানুষ গণতন্ত্রের উপযোগী নয়, শিক্ষা ও সম্পত্তিকে তিনি ভোটাধিকারের ভিত্তি করেছেন, আমলারাই গণতন্ত্রের উপযুক্ত শাসক, গণতন্ত্র সম্পর্কে মিলের এই ভাবনা পক্ষপাতদুষ্ট।

৬. স্বাধীনতা সম্পর্কে মার্কসীয় ভাবনা (Marxian view on Freedom)

প্রধানত উনবিংশ শতকের দুই বিশিষ্ট সমাজ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস এবং এঁদের উত্তরসাধক ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের (V. I. Lenin) ভাবনাকে সামনে রেখে স্বাধীনতা সম্পর্কে যে মার্কসীয় ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে বর্তমান অংশে তার সার সংকলনই আলোচনায় এসেছে। মার্কসীয় ভাবনা স্বাধীনতার উদার গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ব্যক্ত। উদার গণতান্ত্রিক ব্যাখ্যা, মার্কসবাদীদের চোখে যা স্বাধীনতার বুর্জোয়া ব্যাখ্যা (Bourgeois view of Freedom) হিসাবে প্রচারে এসেছে, তার ঐতিহাসিক আবেদন নিয়ে মার্কসবাদীরা সংশয় প্রকাশ না করলেও, স্বাধীনতার ধারণাকে উদারবাদের বিপরীত দৃষ্টি দিয়েই দেখেন। হার্বার্ট আপথেকার (Herbert Apthcker, Nature of Democracy, Freedom and Revolution, 1969) মনে করেন জন মিল্টন, টমাস জেফারসন এবং জন স্টুয়ার্ট মিল বুর্জোয়া স্বাধীনতা তত্ত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক যুগে সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক উদ্দেশ্যে মানবিক স্বাধীনতাকে অগ্রসর করতে সংগ্রামী ভূমিকা নিয়েছেন। তবে এঁদের স্বাধীনতা চিন্তায় শ্রেণি চেতনাই নির্ণায়ক শক্তি হয়েছে। সাধারণভাবে বুর্জোয়া ধারণায় স্বাধীনতা হল (১) নিয়ন্ত্রণের অনুপস্থিতি, (২) স্বাধীনতা কেবল রাজনৈতিক ভাবেই প্রাসঙ্গিক, (৩) অর্থনৈতিক অসাম্যই স্বাধীনতার বিশুদ্ধ প্রমাণ এবং তার আবশ্যিক পরিণতি, (৪) স্বতঃস্ফূর্ততা স্বাধীনতার আবশ্যিক উপাদান, (৫) স্বাতন্ত্র্যবাদ স্বাধীনতার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবং (৬) স্বাধীনতার এলিটবাদী প্রবণতা। এর বিরুদ্ধে বা বিপরীতে মার্কসবাদ স্বাধীনতার যে ভাবনা প্রচার করেছে তা হল :

(১) স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের অনুপস্থিতি অর্থাৎ নেতিবাচক একথা ঠিক নয়। স্বাধীনতার অর্থ সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা নয়। স্বাধীনতার ধারণা ইতিবাচক। এখানে সরকার কি করবে বা সরকারের কি করা উচিত একথাও বলা হয়।

(২) স্বাধীনতা শুধু রাজনৈতিক নয়, আর্থনীতিকও বটে। পুঁজিবাদই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, এর বিপরীতে দাঁড়িয়ে মার্কসবাদ বলে পুঁজিবাদের কৃত্রিম, পীড়নমূলক ব্যবস্থায় স্বাধীনতা নেই। কোনো সমাজব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভিত্তিই তার প্রকৃতিকে নির্ধারণ করে। সমাজে শ্রেণিভেদ, উৎপাদনের উপকরণের উপর মালিকানার অবস্থানই নির্ণয় করে স্বাধীনতা ও অধীনতার প্রশ্ন। স্বাধীনতার প্রশ্ন একান্তভাবেই মানবিক ও সামাজিক।

(৩) অসাম্য নয়, সাম্যেই স্বাধীনতার শক্তি। অর্থনৈতিক অসাম্য আবদ্ধ সমাজেরই পরিণতি। মার্কসবাদ অসাম্যকে দেখে স্বাধীনতার লঙ্ঘন হিসেবে। বৈষম্যদূরীকরণই সাম্যবাদের বৈশিষ্ট্য।

(৪) মার্কসবাদ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বিরুদ্ধে এবং এর দুর্বলতা হিসাবে দেখে সমাজের সমষ্টিগত প্রয়োজনের সঙ্গে এর বিরোধ, নীতি থেকে বাস্তবের বিচ্যুতি, অপরাধ প্রবণতা, সংস্কৃতি বৈরাগ্য, অসামাজিক আচরণ প্রভৃতিকে। নিরাশা নয়, মানুষ সম্পর্কে মার্কসবাদ শোনায় আশাবাদ। সম্পত্তিশালী ও নিপীড়নকে নয়, মার্কসবাদ দেখে নিপীড়িতকে।

(৫) কতিপয়ের শাসন প্রয়োজনীয় ও যুক্তিযুক্ত কারণ বহুসংখ্যক অযোগ্য আর অপরাধী এই ভাবনাকে মার্কসবাদ মান্যতা দেয় না। ঔপনিবেশিক, সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন ও পীড়ন শ্রেষ্ঠ জাতিবাদের নামে সমর্থিত হয়। মার্কসবাদ এলিটবাদ ও শ্রেষ্ঠ জাতিবাদকে বর্জন করে। মানবিক ক্রিয়াকর্মের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রমাণ সাম্যবাদ। এই সমাজেই ঘটবে পূর্ণ মুক্তি।

(৬) বুর্জোয়া স্বতঃস্ফূর্ততা নয়, স্বাধীনতা প্রসঙ্গে মার্কসবাদের ধারণা পরিকল্পিত। ধনতন্ত্র স্বাভাবিক ব্যবস্থা, স্বাভাবিক ভাবেই চলে। স্বাধীনতা হল এক নির্মাণ কার্য। প্রশিক্ষণ, প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে জ্ঞান স্বাধীনতাকে সুসংবদ্ধ ও ক্রিয়াশীল করে তোলে। সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবাদই দেয় পরিকল্পিত স্বাধীনতার পরিবেশ।

মার্কসবাদ স্বাধীনতা সম্পর্কে যা বলেছে তা স্বাধীনতার সমতাবাদী তত্ত্বের প্রতিফলন সন্দেহ নেই। মানবিক স্বাধীন সমাজ, মানবিক আদান প্রদান, অর্থনৈতিক সাম্য, মানুষের ব্যাপক পরিশ্রমে আর অংশগ্রহণে গড়ে ওঠা এই সমাজে মানুষ আপন শ্রমের মূল্য পায়। কাজ উৎপাদন ও পরিকল্পনা এর এই সমাজের লক্ষ্যপূরণের উপায়। সমবণ্টন এই সমাজের ভিত্তি।

৭. স্বাধীনতার নতুন প্রেক্ষিত (New Perspective of Freedom)

মার্কসবাদের স্বাধীনতা সম্পর্কে এই বিশ্লেষণ থেকেই বিংশ শতকে উদারবাদের প্রেক্ষাপট কিছুটা বদলে গেল। একই সঙ্গে স্বাধীনতার ভাবনায় সামান্য হলেও কিছুটা পরিমার্জনা এল। স্বাধীনতার এই পরিমার্জিত বিশ্লেষণে বিশেষ অবদান রেখেছেন হবহাউস। উদারবাদের রক্ষণশীলতাকে ত্যাগ করে তিনি জানালেন, প্রগতি কোনো যান্ত্রিক ব্যবস্থা নয়, প্রগতি হল মানুষের উৎসাহ শক্তির মুক্তি ('Liberation of living spiritual energy'–Hobhouse, Liberalism) এই উৎসাহ শক্তির জাগরণ হতে পারে সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের মাধ্যমে, মানুষের মুক্তির নতুন দরজা উন্মোচন করে। নরম্যান অ্যাঞ্জেল চাইলেন মানুষের মধ্যে আর্থিক স্বার্থের ভিত্তিতে সমষ্টি চেতনা জাগ্রত হোক, যুদ্ধের রাজনৈতিক পরিস্থিতির (সমাজ) স্থান গ্রহণ করুক এক সর্বজনীন আর্থিক সমাজ, যার সদস্যরা শান্তির লক্ষ্যে পরিচালিত হবেন (Norman Angell, The Great Illusion, in C. E. M Joad, Modern Political Theory)। গ্রাহাম ওয়ালাস আবেদন জানালেন সমাজতন্ত্রের আর্থিক নীতির (উৎপাদনের উপকরণের সামাজিক মালিকানা) স্বার্থে প্রশাসনের জন ভিত্তি গড়ে তোলার কথা। (Graham Wallas, Great Society, in C.E.M Joad)। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পুরোনো দর্শন ছেড়ে আরো ইতিবাচক রাষ্ট্রের ভাবনা নিয়ে এবং স্বাধীনতার ইতিবাচক তত্ত্ব নিয়ে উপস্থিত হলেন ম্যাকাইভার (Maciver, Modern State) বার্কার, ল্যাস্কি প্রমুখ। পূর্বের কর্তৃত্বমূলক, রাষ্ট্র ছেড়ে রাষ্ট্রকে আরো ক্রিয়াশীল, কর্মমুখী হতে আহ্বান জানালেন ল্যাস্কি। স্বাধীনতার প্রশ্নে সমাজবাদী দর্শনকে প্রচারে নিয়ে এলেন ল্যাস্কি। পুঁজিবাদের সংকট মোচনের স্বার্থে, পুঁজিবাদের দুর্বলতা কাটাতে জনকল্যাণের তত্ত্ব ও কর্মসূচি নিয়ে হাজির হলেন উড্রো উইলসন (Woodrow Wilson, New Freedom), ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট (Franklin Roosevel), ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ্ পিগু (Pigue), উইলিয়াম বেভেরিজ (William Baveridge) যোশেফ স্যুমপিটার (Joseph Schumpeter) প্রমুখ। পূর্ণ নিয়োগ, শ্রমিক কল্যাণ, সমাজ ও সমষ্টি কল্যাণের নানা কর্মসূচি ঘোষিত হল। স্বাধীনতার প্রশ্নটি যেন নতুন পরিসর ও জীবন পেল।

কিন্তু এই পরিসর আর রইল না। পুঁজিবাদী কাঠামোকে নতুন প্রত্যয় নিয়ে সুরক্ষিত করতে এগিয়ে এলেন নব

উদারবাদী (Neo-Liberal) বলে পরিচিত নতুন যুগের তাত্ত্বিকেরা। মুক্ত বাজার, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও প্রতিযোগিতার পক্ষে হায়েক, নজিক, ফ্রিডম্যান (Milton Friedmann), ওয়াল্টার লিপম্যান (Walter Lippman), জন কেনেথ গলব্রেথ (J. K. Galbraith), ইশাইয়া বার্লিন, জন রল্‌স, প্রমুখ এগিয়ে এলেন। স্বাধীনতার প্রশ্নে নতুন প্রেক্ষাপট রচিত হল ইশাইয়া বার্লিনের তত্ত্বে।

৮. ইশাইয়া বার্লিন ও স্বাধীনতা **(Isaiah Berlin and Freedom)**

১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হল ইশাইয়া বার্লিনের 'Two Concepts of Freedom' গ্রন্থটি। জন স্টুয়ার্ট মিলের 'On Liberty' গ্রন্থের প্রায় একশো বছর পরে রচিত এবং স্বাধীনতার প্রশ্নে নব আবিষ্কার হলেও বার্লিনের রচনা ধ্রুপদী পথেই পরিক্রমা করেছে বলা যায়। স্বাধীনতার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি পথেরই সন্ধান করেছেন তিনি। তবে স্বাধীনতার নেতিবাচক ধারণাতেই (Negative Freedom) সায় দিয়েছেন তিনি এবং দেখাতে চেয়েছেন ইতিবাচক স্বাধীনতার (Positive Freedom) ধারণার ফল সবক্ষেত্রে ইতিবাচক থাকে নি। স্বাধীনতার প্রশ্নে বার্লিন মূল যে ভাবনাকে প্রকাশ করেন তা হল ঃ

- স্বাধীনতা যে মূল্যবান ইতিহাসের অভিজ্ঞতা দিয়েই তিনি তা বুঝেছেন। ফ্যাসিবাদ, নাৎসিবাদ, যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতায় রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা সব কিছু থেকে শিক্ষা নিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত উদারবাদের পথেই হেঁটেছেন। আদর্শবাদ, মার্কসবাদ ও অন্যান্য চিন্তাধারায় তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে করতেই তিনি পৌঁছে যান মূল্যবোধের বহুত্ববাদী ভাবনায় (Pluralism of Values) এবং এর মধ্যেই তাঁর আবিষ্কার ব্যক্তি স্বাধীনতা অর্থাৎ পছন্দের সূত্র।
- তিনি এটাই চান স্বাধীনতা বেঁচে থাকুক বিচিত্র মূল্যবোধের যাতায়াতের মধ্যে।
- বার্লিনের ভাবনায় ইতিবাচক স্বাধীনতায় প্রচলিত ধারা (হেগেল, কান্ট) গ্রাহ্য নয়। স্বাধীনতা ও আত্মোপলব্ধি এক নয়, স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের ধারণাও তাঁর পছন্দ নয়। কারণ আত্মোপলব্ধি সব মানুষের সমান নয়। আবার স্বতন্ত্র ব্যক্তির ধারণায় বড়ো-ছোটো, উঁচু-নিচু, কামনা বাসনার প্রভেদ, নানা বিভাজন এসে পড়ে। মানব জীবনে মূল্যবোধ জনিত বিরোধ যখন অনিবার্য, জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য নিয়ে যখন ঐকমত্যের অভাব তখন স্বাধীনতা সম্পর্কে ধরা বাঁধা পথে না থেকে কীভাবে বিভিন্ন নৈতিক ও বাস্তব পছন্দকে সঙ্গে নিয়ে একত্রে ও শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করা যায় সে বিষয়েই বার্লিন তাঁর দৃঢ় মত ও সমর্থনের কথা জানান।
- বার্লিনের স্বাধীনতা ভাবনার মূল বক্তব্য ঃ আমার কাজে কোনো হস্তক্ষেপ না হলে আমি স্বাধীন। আমার কাজে হস্তক্ষেপ হলে আমি স্বাধীন নই। উদারবাদের দ্বারা প্রভাবিত বার্লিন মুক্তির প্রশ্নে রাজনৈতিক মুক্তি বা স্বাধীনতার যে ধারণা দেন তা হল ঃ আমি মুক্তি হারাবো যদি যে লক্ষ্যে আমি পৌঁছতে চাই তা থেকে আমাকে বিরত করা হয়। একই ভাবে অন্যের লক্ষ্যপূরণের আমি বাধা হতে পারি না। আর্থিক মুক্তি বা দাসত্বের পেছনে মূল কারণ বিশেষ আইনি ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি হওয়া বা না হওয়াকে বোঝায়। আর্থিক দাসত্বের বা পীড়নের মূল কারণ অন্যের অশুভ ইচ্ছা, যা প্রসারিত হলেই বিপদ।
- বার্লিন চেয়েছেন স্বাধীনতার প্রশ্নে রাজনৈতিক অধিকার। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রত্যাশার চেয়ে মানুষের প্রাথমিক সংস্থানগুলি জোগানোই বেশি মূল্যবান। আশু প্রয়োজনের কথাই আগে ভাবতে হবে। স্বাধীনতাকে স্বাধীনতার মানেই বিচার করতে হবে, সাম্য, ন্যায়বিচার সুখ বা বিবেকের এলাকায় একে আনার প্রয়োজন নেই। অসাম্যের লজ্জা ঢাকতে স্বাধীনতার সংকোচন বা ন্যায়, সুখ, শান্তির সৌজন্যে স্বাধীনতার অপমৃত্যু ঘটুক এটা তিনি চান না। স্বাধীনতার একটি ন্যূনতম এলাকার সংরক্ষণ চান বার্লিন।
- স্বাধীনতার ধ্রুপদী ধারণায় (লক, বেন্থাম, মিল এর মধ্যে পড়েন) নেতিবাচক স্বাধীনতার কথা এসেছে বটে তবে এসব ধারণার মধ্যে বলপ্রয়োগ আর হস্তক্ষেপ না করার মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট ছিল।

- ইতিবাচক স্বাধীনতার প্রশ্নে বার্লিনের মত হল, এক্ষেত্রে বিবেচনা করা দরকার ব্যক্তি কতটা নিজের উপর স্বাধীন। আমি পরিচালিত হব নিজের যুক্তি, সচেতন উদ্দেশ্যের দ্বারা, কোনো বহিরাগত উদ্দেশ্য দ্বারা নয়।
- ইতিবাচক স্বাধীনতার প্রশ্নে মূল কথা হল কোনো কিছু থেকে অর্থাৎ বাধা ও নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি (Freedom from)। নেতিবাচক স্বাধীনতা হল কোনো কিছু করা বা হবার স্বাধীনতা (Freedom to)। নেতিবাচক স্বাধীনতা বহুত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এটাই স্বাভাবিক। নেতিবাচক স্বাধীনতার স্বাধীনতায় গুরুত্ব পায় হস্তক্ষেপ না করার নীতি। ইতিবাচক স্বাধীনতায় গুরুত্ব পায় স্ব-শাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি। কান্ট ও হেগেলের তত্ত্বে ইতিবাচক স্বাধীনতার কথাই এসেছে। বার্লিনের মতে, নেতিবাচক স্বাধীনতাই মানবিক, কারণ এর পেছনে আছে ব্যক্তির পছন্দের সামর্থ্য, নানা পদ্ধতিতে এই স্বাধীনতা অর্জনে অগ্রসর হওয়া যায় এবং এগুলি হল বিভিন্ন মূল্যবোধ আর সংস্কৃতির সহাবস্থান। এর পেছনে কোনো শক্তি বা শৃঙ্খলার কাঠামো নেই। আছে বাঁচার ও নানা মূল্যবোধ নিয়ে চলার স্বাধীনতা।

এক কথায়, বার্লিনের স্বাধীনতা তত্ত্বে বহুত্ববাদই উদারবাদের ভাবনাকে পুষ্ট করেছে। তবে বার্লিনের তত্ত্বে স্বাধীনতাকে নিজের মানে বিচার করার যে দাবি জানানো হয়েছে, স্বাধীনতার ইতিবাচক তত্ত্বে তা করা হয় নি বলেই তাঁর অভিযোগ। এক্ষেত্রে স্বাধীনতার কাছে অন্যান্য ধারণা বা মূল্যবোধ অধস্তন হয়ে পড়ে। তবে বার্লিন নিজে স্বীকার করেছেন স্বাধীনতার সঙ্গে অন্যান্য মূল্যবোধগুলির দর কষাকষি বাস্তবে এড়ানো যাবে কিনা সন্দেহ। বার্লিনের তত্ত্বের যুক্তি-তর্ক বা আবেদন নিয়ে প্রশ্ন না তুললেও একটি অভিযোগ ওঠেই। উদারবাদের যে ভাবনাকে তিনি বহুত্ববাদের বর্মে সজ্জিত করে শুধু কি ব্যক্তি স্বাধীনতার বৈচিত্র্যের দিকে দৃষ্টি দেন না কি তার দৃষ্টি নব উদারবাদের কর্পোরেট স্বাধীনতার দিকেই ঝুঁকে থাকে। উদারবাদের মোহ তিনি ত্যাগ করতে পারেন না, কিন্তু উদারবাদের আড়ালে পুঁজিবাদের আত্মপ্রকাশের যে নতুন সুযোগ এসেছে তাকেই তিনি বরণ করে নেন। নেতিবাচক স্বাধীনতার ভাবনাকে ইতিবাচক স্বাধীনতার সঙ্গে এনে স্বাধীনতা ধারণাটিকে তিনি যে এক ধরণের প্রতিযোগিতার মুখে ফেলে দিয়েছেন সে প্রশ্নও ওঠে। বার্লিনের স্বাধীনতা তত্ত্ব পশ্চিমি উদারবাদকে সুরক্ষিত করতে, সমাজবাদ, সামগ্রিকতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রেখেছে এমন প্রশ্নও কোনো কোনো মহলে ওঠে।

পশ্চিমি উদারবাদকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী, নয়া উদারবাদী সবারই কম-বেশি অবদান ছিল। রল্‌স ন্যায়ের সঙ্গে স্বাধীনতা ও সমতার ধারণাকে জুড়ে দিয়ে মার্কিন সাংবিধানিক গণতন্ত্রের পথে নতুন সমাজ পরিচালিত হবে আশা প্রকাশ করেছেন। হায়েক ও নজিক উদারবাদের বামপন্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সোজাসুজি বাজার অর্থনীতির মধ্যেই স্বাধীনতার তাৎপর্য সন্ধান করেন। এই পর্বে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সরকারি মহল থেকেই (মিখাইল গর্বাচভ যার প্রধান উদ্যোক্তা) পুনর্গঠন (Perestroika) ও খোলা হওয়ার (Glasnost) যে নীতিকে ছড়িয়ে দেওয়া হল তা এককথায় পশ্চিমী স্বাধীনতা আর মুক্ত দুনিয়ার পক্ষে আবেদন হিসাবেই গৃহীত হল। সমাজতন্ত্রের সংকটের যুগেই ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা (Francis Fukuyama) 'The End of History and the last man' (1992) গ্রন্থে উদারবাদের বিজয়ের পক্ষে যে যুক্তি দিলেন তাতে এটাই প্রমাণ হল উদারবাদ (প্রযত্নে পুঁজিবাদ, পশ্চিমী গণতন্ত্র) ছাড়া আর পথ নেই। উদার গণতন্ত্রের সব বিকল্পই নিঃশেষ। পুঁজিবাদই মানুষের সুখ, চাহিদা, সুবিধাকে তৃপ্ত করতে একমাত্র এবং ইতিহাসের শেষ বিন্যাস।

এর মধ্যেই স্বাধীনতার প্রশ্নে নারীবাদী ভাবনা প্রচার পেয়েছে। নারীবাদের চোখে পুরুষশাসিত এই সমাজে নারীর বিকাশ সম্ভব নয়। গৃহকোণে আবদ্ধ রাখা এবং নারীকে সরকারি ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার ও ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করার জন্য উদার নারীবাদী, র‍্যাডিকাল নারীবাদী সকলেই প্রতিবাদ ও বিক্ষোভে সামিল হলেন। নারী স্বাধীনতার পক্ষে ভাষা জুগিয়েছেন অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে ম্যারি উলস্টনক্রাফট্, এবং ঊনবিংশ শতকে হ্যারিয়েট টেলর, জন স্টুয়ার্ট মিল, লুসিক্রিয়া মোট (Lucria Motc), এলিজাবেথ স্ট্যানটন (Elizabeth Stanton) প্রমুখ। বিংশ শতকে সিমোন দ্য

বোভোয়ার, কেট মিলেট (Kate Milliet) নারী স্বাধীনতার পক্ষে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে রীতিমত জেহাদ ঘোষণা করেছেন। নারীর ক্ষমতায়ন (Empowerment) না ঘটলে যে নারী স্বাধীনতা কার্যকর হবে না নতুন যুগে এই ভাবনাই কার্যকর থেকেছে। স্বাধীনতাকে সামনে রেখেই নারীকে নতুন করে নির্মাণ করা যায় কিনা, লিঙ্গ বৈষম্য রোধে কোনো চরম ভাবনার পথে না গিয়ে লিঙ্গ সমতার (Gender Equality) ধারণাকে বিচারে আনা যায় কিনা এ নিয়ে পরিবেশ বিজ্ঞানী, মানবাধিকার সংগঠন থেকে শুরু করে মানবী বিদ্যাচর্চা (Women Studies) সর্বত্রই তৎপরতা লক্ষ করা গেল।

৩.৬ উপসংহার

স্বাধীনতা সম্পর্কে নানা কথা, নানা তত্ত্ব বিচার বিশ্লেষণে এলেও শেষ কথা কিছু থেকে যায়। স্বাধীনতার প্রশ্নে উদার ধারা বা মার্কসীয় বিচার, মুক্তিকামী (Liberatarianism) বনাম সমতাবাদী (Equalitarianism) সকলেই একটা কথা মাথায় রাখেন যে স্বাধীনতা মহার্ঘ বস্তু। কীভাবে বা কেমন করে এই মহার্ঘ বস্তুকে লাভ করা যাবে এ বিতর্কের রেশ টানা সম্ভব নয়। আবার বিতর্ক ওঠে এ প্রসঙ্গেও যে স্বাধীনতা ইতিবাচক না নেতিবাচক কোন অর্থে প্রাসঙ্গিক। সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন অবশ্যই এটাই স্বাধীনতাকে স্বতন্ত্র মানে বিচার করা হবে না আপেক্ষিকভাবে বিচার করা হবে। স্বাধীনতাকে আইন, সাম্য, ন্যায় এই সব ধারণাকে সঙ্গে নিয়ে বিচার করার কথা বলা হলেও অনেক রাষ্ট্রচিন্তাবিদই বলেন স্বাধীনতার সঙ্গে আনুগত্য বা শৃঙ্খলা, সাম্যের আবেগ এবং ন্যায়ের যুক্তি অচল। কিন্তু স্বাধীনতার প্রশ্নে ম্যাকিয়াভেলীয় রাজনীতির প্রয়োগ যেমন অচল আবার হবস্‌বাদী যান্ত্রিক মডেলও কার্যকর নয়। উভয় ক্ষেত্রেই স্বাধীনতাকে স্বৈরীশাসকের অধীনে এনে নিষ্ক্রিয় করে দেবার একটা প্রবণতা আছে। এরকম কিছু ধারণা কোনো কোনো মহলে চালু আছে সাম্যের আবেগ স্বাধীনতার দাবিকে মিথ্যা প্রমাণ করে (লর্ড অ্যাকটন)। প্লেটো এবং অ্যারিস্টট্‌লের ভাবনায় নাগরিক ও ক্রীতদাসের মধ্যে পার্থক্য ছিল। অ্যারিস্টটল হেলেনিক সভ্যতাকে ও গ্রিক সংস্কৃতিকে অন্যান্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে আলাদা ভেবেছেন, যেমন ভেবেছেন হেগেল জার্মান রাষ্ট্র সম্পর্কে বা তকভিল মার্কিন গণতন্ত্র সম্পর্কে। রুশোর স্বাভাবিক স্বাধীনতার তত্ত্বকে যেমন মিলের স্বাতন্ত্র্যবাদী তত্ত্বের সঙ্গে এক সারিতে বসানো যায় না, তেমনি স্বাধীনতা প্রসঙ্গে বুর্জোয়া মডেলের সঙ্গে মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক মডেলের মিল খোঁজার চেষ্টা বৃথা।

স্বাধীনতার প্রশ্নে এটাই মাথায় রাখতে হবে এর পক্ষে বা বিপক্ষে যে যুক্তিই থাক আসল কথা হল ঃ (১) নৈরাজ্যবাদ নয়, রাষ্ট্র স্বাধীনতার পক্ষে বিপদ, এরকম ভাবনা থেকে নয় স্বাধীনতার প্রশ্নে আমাদের ভাবতে হবে ব্যক্তি স্বাধীনতার সঙ্গে রাষ্ট্র কর্তৃত্বের সঠিক তাল-মিল থাকুক। বার্কার, ল্যাস্কি সকলেই এমনটাই চেয়েছেন। স্বাধীনতার অর্থ এই নয় ব্যক্তির যথেচ্ছাচারকে মেনে নিতে হবে। আবার রাষ্ট্রকর্তৃত্বের সীমা বা গন্ডি বেঁধে দেওয়াও প্রয়োজন। (২) বার্লিন বা বার্ক যে যেভাবেই দেখুন স্বাধীনতার প্রশ্নে সমতার ধারণাকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। এখানেও ল্যাস্কির বক্তব্যই বাস্তব, স্বাধীনতা ও সমতা একই আদর্শের দুটি মুখ। স্বাধীনতার আর্থিক পরিবেশ না থাকলে স্বাধীনতা কথাটিই মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

৩.৭ গ্রন্থসূচী

১. Gearge H, Sabine : A History of Political Theory (Oxford and BH Publishing Co. 1968)
২. Horold J. Laski A Grammar of Politics (George Allen and Unwin Ltd, 1937 / 1960)
৩. J. C. Johari : Contemporary Political Theory : Basic Concepts and Major Trends (Sterling

Publishers Pvt Ltd, New Delhi, 1980)
৪. Andrew HeyWood Politics (Palgrave Foundations, Macmillan, 2004)
৫. দেবাশিস চক্রবর্তী : রাষ্ট্রচিন্তার ধারা (সেন্ট্রাল এডুকেশন্যাল এন্টার প্রাইজেস (প্রাঃ) লিমিটেড, ২০১২), রাষ্ট্রবিজ্ঞান তত্ত্ব ও প্রতিষ্ঠান (ওই, ২০১২)

৩.৮ নমুনা প্রশ্নাবলি

৩.৮.১ রচনাত্মক প্রশ্ন (বড়ো)

প্রশ্নের মান ১৮

১. স্বাধীনতার অর্থ বিচার করুন। এর বিভিন্ন রূপ কী কী বর্ণনা করুন।
২. স্বাধীনতা সম্পর্কে জন স্টুয়ার্ট মিল ও ইশাইয়া বার্লিনের অভিমত ব্যক্ত করুন।
৩. সংক্ষেপে স্বাধীনতার তাত্ত্বিক গতিটি ব্যাখ্যা করুন।

৩.৮.২ মাঝারি ধরনের প্রশ্ন

প্রশ্নের মান ১২

১. স্বাধীনতার সংজ্ঞা দিন। এর বিভিন্ন রূপ ও রক্ষাকবচগুলি চিহ্নিত করুন।
২. স্বাধীনতা বিষয়ে লক, রুশো, ও মঁতেস্কুর ধারণার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দিন।
৩. স্বাধীনতা সম্পর্কে জন স্টুয়ার্ট মিলের বক্তব্য বিশ্লেষণ করুন।

৩.৮.৩ সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

প্রশ্নের মান ৭

১. স্বাধীনতার অর্থ লিখুন।
২. স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ কী কী উল্লেখ করুন।
৩. সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো :
(ক) স্বাধীনতা সম্পর্কে লকের ধারণা।
(খ) স্বাধীনতা সম্পর্কে রুশোর ধারণা।
(গ) স্বাধীনতার নতুন প্রেক্ষাপট।
(ঘ) স্বাধীনতার আপেক্ষিক ধারণা।

একক ৪ ☐ অধিকার

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য
৪.২ ভূমিকা
৪.৩ অধিকারের অর্থ
৪.৪ অধিকারের শ্রেণিবিভাগ
৪.৫ অধিকারের বিভিন্ন তত্ত্ব
৪.৬ মানবাধিকার
৪.৭ উপসংহার
৪.৮ গ্রন্থসূচী
৪.৯ নমুনা প্রশ্নাবলি
৪.৯.১ রচনাত্মক প্রশ্ন
৪.৯.২ মাঝারি প্রশ্ন
৪.৯.৩ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

৪.১ উদ্দেশ্য

বর্তমানে এককের উদ্দেশ্য হল

(১) রাষ্ট্রচিন্তায় অধিকারের তাৎপর্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে জানতে সাহায্য করা।

(২) অধিকারের অর্থ ও শ্রেণিবিভাজনের ধারা সম্পর্কে শিক্ষার্থী পাঠকের ধারণা সৃষ্টিতে সহায়তা করা।

(৩) অধিকারের তাত্ত্বিক গতির সঙ্গে পাঠকের পরিচিতি ঘটানো।

(৪) মানবাধিকারের সমস্যাকে যাচাই করতে শিক্ষার্থী পাঠককে উৎসাহিত করা।

৪.২ ভূমিকা (Introduction)

পূর্ববর্তী দুটি এককে সাম্য ও স্বাধীনতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বলা যেতে পারে সাম্য ও স্বাধীনতা ধারণা দুটি অধিকারেরই ফল। ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিচারের একটি মাত্রা হল অধিকার। অধিকার সুরক্ষার মূল্যেই ব্যক্তি রাষ্ট্রকে বিচার করে। অধিকারের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিচারের প্রশ্নে এটাই মূল কথা অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে রাষ্ট্র কি করবে বা না করবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র সরাসরি কাজ করে না, সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রই এই কাজ বলবৎ হয়। বার্কারের কথা মনে রেখে একথা বলাই যায়, অধিকারই হল সরকারের কাজের সূত্র এবং অস্তিত্বের কারণ (Barker, Priciples of Social and Political Theory)। আবার একথাও বলা যায় নাগরিক তার রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করেই সরকার গঠন করে এবং সরকারকে বৈধতা দেয়। বার্কার আবার অধিকারের সঙ্গে কর্তব্যের কথাটিকে জুড়ে দিয়ে বলতে চেয়েছেন অধিকার আর কর্তব্য মিলেই যে ব্যবস্থা সেটাই হল আইন। সুতরাং আইন যদি অধিকার হয় এবং অধিকার যদি আইন হয় তবে সরকারের কাজ হল এই অধিকারকে ঘোষণা ও বলবৎ করা এবং স্বীকৃতি দেওয়া ও সুনিশ্চিত করা (বার্কার, ওই)।

বার্কারের মতোই হ্যারল্ড ল্যাস্কি রাষ্ট্র ও ব্যক্তির সম্পর্ককে বিচার করেন অধিকারকে সামনে রেখে। দার্শনিক বিশ্লেষণে গিয়ে ল্যাস্কি বলেছেন, যেসব কার্যকর দাবি রাষ্ট্রের কাছে পেশ করা হয়, তা পূরণ করার সামর্থ্যের মধ্যেই আছে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সার্থকতা (The authority of a state is a function of its ability to satisfy the effective demands that are made upon it—Laski, Introduction to Politics)। রাষ্ট্রের আদেশ বা অনুজ্ঞার কার্যকারিতাই হল রাষ্ট্র নাগরিকের ফলপ্রদ দাবিকে কতটা পরিপূরণ করতে পারছে তার উপর। ল্যাস্কি তাঁর প্রাজ্ঞ, বাস্তববোধকে সামনে রেখে এটাও বলতে চেয়েছেন রাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থার কার্যাবলি দিয়ে বিচার হবে রাষ্ট্রের চরিত্র। অন্যান্য রাষ্ট্রের চেয়ে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই জনসাধারণের সুযোগসুবিধার প্রতি বেশি দৃষ্টি দেয়। তবে তাঁর সন্দেহ থেকেই যায়, এই রাষ্ট্র অসম বৈষম্যমূলক সমাজের অবিচারকে দূর করতে পারবে কিনা।

অধিকারের গুরুত্ব শুধুমাত্র রাষ্ট্র ও ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ধারণে তা নয়। অধিকারের মাত্রা দিয়েই বোঝা যায় ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব উপলব্ধির স্তরকে। এখনেও দুটি প্রশ্ন থেকে যায় : (১) ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা বিকাশের প্রশ্নে অধিকারই যথেষ্ট নয়। অধিকারের সঙ্গে কর্তব্যকেও মেলাতে হয়। অর্থাৎ আমার অধিকারবোধ যেন অন্যের অধিকারকে আহত না করে। অধিকারের প্রকৃত তাৎপর্য কর্তব্যবোধে। রাষ্ট্রের প্রতি আমার কর্তব্য বিপরীতভাবে রাষ্ট্রের অধিকার হিসাবেই গণ্য হয়। অধিকারের প্রশ্নে সমাজ কল্যাণের প্রশ্নটিও জরুরি। (২) অধিকার শুধুমাত্র ব্যক্তির অধিকারই নয়, ব্যক্তিসমষ্টি, সমাজের ক্ষেত্রে এটি প্রসারিত। এখানেই আসে মানবাধিকারের প্রশ্ন; অর্থাৎ অধিকারের মানবিকরণ (Humanization) ও আন্তর্জাতিকরণের (Universalization) বিষয়টিও জরুরি।

সবশেষে বলা যায়, অধিকার তখনই পরিপূর্ণ তাৎপর্য পায়, প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে যখন অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অধিকারকেও অধিকারের সূচিতে স্থান দেওয়া হয়। অধিকারের এই ভাবনা সাফল্য পায় বিভিন্ন সংগঠিত আন্দোলন এবং মানবাধিকার সংস্থার কার্যকরী ভূমিকায়।

৪.৩ অধিকারের অর্থ

অধিকার উপলব্ধির প্রথম কথা হল অধিকারের অর্থসন্ধান বা বিচার। অধিকার কথাটি প্রাচীন কিন্তু এটি অর্থবহ হয়েছে আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তায়। রাজনীতি, রাষ্ট্র ও আইনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির এক আবশ্যিক শর্ত হল চেতনা। এই চেতনারই বহিঃপ্রকাশ হল অধিকার চেতনা। অধিকার চেতনা রাজনীতির জগৎকে চিনতে ও বুঝতে সাহায্য করে। অধিকার কোনো মামুলি চেতনা নয়, বস্তুগত এবং যুক্তিভিত্তিক চেতনা। বার্কার অধিকারকে বুঝেছেন আইননির্দিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিসেবে। (Legal Personality)। ন্যায়ব্যবস্থার মধ্যেই অধিকারের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ল্যাস্কি বলেন, অধিকার কোনো ঐতিহাসিক শর্ত বা হারিয়ে যাওয়া উত্তরাধিকার নয়, প্রাকৃতিক শৃঙ্খলার প্রতিফলন নয়, আশঙ্কা তৃপ্ত করার ক্ষমতা নয় বা রাষ্ট্রানুমোদিত দাবি নয়। ল্যাস্কির কথায়,

> অধিকার হল সমাজজীবনের সেই শর্ত যেগুলি ছাড়া মানুষ নিজেকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করতে পারে না ('Rights are those conditions of social life without which no man can seek to be himself at his best' Laski, Grammar of Politics)

অধিকারের বৈশিষ্ট্য হল: (১) আইনগত ব্যবস্থার মধ্যেই এর কার্যকারিতা (২) স্থান, সময় ও প্রয়োজন মেনেই এই দাবি গড়ে ওঠে। (৩) সময় ও স্থানের পরিবর্তনের সঙ্গে অধিকার বদলে যেতে পারে। (৪) রাষ্ট্রের লক্ষ্যের সঙ্গে এর সঙ্গতি আছে। (৫) হিতাহিতের প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়িত। (৬) অধিকার কর্তব্যের সঙ্গে যুক্ত। সমাজে আমার অবদান

রেখেই এই দাবি আমি করতে পারি। এক্ষেত্রে কাজটিই বড়ো। কে, কোন্ সামর্থ্যে, কি কাজ করছে সেটা বড়ো নয়। তবে নিজের খেয়ালখুশি মতো কাজ করার অধিকার আমার নেই।

> জানবার কথা—অধিকারের প্রশ্নে তিনটি ধাপ লক্ষণীয় : (১) এর ক্ষেত্রে মানুষের প্রকৃত ইচ্ছা থাকে বলে তা সমাজ অনুমোদিত। এই অর্থে এটি নৈতিক (২) এর পেছনে রাষ্ট্রের অনুমোদন থাকে বলে এগুলির আইনগত ভিত্তি থাকে। (৩) রাজনীতিগতভাবে অধিকার মূল্য পাবে যখন আইন তার ন্যায্য অবস্থানে থাকবে এবং সঠিকভাবে কার্যকর হবে।

অধিকারের স্বরূপ বা অর্থ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এটা মনে রাখা দরকার : (১) মানুষের বিবেকে আছে অধিকার। (২) কর্তব্যের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। (৩) রাষ্ট্র থেকে অধিকার স্বতন্ত্র হতে পারে কিন্তু এর সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হতে পারেনা। অধিকারের সঙ্গে সমাজের যোগ আগে, রাষ্ট্র ও রাজনীতির যোগ পরে। (৪) অধিকার কখনও বিমূর্ত নয়। এগুলির গুরুত্ব এদের ব্যাবহারিক বা প্রায়োগিক অর্থেই। (৫) রাষ্ট্র হবে অধিকারের কর্মক্ষেত্র। সরকারই এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কাজকর্মের মাধ্যম। (৬) অধিকার অবিমিশ্র কোনো ধারণা নয়। ন্যায়, সমতা ও স্বাধীনতার সঙ্গে এবং অবশ্যই আইনের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। এই অর্থে অধিকার আপেক্ষিক ধারণা।

৪.৪ অধিকারের শ্রেণিবিভাজন

বার্কার, ল্যাস্কি প্রমুখ অধিকারের ধারণাকে একটি বৃহৎ বৃত্তের পরিসরেই বিচার করেছেন। বার্কার মনে করেন অধিকারকে বিচার করার দরকার তিনটি নীতির ভিত্তিতে। তিনি অধিকার বণ্টনের নিয়ম হিসাবে স্বাধীনতার নীতি, সাম্যের নীতি ও মৈত্রীর নীতি-র কথা বলেন। প্রতিটি নীতির মধ্যেই আছে বেশ কিছু অধিকার। অধিকারের এই মালায় ভ্রাতৃত্বের বা মৈত্রীর অধিকার হিসাবে আসে শিক্ষায় অধিকার, সরকারি সাহায্য পাবার অধিকার এবং চাকুরির অধিকার। যেহেতু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর একক কর্মপ্রচেষ্টায় এগুলি লাভ করা সুনিশ্চিত নয়, বার্কার মনে করেন সার্বিক সহযোগিতার মধ্য দিয়েই এগুলি লাভ করা যায়। যাতায়াতের সুযোগ আসে পরিবহণ ব্যবস্থার মাধ্যমে। স্বাস্থ্যের সুযোগ পাওয়া যায় সরকারি চিকিৎসাব্যবস্থার মাধ্যমে এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির সুযোগ আসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার, মিউজিয়াম প্রভৃতির মাধ্যমে।

স্বাধীনতার অধিকারের মধ্যে বার্কার দেখেন রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অধিকারকে। রাজনৈতিক স্বাধীনতার অধিকারের (Right to Political Liberty) মধ্যে পড়ে নির্বাচনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণের অধিকার। এই অধিকার ব্যক্তি ভোগ করে নাগরিক হিসাবে তার সামর্থ্যে। রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকারকে বার্কার রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত এই দুই অধিকারের মাঝামাঝি ফেলেন। দল গঠনের অধিকার থেকেই আসে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, মেলামেশার স্বাধীনতা এবং সভাসমিতির স্বাধীনতা।

ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকারকে (Right to Personal Liberty) বার্কার দেখেন ব্যক্তিগত সামর্থ্যে মানুষের অধিকার হিসাবে। এর মধ্যে পড়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার যা ফরাসি স্বাধীনতার ঘোষণায় (১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দ) উল্লেখ করা হয়েছে। পছন্দ মতো চাকুরি নেবার অধিকার, চাকুরির শর্ত নির্ধারণের অধিকার, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার অধিকার, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, সমাবেশ ও মেলামেশার স্বাধীনতা, শিক্ষা ও উপাসনার অধিকারকেও এর মধ্যে ফেলা যায়। বার্কার এই অধিকারের একটি যুক্তিসংগত শ্রেণিবিভাগ করেছেন (ক) কায়িক কার্যকলাপের স্বাধীনতা (খ) মানসিক কার্যকলাপের স্বাধীনতা এবং (গ) বাস্তব কার্যকলাপের স্বাধীনতা এই তিনটি শীর্ষে। প্রথমটির মধ্যে পড়ে স্বেচ্ছাচারী আটক, দৈহিক নির্যাতন, অমানুষিক শাস্তি এবং আবাসিক গোপনীয়তার হস্তক্ষেপের

হাত থেকে নিরাপত্তা, দেশের মধ্যে চলাফেরা ও বসবাসের স্বাধীনতা, অন্য দেশে আশ্রয় পাবার স্বাধীনতা ইত্যাদি। মানসিক কার্যকলাপের স্বাধীনতা হল বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, মেলামেশার স্বাধীনতা, সভাসমিতি গঠনের স্বাধীনতা। সম্পত্তি অর্জন ও বিলিব্যবস্থা, বিবাহ ও পরিবার গঠনের স্বাধীনতা হল বাস্তব কার্যকলাপের স্বাধীনতার কিছু দৃষ্টান্ত।

আর্থনীতিক অধিকার (Economic Rights) বলতে বার্কার বোঝেন শ্রমদানের সামর্থ্যে মানুষ যেসব অধিকার ভোগ করে। জার্মানির সংবিধান (১৯১৯), মানবিক অধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় (১৯৪৮) এই স্বাধীনতার উল্লেখ আছে। কারখানা আইনের দ্বারা প্রবর্তিত শ্রমিকদের অধিকার, শ্রমিকদের বীমা ব্যবস্থা, শ্রমিক সংগঠন গড়া ও চাকুরির শর্তাবলি নিয়ে দরাদরি, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার এই পর্যায়ের অধিকারের মধ্যে পড়ে।

বার্কার অধিকারের কক্ষ বিভাজন চান না। তিনি মনে করেন, প্রতিটি অধিকারই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত এবং কোনো অধিকারই চরম ও অলঙ্ঘনীয় নয়। তবে প্রতিটি অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সরকারি কাঠামো কী হবে বা হওয়া উচিত এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন (Barker: Principles of Social and Political Theory)

অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কি অবশ্য অধিকারের শ্রেণিবিভাজনের প্রশ্নে বিস্তারিত না গিয়ে বিশেষ কিছু আধিকারে বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। 'Grammar of Politics'-এ অধিকারের শ্রেণিবিভাজনের প্রকল্পে ল্যাস্কি রেখেছেন :

(১) কাজের অধিকার : মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার সংস্থান।

(২) পর্যাপ্ত পারিশ্রমিকের অধিকার : কাজের উপযুক্ত প্রতিদান যা জীবিকা নির্বাহে সাহায্য করে।

(৩) কাজের যুক্তিসঙ্গত সময়সীমা : সৃষ্টিশীল কাজের জন্যই চাই অবকাশের অধিকার। যুক্তিসঙ্গত সময়সীমা হল আট ঘণ্টা। কাজের যান্ত্রিক রুটিন নয়, ল্যাস্কি চান ক্লান্তি ও অবসাদের বেদনা থেকে মুক্তি।

(৪) শিক্ষার অধিকার : এই অধিকার মানুষের জ্ঞানপ্রসূত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের অধিকার।

(৫) রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের অধিকার : নির্বাচন করা, নির্বাচিত হওয়া, রাজনৈতিক পদে প্রার্থী হবার অধিকার ক্ষমতা লাভে প্রবেশাধিকারের মূল তিনটি উৎস।

(৬) সংঘ গঠনের ও জনসভা করার অধিকার : মিলিতভাবে মত প্রকাশের অধিকার।

(৭) আইনের যথাযথ সংরক্ষণ : এটি নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্রের কর্তব্য।

(৮) সম্পত্তি অর্জন ও ভোগ : আত্মবিকাশের উপযোগী হলে, কর্তব্যের পুরস্কার হলে এই অধিকার বাঞ্ছনীয়। সমাজের স্বার্থের পরিপন্থী হলে, অন্যের শ্রমকে ব্যবহার করে সম্পত্তি দখল করা হলে তা অবাঞ্ছনীয়।

- অধিকারের সাধারণ শ্রেণিবিভাজন (General Classification of Rights) বার্কার ও ল্যাস্কির শ্রেণিবিভাজনের এই বিশেষজ্ঞের বিশ্লেষণ ছেড়ে যদি সরল ও সাধারণভাবে অধিকারের শ্রেণিবিভাজনে যাওয়া যায় তবে দেখা যাবে অধিকার নৈতিক (Moral), ব্যক্তিগত (Civil), রাজনৈতিক (Political), অর্থনৈতিক (Economic) এবং সামাজিক (Social) এই পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। নৈতিক অধিকারের মধ্যে পড়ে সেই সব অধিকার যার পেছনে আছে সমাজ ও সমষ্টির বিবেক। এর পেছনে কোনো পীড়ন নেই, আছে সমাজের শুভ ইচ্ছা। জৈব বা ব্যক্তিগত অধিকার হল সভ্য জীবনের তাগিদে ব্যক্তির একান্ত আপনার অধিকার। জীবন, স্বাধীনতা, মতপ্রকাশ এই অধিকারের মধ্যে পড়ে। জীবনের অধিকার নিজেকে সুরক্ষিত রাখার অধিকার। অপরাধ এবং আত্মহত্যার অধিকারকে শাস্তিযোগ্য করে রাষ্ট্র এই অধিকারকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। ব্যক্তিগত অধিকারের মধ্যে মতামত প্রকাশের অধিকার থাকলেও, যা খুশি বলার বা লেখার অধিকার মানুষের নেই। দাসত্বে অধিকার, সম্পত্তি আত্মসাৎ করা, এই অধিকারের বিরোধী। আইনের সমানাধিকার এই অধিকারের ভিত্তি। রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে ভোটাধিকার, নির্বাচিত হবার, চাকুরি পাবার অধিকার আছে একথা বার্কারের আলোচনা থেকেই জানা যায়। অর্থনৈতিক অধিকারের যে তালিকা বার্কার ও ল্যাস্কির

সূত্রে পাওয়া যায় তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়ের ক্ষেত্রে কিছু সীমা নির্দেশের কথা উদারবাদী ব্যাখ্যায় পাওয়া গেলেও, সমাজবাদীরা চান শিল্প পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ন্যায্য ব্যবস্থা। **সামাজিক অধিকার** হল প্রাথমিকভাবে মানুষের সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার এবং ব্যাপক ভাবে মানবাধিকার অর্থাৎ মানুষের মর্যাদা রক্ষার অধিকার। এটি রাষ্ট্রের বিশেষ সীমায় আবদ্ধ নয়, প্রকৃতিতে মানবিক ও আন্তর্জাতিক।

৪.৫ অধিকারে বিভিন্ন তত্ত্ব :

অধিকারের অর্থ ও শ্রেণিবিভাজনের ধারণা থেকে অধিকারের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। অধিকার সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা পেতে শিক্ষার্থীকে অধিকারের তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটকে বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে। ন্যায়, সমতা, স্বাধীনতার মতো অধিকারকেও রাষ্ট্রচিন্তাবিদের একটি তাত্ত্বিক কাঠামোর (Theoretical Framework) মধ্যে এনেছেন। **প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে অধিকারকে নির্মাণ করার কোনো তাত্ত্বিক প্রয়াস ছিল না।** ধর্মীয় চেতনা, বিশ্বপ্রকৃতির চেতনা, ভাবাদর্শের মধ্য দিয়ে এই যুগে অধিকার চেতনাকে উপস্থিত করার একটা প্রবণতা ছিল। অধিকারের প্রশ্নে প্লেটো, অ্যারিস্টটল, সিসেরো প্রমুখের প্রণালীবদ্ধ কোনো গবেষণা ছিল না। অধিকারের ধারণাটি এসেছে নিজেদের দার্শনিক আত্তীকরণ ও ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি থেকে। এই পর্যায়ে অধিকার সম্পর্কে গঠনমূলক কোনো ধারণাও ছিল না। প্লেটো স্পার্টান আনুগত্যে বিশ্বাসী ছিলেন, এথেন্সবাসীর স্বাধীন ও স্বতন্ত্র জীবনধারার প্রতি তাঁর কোনো টান ছিল না। কর্তব্যে অবিচল থেকে প্রতিটি শ্রেণি রাষ্ট্রধর্ম পালনে সাহায্য করবে এই ছিল তাঁর একান্ত ইচ্ছা। আদর্শ রাষ্ট্রের প্রকল্প নির্মাণে উৎসাহী হলেও, আদর্শ শাসকের (দার্শনিক রাজা) সন্ধান দিলেও, উচ্চবর্গের জন্য সাম্যবাদের এক জীবনপ্রণালীর কথা উচ্চারণ করলেও, নাগরিক অধিকারের প্রশ্নে তাঁর নীরবতা লক্ষণীয়। সফিস্টরা অসাম্য ও বাহুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত কর্তৃত্বের নিন্দা করেছেন বটে, কিন্তু হতাশার মধ্যেই তাঁদের প্রতিবাদী কণ্ঠ ডুবে গেছে। প্রাকৃতিক আইনের সত্যতায় সিসেরোর বিশ্বাস ছিল, কিন্তু অধিকারের পক্ষে তাঁর আবেদনের কথা শোনা যায় না। নির্বিকারবাদীরা (Stoic) বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যেই দেখেছেন আইন ও অধিকারের রহস্য। অধিকার নয়, অ্যারিস্টট্‌লের চিন্তায় হেলেনীক (গ্রিক সভ্যতা) গর্ব ছিল বেশি। ভালো রাষ্ট্রের সন্ধান তিনি করেছেন রাষ্ট্রের শাসনের গুণ দিয়ে, মানুষের অধিকার প্রাপ্তির বিশ্বাস নিয়ে নয়।

প্রাকৃতিক অধিকারের দর্শনে (Natural Rights Philosophy) প্রকৃতিকে অধিকারের স্রষ্টা বলে, অধিকার সর্বজনীন, বাস্তব, অসীম, অলঙ্ঘনীয় এমন ধারণা পাওয়া গেলেও অধিকারের সত্যতা কোথাও এ রহস্য উন্মোচিত হয়নি। বাইবেলেও মানুষের অধিকারের স্রষ্টা ঈশ্বর, ঈশ্বরে আনুগত্য থাকলেই অধিকার থাকবে—এর বেশি কিছু বলা হয় নি।

চুক্তি মতবাদ (contract Theory) : অধিকারের প্রশ্নে তত্ত্ব নির্মাণের প্রথম প্রচেষ্টা ছিল চুক্তিবাদীদের। **হব্‌স** Jus এবং lex কথা দুটিকে ব্যবহার করেছেন অধিকার ও আইন হিসাবে। প্রকৃতির রাজ্যে কিছু করা বা ছেড়ে দেওয়া এই ছিল অধিকার। আর আইন হল কোনো একটাকে ধরে থাকা। হব্‌স মনে করেন সমান অধিকার থেকেই প্রকৃতির রাজ্যে এল যুদ্ধ, হিংসা, ভীতি। এর থেকে রক্ষা পেতেই যে উনিশটি প্রকৃতির আইন মানুষ পেল হবসের মতে তার মধ্যে **তিনটি গুরুত্বপূর্ণ** : শান্তির পথে যাওয়া, শান্তির জন্য আত্মরক্ষা (self-defence) এবং চুক্তি। হব্‌স বলেন, কীভাবে প্রকৃতির রাজ্যের নৈরাজ্য থেকে মুক্তি পেতে মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তার কামনা (সবার সমান কামনা) করে এবং স্বাভাবিক অধিকারকে ত্যাগ করে সামাজিক অস্তিত্বের জন্য পরস্পরের উপর বিশ্বাস করে, এই অধিকারকে চুক্তির হাতে ছেড়ে দেয়। এইভাবেই সমাজের বাস্তব গঠন বা নির্মাণের এক পথ দেখান হব্‌স। তবে সমাজ নির্মাণের হব্‌সবাদী তত্ত্ব অধিকারের পক্ষে নয়, শেষ পর্যন্ত আনুগত্যের (রাজানুগত্য) পক্ষে যায়। বাঁচার তাগিদ, শান্তি ও নিরাপত্তার তাগিদ যে সমাজ নির্মাণের প্রথম কথা হব্‌সই একথা জানালেন। তবে সর্বগ্রাসী রাজতন্ত্রের হাতেই মানুষের নিরাপত্তার ভার ছেড়ে দিলেন হব্‌স।

অধিকার নির্মাণের প্রশ্নে হব্‌স নয়, লকের অবদান উল্লেখযোগ্য। লক মানবপ্রকৃতির ভালো দিকটিকেই আবিষ্কার করেন। (Human Understanding)। সমাজকেন্দ্রিক মানুষ যে সমান অধিকারের (All men are naturally in... a state... of Equality) মধ্যেই ছিল তাঁর 'Two Treatises of civil Goverment'-এ তিনি একথা বলেছেন। কর্তৃত্ব ও অধীনতার কোনো নীতি মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ছিল না। শক্তি নয়, অধিকার মানুষ সমানভাবেই পেয়েছে মানবিক গুণেই। প্রকৃতির রাজ্যের স্বর্ণযুগের তিনটি নীতি ছিল শুভ ইচ্ছা (Good will), পারস্পরিক সহায়তা (mutual assistance) এবং সুরক্ষা (Preservation)। এ রাজ্য যুদ্ধের রাজ্য নয়, স্বাধীনতার রাজ্য; ন্যায়বোধর স্বাভাবিক নীতির রাজ্য। এই রাজ্য অবশ্য তার পূর্বের অবস্থায় রইল না তবে তার জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি ফিরে পেতেই চুক্তির ভিত্তিতে পৌরসমাজ ও শাসনের যে নতুন রাজ্যের পত্তন মানুষ করলো তার ভিত্তি হল সবার সম্মতি (consent)। সম্মতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নতুন সমাজের নীতি হল ঐকমত্যের ভিত্তিতে চুক্তি; অলঙ্ঘনীয় এই চুক্তির ফলে প্রকৃতির রাজ্যে ফিরে যাবার অধিকার ছিল না। সম্পূর্ণ সহমত না হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন, স্বৈরীশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অধিকার এবং ন্যায় ও স্বাভাবিক অধিকারে সুরক্ষিত জীবন মানুষ লাভ করেছে। সরকারি ক্ষমতার উপর সীমা এবং সরকারকে বদলে দেবার জন্য জনগণের সর্বোচ্চ ক্ষমতা—লকের অধিকার তত্ত্বের দুটি অভিনব দিক। লকের স্বাভাবিক অধিকারের ভাবনা পরবর্তীকালে ভিকো (Vicco), মঁতেস্কু, হিউম (Hame) সকলকেই প্রভাবিত করেছে। তাঁর সাংবিধানিক সরকারের ভাবনা মার্কিন সংবিধানের ধারাকে পুষ্ট করেছে। লক থেকেই বেন্থামের হিতবাদ ও আলোকিত যুগের উদার দর্শন অনুপ্রেরণা পেয়েছে।

অধিকারের প্রশ্নে চুক্তিবাদের প্রধান প্রবক্তা রুশোর অবদান স্মরণীয়। ফরাসি বিপ্লবের বৌদ্ধিক তাত্ত্বিকের মূল আবেদন হল (১) সামাজিক চুক্তির ভিত্তিতে জনসার্বভৌমিকতার (Popular Soverignty) নীতিকে প্রচার করা; (২) সুখের, সরলতার, ভালো মানুষের এক সমাজধর্মকে আবিষ্কার করা; (৩) সম্পত্তির প্রসার স্বর্গসুখের এই রাজ্য থেকে কেমনভাবে সভ্যতার রাজ্যে মানুষকে নিয়ে যায় আর শুরু হয় অসাম্য, অশান্তি ও অস্থিরতা সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং (৪) সেই গণরাজ্য ও গণমানসের (General will) নতুন সমাজদর্শনকে প্রচার করা যেখানে পারস্পরিকতার ভিত্তিতে স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলার ভারসাম্যমূলক এক ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। মানুষই হবে এই ব্যবস্থার নিয়ামক। এই ব্যবস্থা হল মানুষের এক সমবায়িক রাজনৈতিক দেহ (Body-politic), যা হব্‌সের রাষ্ট্রদানবের মতো কর্তৃত্ব নয়, সকলকে নিয়ে সকলের স্বার্থরক্ষার এক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

- **অধিকারের আদর্শবাদী তত্ত্ব (Idealist theory of Rights):** অধিকারের স্বাভাবিক তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করে এখানে অধিকারকে দেখা হল আত্ম-বিকাশ, ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী এক শর্ত হিসাবে। ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটবে জীবন, স্বাধীনতা, সম্পত্তির মাধ্যমে নয়, নিজেকে জানা, বোঝা, প্রকাশের মধ্যে। হেগেল (Hegel) এর পেছনে দেখেন মানুষের বাস্তব ইচ্ছা ও যুক্তি। গ্রিন (T. H. Green) মনে করেন, নিজের ভালো গুণ এবং সাধারণের স্বার্থই থাকে অধিকারের পেছনে। রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসাবে তিনি, শক্তি নয় (হেগেলের সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র) দেখেন মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে (গ্রিনের কথায়, will not force, is the basis of the state)। গ্রিনের ধারণাকে সংক্ষেপে বার্কার পেশ করেন এভাবে:

> মানব চেতনা স্বাধীনতা চায়; স্বাধীনতা অধিকার; অধিকারই চায় রাষ্ট্র (Human consciousness postulates liberty; Liberty involves rights: rights demand the state' Barker, Political Thought in England)

আদর্শবাদের যুক্তিতে, রাষ্ট্রের লক্ষ্যকে বোঝা যায়, অধিকারের পরিবেশে (Bosanquet : Philosophical Theory of the State)। আদর্শবাদ বিশ্বাস করে অধিকার মানুষের মনে থাকে। অধিকার হল সেই ক্ষমতা যা সমাজ অনুমোদন করে যাতে অন্যের সাথে মানুষ সাধারণের ভালো কি তা বুঝতে পারে।

- ● ঐতিহাসিক তত্ত্ব (Historical Theory): এখানে অধিকারের পেছনে দেখা হয় ঐতিহ্য, প্রথা, ইতিহাস। বার্ক মনে করেন অধিকার এসেছে এক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার, পুরোনো দিনের ধারাবাহিকতায় পাওয়া প্রতিষ্ঠান (রাষ্ট্র, সম্পত্তি) ও আচার ব্যবহারের সূত্রে (Burke, Reflections on the Revolution in France)। ফরাসি বিপ্লব নয়, গৌরবময় বিপ্লবের সূত্রেই ইংরেজরা পেয়েছে শতাব্দীপ্রাচীন অধিকারকে।

● **অধিকারের অন্যান্য তত্ত্ব (Other theories of Rights) :** সমাজকল্যাণ তত্ত্ব (Social Welfare Theory) গুরুত্ব দেয় অধিকারের সেই ধারণাকে যার সঙ্গে সমাজের কলাণ জড়িয়ে আছে। অধিকার হল সমাজ কল্যাণের শর্ত। ল্যাস্কি এ তত্ত্বে বিশ্বাসী। বেন্থাম অধিকারের প্রশ্নে গুরুত্ব দেন বহুসংখ্যক মানুষের সর্বাধিক হিতসাধনের (Greatest welfare of the Greatest number) ধারণাকে। আইনগত তত্ত্বে (Legal theory) আইনকে অধিকারের উৎস করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে আইন হল রাষ্ট্রের আদেশ। হব্‌স, অস্টিন, বেন্থাম সকলেই এই তত্ত্বের প্রবক্তা। গ্রিন, বার্কারের চিন্তায় এই তত্ত্বের সমর্থন আছে। বার্কার বলেছেন, অধিকার হল আইন নির্দিষ্ট ব্যক্তিত্ব (Legal personality)। অধিকারের আইনগত তত্ত্ব বহুত্ববাদের (Pluralism) সমর্থন পায় না। বহুত্ববাদের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রই অধিকারের সৃষ্টিকর্তা একথা সত্য নয়। বৃহত্তর সমাজের সদস্য হিসাবেও নাগরিকের অধিকার আছে। মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশে শুধু রাষ্ট্র নয়, নানা সংঘ (বিচিত্র সামাজিক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান) ও গোষ্ঠী প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে।

● মার্কসবাদ (Marxism): মার্কসবাদ অধিকারকে দেখে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টি থেকে। অধিকারের ঐতিহাসিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যকে (Materialistic interpretation of History) সামনে রেখে মার্কসবাদ অতীতের ভ্রান্ত দৈবিক, আধিবিদ্যক (Metaphysical) ভাবনাকে যেমন অগ্রাহ্য করে, তেমনি অধিকারের আইনি, আদর্শবাদী ব্যাখ্যার শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গিকে অস্বীকার করে। মার্কসবাদ বিশ্বাস করে (১) মানুষের জীবনের প্রকৃত বাস্তব অবস্থার মধ্যেই সন্ধান করতে হবে মানুষের অধিকারকে। মানুষের মূল প্রয়োজনই (ভাত-কাপড়, বাসস্থান, বেঁচে থাকার সংস্থান) অধিকারের ভিত্তি (২) শোষণ আর বিভেদের চাপে অধিকার ভ্রান্তি ও ছলনামাত্র (৩) শোষণমুক্ত সমাজই মানবমুক্তির, অধিকারের একমাত্র পরিবেশ। সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদই দূর করতে পারে বিভেদ ও অসাম্যকে, উৎপাদন ও সম্পদের সামাজিক মালিকানা ও বণ্টনব্যবস্থাকে কার্যকর করতে, সচেতন, দায়িত্বশীল মানুষ গড়তে। (৪) সামাজিক ও শ্রেণি দাসত্ব থেকে মুক্তি, অধিকার অর্জনের সংগ্রাম ও সাফল্য একটি দীর্ঘ, পরিশ্রমসাধ্য, কণ্টকময় প্রক্রিয়া। অধিকার অর্জন করতে মানুষকে নানা কষ্ট ও মূল্য দিতে হয়েছে। ভাল কিছু পেতে গেলে দাম দিতেই হয়। অধিকারের সংগ্রাম সেই মহার্ঘ বস্তুকে পেতে সাহায্য করবে।

৪.৬ মানবাধিকার

বিংশ শতক থেকেই অধিকারের প্রশ্নে এক নতুন ধারায় সংযোজন হল। প্রচারিত হল অধিকারের নববিন্যস্ত দর্শন : মানুষের জন্য, মনুষ্যত্বের জন্য অধিকার। এই অধিকার রাষ্ট্রের সীমায় আবদ্ধ নয়, মানবিকতার সপক্ষে এক সার্বিক মান ও মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা করে। অতীতেও এই অধিকার ছিল। প্রমিথিউস, স্পার্টাকাস, জ্যাকুইরি বিদ্রোহ (ফ্রান্স), বোহেমিয়ার হাসাইট যুদ্ধ, চিনে তাইপিং বিদ্রোহ, নিগ্রোদের অধিকারের সংগ্রাম মানবাধিকারের কিছু ঐতিহাসিক দলিল। তবে এগুলি ছিল স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একান্ত দেশীয় শাসন ও শোষণের কিছু চিত্র। মানবাধিকার আন্দোলন প্রচারে এল আইনের মানবিকীকরণ (Humanization) আর অধিকারের আন্তর্জাতিকরণের মাধ্যমে (universalization)। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মানবাধিকারের ঘোষণায় (Universal Declaration of Rights), মানবাধিকারের ভাবনাটি সুস্পষ্ট হল:

> মানবাধিকার এবং বংশ, নারী পুরুষ, ভাষা, ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সর্বজনীন সম্মান প্রদর্শন ও প্রতিপালনের অঙ্গীকার [Universal respect for, and observance of human rights and fundamental freedom for all without distinction as to race, sex, language or religion (Art 55C)]

মানবাধিকারের ঘোষণায় (১৯৪৮, ১০ ডিসেম্বর) মানবাধিকারের সংজ্ঞা নির্দেশ করে প্রস্তাবনায় (Preamble) বলা হয়েছে:

> মানুষের অন্তর্নিহিত মর্যাদাবোধ এবং সমগ্র মানব পরিবারের জন্য সমান ও হস্তান্তরহীন অধিকারই হল বিশ্বে স্বাধীনতা, ন্যায়নীতি, শান্তির ভিত্তি। (...recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all the members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world...)

মানবাধিকারের সূচিতে আছে মানবাধিকারের একাধিক এলাকা। ৩০টি ধারায় বর্ণিত অধিকারের এলাকাগুলি হল:

১. **পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার** (Civil and Politial Rights): জীবন, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার, ভোটাধিকার, রাষ্ট্রকার্যে অংশ নেবার অধিকার, ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, আইনগত ও আর্থিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অধিকার, জীবন, বিবেক, ধর্ম ও মতামতের স্বাধীনতা, গোপনীয়তা ও মর্যাদা রক্ষার অধিকার।

২. আর্থনীতিক ও সামাজিক অধিকার (Economic and Social Rights) : খাদ্য, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, চাকুরি, পর্যাপ্ত জীবনযাত্রার মানরক্ষা, শিক্ষার অধিকার, সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের অধিকার, মানুষের সৃজনশীল বিকাশের সুযোগ, তথ্য সংগ্রহের অধিকার, শিক্ষার পরিবেশ ও সুরক্ষার দাবি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার দাবি।

৩. **সমষ্টিগত ও সামগ্রিকভাবে মানুষের দাবি** (Community and Rights of the People as a whole): নারী, শিশু, সংখ্যালঘু (minority), জাতিগত বা দেশজ সংখ্যালঘু (ethnic minority or indigenous people) এবং দেশান্তরিত শ্রমিকের (migrant workers) অধিকার এই পর্যায়ে পড়ে। **নারীজাতির অধিকার** হল: নারী নির্যাতন দূরীকরণ, মহিলাদের বিরুদ্ধে বৈষম্য রোধ, মহিলাদের ভোটাধিকার, নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার, সরকারি পদ পাবার অধিকার, আইনের চোখে সমানাধিকার, নাগরিকত্বের সমানাধিকার, চাকুরি ও মজুরি পাবার ক্ষেত্রে সমানাধিকার, স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনার অধিকার, বিবাহের ক্ষেত্রে সমান দায়িত্ব, মাতৃত্বের অধিকার, বৈধব্যের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা। **শিশুর অধিকার** হিসেবে আসে নাগরিকত্বের অধিকার, পিতামাতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন না হবার সুরক্ষা, অবৈধভাবে বিদেশে প্রেরণ ও শোষণের বিরুদ্ধে সুরক্ষা, শিক্ষার অধিকার, যৌন শোষণ ও অবৈধ ব্যবসার বিরুদ্ধে সুরক্ষা। **সংখ্যালঘুর অধিকার** হিসাবে আসে জাতিগত ও দেশজ উভয়ক্ষেত্রেই সংখ্যালঘুর পৌর, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সুরক্ষা, সংখ্যালঘুর রাজনৈতিক অবস্থান ও ক্ষমতা স্থির করা, সংখ্যালঘুর আর্থিক ও সামাজিক সুরক্ষা, ধর্মীয় ও ভাষাগত মর্যাদা রক্ষা। **দেশান্তরিত শ্রমিকের** আর্থিক ও সামাজিক সুরক্ষা এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার।

> **জানবার কথা**—মানবাধিকারে শ্রেণিবিভাজনের এই তিনটি ক্ষেত্র রাষ্ট্রতাত্ত্বিক মহলে যথাক্রমে প্রথম প্রজন্মের অধিকার (First Generation Rights), দ্বিতীয় প্রজন্মের অধিকার (Second Generation Rights) এবং তৃতীয় প্রজন্মের অধিকার (Third Generation Rights) বলে পরিচিত।

মানবাধিকারের এই বিস্তারিত ক্ষেত্র নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনা। প্রশ্ন ওঠে কিছু ক্ষেত্রে: (১) দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের অধিকার নিয়ে বিংশ শতকের আশির দশকের আগে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা অন্যান্য সংগঠনের তরফে তেমন মনোযোগ বা গুরুত্ব ছিল না। ১৯৮৮ সালের পরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তরফে কিছু উদ্যোগ চোখে পড়ে। বিশ্ব সাংস্কৃতিক উন্নয়নের দশক (World Decade for Cultural Development, 1988-1997), সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য কমিশন

গঠন, শিশুর জন্য কর্মপরিকল্পনা (১৯৯১-২০০০), দেশান্তরিত শ্রমিকদের সুরক্ষার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক তরফে উদ্যোগ অনেক পরের অগ্রগতি। (২) বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা (WHO), বিশ্ব শ্রমিকসংস্থা (WLO), জাতিপুঞ্জের শিশু তহবিল (UNICEF), শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি পরিষদ (UNESCO), বিশ্ব শিশু সম্মেলন (The World Summit for Children, 1991), বসুন্ধরা সম্মেলন (Earth Summit, 1993) মানবাধিকার প্রশ্নে তৎপরতা দেখালেও অধিকারের কার্যকারিতা নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে বৈষম্য, মতান্তর, বিরোধ প্রবল। (৩) যুদ্ধবন্দী, গণহত্যা, সন্ত্রাসবাদ, জাতিসংঘর্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মতো মানবাধিকারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আজও দেশে দেশে তো বটেই, আন্তর্জাতিক মঞ্চেও ন্যায্য গুরুত্ব পায়নি। মানবাধিকার কমিশন (Human Commission), মানবধিকার রক্ষার কাজে নিযুক্ত মিশন (Human Rights Mission), সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হাইকমিশনারের কার্যালয় (The office of the United Nations High-Commissioner for Human Rights) অনেক ক্ষেত্রেই তাদের নির্ধারিত ভূমিকা পালনে ব্যর্থ। মানবাধিকার সংগঠনগুলির দায়িত্ব নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

একথা ঠিক মানবাধিকার অধিকারের প্রচলিত ভাবনা, মান ও মাত্রা থেকে পৃথক। প্রথমত, অধিকার হল মানুষের প্রাপ্য কিছু ন্যায্য দাবি, মানবাধিকার মানুষের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার অধিকার। দ্বিতীয়ত, দেশ, অঞ্চল, জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতিভেদে অধিকার পৃথক হতে পারে কিন্তু মানবাধিকার সর্বজনীন, অখণ্ড, অবিভাজ্য ধারণা। তৃতীয়ত, অধিকার রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের কিন্তু মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্ব থাকলেও, আন্তর্জাতিক সংগঠন ও আইন এর সুরক্ষার মূল দায়িত্বে থাকে। সবচেয়ে বড়ো কথা, মানবাধিকার অধিকারের মতো আবদ্ধ কোনো ধারণা নয়। আন্তর্জাতিক পরিবর্তন, আঞ্চলিকতাবাদ, রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নানা চাপ ও অস্থিরতা মানবাধিকারের প্রশ্নকে নতুন মাত্রা ও গতি দিয়েছে। ফলাফল, পরিণতি, প্রাসঙ্গিকতা, নৈতিকতার মূল্যে মানবাধিকার যতটা উচ্চমূল্য পায়, অধিকার ততটা পায় না।

৪.৭ উপসংহার

অধিকার প্রসঙ্গে রাষ্ট্রতত্ত্বে অনেক কথাই ঘুরে ফিরে আসে। আলোচনার এই শেষ অংশে দুটি প্রসঙ্গের অবতারণা করা প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। প্রথম কথা হল, অধিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত আনুগত্যের প্রশ্ন। সাধারণত অধিকার প্রসঙ্গে যে ধারণার বশবর্তী হয়ে অধিকাংশ রাষ্ট্রতাত্ত্বিক এই সিদ্ধান্তে এসেছেন, তা হল:, আনুগত্যই অধিকারের উৎস ও ফল। আনুগত্য কোনো বাধ্যবাধকতা নয়। অধিকার ভোগের জন্য এক আচরণবিধি যা নাগরিকের ক্ষেত্রে পালনীয়। উদারবাদী মনীষীরা অধিকারের প্রশ্নে স্বাতন্ত্র্যবাদী অবস্থান নিলেও এরকম একটা ধারণার বশবর্তী ছিলেন আইনশৃঙ্খলার কাঠামোর মধ্যে থেকেই অধিকারপ্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল এবং এক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক কাঠামোর পক্ষেই তাঁদের রায় ছিল। লক থেকে শুরু করে রুশো, মঁতেস্কু, তকভিল, টমাস পেইন (Thomas Paine), বেন্থাম, মিল, এমনকি পরবর্তীকালে হবহাউস, রল্‌স সকলেই অধিকারের প্রশ্নে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই সমাধান হিসাবে সুপারিশ করেছেন। এই ব্যবস্থায় সুবিধা সম্পর্কে শ্রদ্ধা রেখেই এই ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্যের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা এবং মনে করেছেন ফেডারেল ব্যবস্থা, পার্লামেন্টীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, আইনের অনুশাসন, ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ, ক্ষমতার ভারসাম্য, গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ স্বার্থগোষ্ঠীর প্রসার অধিকারের সুস্থ প্রয়োগে সহায়তা করবে।

তাঁদের মনে এই ধারণাই ছিল যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা—

১. সকলের কল্যাণের স্বার্থে নিয়োজিত। এখানে সকলের সমান অধিকার ও সুযোগ আছে। সম্মতিই এই শাসনের ভিত্তি।

২. নিজেদের নির্বাচিত সরকার বলে এই সরকারের প্রতি জনগণের সহানুভূতি ও দায়বদ্ধতা আছে।

৩. জনমত, জনশিক্ষার বিস্তার এবং জনচেতনা বৃদ্ধির মানে এই শাসন সর্বোত্তম।

৪. এই সরকার স্বাধীন সমাজের আদর্শকে প্রচার করে এবং নাগরিক জীবনের বিকাশের অনুকূল।

তবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অধিকারের সঠিক পরিবেশ হিসাবে মেনে নিতে অনেকেরই আপত্তি আছে। গণতন্ত্রের সীমা বা বিপদ সম্পর্কে গণতন্ত্রের সমর্থকদের মধ্যেই অনেকে সোচ্চার হয়েছেন। জন স্টুয়ার্ট মিল গণতন্ত্রের মধ্যে দেখেছেন সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বেচ্ছাচার (Tyranny of the Majority)। ফরাসি লেখক ফ্যাগুই (Faguit) গণতান্ত্রিক সরকারের দায়িত্বহীন নেতৃত্ব, প্রবঞ্চনা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। এডমন্ড বার্ক জনপ্রতিনিধির দায়িত্ববোধ ও বিবেচনা এবং গণতান্ত্রিক সংস্কার নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। উদার গণতন্ত্রের বিপদ সম্পর্কে এর বিরোধীরা নানা প্রশ্ন তুলেছেন। আধিপত্যকারী শ্রেণির শাসন, অর্থনৈতিক বৈষম্য, ত্রুটিপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব, বিচারবিভাগের স্বাধীনতার অভাব গণতন্ত্রের পক্ষে যায় না। সুতরাং এ প্রশ্ন উঠতেই পারে যে ব্যবস্থা অধিকার রক্ষার পরিবেশ সৃষ্টিতে ব্যর্থ তার পক্ষে আনুগত্য সম্ভব কিনা। ল্যাস্কি তো উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের পক্ষে যেসব যুক্তি দেওয়া হয় সরাসরি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। শৃঙ্খলারক্ষার প্রশ্নে সন্দেহ না তুলেও ল্যাস্কি বলেছেন, উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের কৌশল উপস্থিত করতে পারে নি, কারণ রাষ্ট্র এখানে সুবিধাভোগী শ্রেণির সুযোগ সুবিধার অবস্থাকেই রক্ষা করতে সচেষ্ট। ব্যাপক হারে নাগরিদের দাবি পূরণের ভূমিকা পালনেও রাষ্ট্র ব্যর্থ। গণতান্ত্রিক এই ব্যবস্থায় আইন কার্যকরী চাহিদা পূরণেও ব্যর্থ। এখানে মুনাফা লাভই উৎপাদনের পুরস্কার। এই সমাজে বণ্টন প্রক্রিয়ার সঙ্গে ন্যায়ের কোনো সম্পর্ক নেই (Laski, Grammar of Politics)।

এখানেই আসে উপসংহারের দ্বিতীয় কথা। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের **(Right to Resistance)** প্রশ্ন। অধিকারের প্রশ্নে প্রতিরোধের অধিকারে কথা বারবারই উঠেছে। প্রতিরোধের অধিকারকে বলা হয় আনুগত্যের রাজনৈতিক সীমা। প্রশ্নটিকে এইভাবে রাখা হয়: রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন যদি জনগণের কর্তব্য বলে বিবেচিত হয় তবে রাষ্ট্রের অন্যায্য আচরণ (গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও এই ব্যাধি থেকে মুক্ত নয়) বা রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের অধিকার মানুষের থাকবে কিনা? সাধারণত এরকম একটা ধারণা প্রচলিত আছে, নাগরিক রাষ্ট্রের আইন মেনে চলতে বাধ্য। রাষ্ট্র আরোপিত বিধি দ্বারাই নাগরিক জীবনের সীমারেখা স্থির হয়। রাষ্ট্রের পরিচয়েই ব্যক্তি নাগরিক। আইনত অন্যান্য সংঘ বা সংস্থার চেয়ে ব্যক্তি বা নাগরিকের উপর রাষ্ট্রের দাবি অধিক। বার্কার বলেছেন, আনুগত্য, বিশেষত রাজনৈতিক আনুগত্য নাগরিক ও রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি বন্ধন। ল্যাস্কি বলেছেন, অতীতের তত্ত্বে রাষ্ট্রের আইন আমাদের মানতে হবে, কর্তৃপক্ষের প্রতি আমরা অনুগত হব এরকম একটি আরোপিত বা আজ্ঞাসূচক ধারণা প্রশ্রয় পেয়েছে। কেন আমরা আইন মানব, আইন অমান্য করারও যে যথার্থতা আছে একথা আমাদের জানা দরকার। ল্যাস্কি বলেন, রাষ্ট্রকর্তৃত্বের সিলমোহর ছাড়াই অর্থাৎ আদেশ ও হুকুমের জোরে যে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব, তাকে ছাড়াই রাষ্ট্রে আইনের যৌক্তিকতা বিচার করা দরকার। আনুগত্য কথাটির তাৎপর্য খুঁজতে গেলে রাষ্ট্রীয় আইনের উদ্দেশ্য বিচার করাই জরুরি বলে ল্যাস্কি মনে করেন (Laski, Introduction to Politics)।

একথা ঠিক ধর্ম, প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা, ভোগদখলের নীতি (প্রথা, ভোগদখলের সূত্রেই শাসক দীর্ঘদিন ক্ষমতা ব্যবহার করে আসছে) রাষ্ট্রকে মেনে চলার ভিত্তি—একথা আজ আর চলে না। নৈতিকতা, ন্যায়বিচারের বাণী, নাগরিকতার চুক্তি—এ ধরনের ভাবনাও আজ, বিশেষত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আনুগত্যের ভিত্তি হতে পারে না। প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের নৈতিক ভাবনা, স্টোয়িক বিশ্ব নাগরিকতার বাণী, ধর্মের যুক্তি আজ অচল। তাই প্রশ্ন উঠেছে স্বৈরশাসন এমনকী গণতন্ত্রের অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রয়োজন। প্রতিবাদের ভাষা নিয়ে লক, মঁতেস্কু, আবেসিয়ে (Abbe Sieyes), টমাস পেইন, জেফারসন গণতান্ত্রিক ও জ্ঞানালোক আন্দোলনের পথিকৃতেরা হাজির হয়েছেন। হব্‌স, হেগেল, রুশো বা বার্ক বিদ্যমান ব্যবস্থার পক্ষেই বলেছেন এবং বিদ্রোহ বা বিপ্লবকে নিন্দা করেছেন। বেন্থাম বলেছেন, যদি দেখা যায় রাষ্ট্রের ন্যায়ের চেয়ে অন্যায় বেশি তবে সেই রাষ্ট্রের বিরোধিতার নৈতিক অধিকার জনগণের আছে। প্রচলিত ব্রিটিশ

শাসন, আইন ও বিচার ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন তিনি। গ্রিনের মতো সংযত উদারবাদীও বলেছেন, সম্পূর্ণ সামাজিক স্বার্থেই প্রতিরোধের অধিকার বাঞ্ছনীয় এবং এক্ষেত্রে বিরোধিতা নৈতিক কর্তব্য। তবে বিরোধিতা রাষ্ট্রের পক্ষে বা সমাজের পক্ষে অশুভ হলে, সেই বিরোধিতা কাম্য নয়। বার্কার মনে করেন, শোভনতা ও শিষ্টাচারের মাত্রা ছাড়ালে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা আছে, তবে বলপূর্বক আনুগত্য চাপানোর চেষ্টা হলে তার বিরোধিতা হতে পারে।

এক্ষেত্রে ল্যাস্কির মত অত্যন্ত স্পষ্ট। ল্যাস্কি ন্যায় ও নৈতিকতার প্রশ্ন নয়, বিরোধিতার প্রশ্নকে বিচার করেছেন রাষ্ট্রের আইনের কার্যকারিতার যুক্তিতে। যেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আইন জনসাধারণের অনুকূল নয়, সেক্ষেত্রে বিরোধিতা অনিবার্য। ল্যাস্কির বক্তব্যের সারাংশ হল:

- ব্যক্তির জীবনে রাষ্ট্রের আইনের ফলাফলের উপর নির্ভর করে সেই আইনের গুরুত্ব।
- বৃহত্তর সমাজে নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্রের দাবি সীমিত।
- মানুষের প্রতি কর্তব্য পালনই রাষ্ট্রের আনুগত্যের ভিত্তি।
- ব্যক্তির অধিকার চেতনা আহত হলে রাষ্ট্রের প্রতি তার আনুগত্য শিথিল হতে বাধ্য।
- যেহেতু নাগরিকের কল্যাণই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যকে সফল করতেই নাগরিকের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অধিকার থাকা প্রয়োজন।
- শোষণ ও অসাম্যের ভিত্তিতে পরিচালিত রাষ্ট্রকর্তৃত্বের বিরোধিতা কোনোভাবেই অন্যায় নয়।
- বিরোধিতার অধিকার সমাজের এক সংরক্ষিত ক্ষমতা, যার মাধ্যমে যেসব মানুষের বৈধ দাবি আইনের দ্বারা স্বীকৃতী হয়নি, তারা বৈধভাবে রাষ্ট্রশক্তির ভারসাম্য পরিবর্তনের চেষ্টা করতে পারে। মূল্যের বিচারে বিরোধিতা নাগরিকের সর্বশেষ অস্ত্র। যতদিন পরস্পরবিরোধী আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য মানুষ ভিন্ন ভিন্ন পথে চলবে ততদিন রাষ্ট্রদ্রোহিতার আশংকা থাকবে। (Laski: A Grammar of Politics)

বিরোধিতা, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক অস্ত্র। দুষ্ট রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগিতার কথা গান্ধিজিও বলেছেন। বার্ট্রান্ড রাসেল (Bertrand Russell) মনে করেন, নৈরাজ্যবাদের পথে না গিয়ে, সাংবিধানিক পথেই বিরোধিতা কাম্য। ক্ষয়ক্ষতির কথা বিবেচনা করে বিদ্রোহ বা প্রতিরোধ করার অধিকারকে রক্ষণশীলেরা সমর্থন করেন না বটে তবে ম্যাকাইভারের (R. M. Maciver: The Modern State) কথা মনে রেখেই বলা চলে: প্রতিটি যুগেই প্রতিবাদের কণ্ঠ শোনা গেছে। প্রতিটি যুগেই মানুষের মুক্তির স্বপ্ন উজ্জ্বল হয়েছে (In every age the voice of protest has been heard. In every age the vision of human liberation has been glimpsed)।

৪.৮ গ্রন্থসূচী

১. Ernest Barker: Principles of Social and Political Theory (1965); Political thought in England (1965).
২. Harold J. Laski, an Intrduction to Politics (1931); A Grammar of Politics (1925).
৩. Andrew Heywood, Politics (2004).
৪. J. C. Johari : Contemporary Poltical Theory, Basic concepts and Major Trends (1980)
৫. দেবাশিস চক্রবর্তী: রাষ্ট্রবিজ্ঞান: তত্ত্ব ও প্রতিষ্ঠান (২০১২); রাষ্ট্রচিন্তার ধারা (২০১২)।

৪.৯ নমুনা প্রশ্নাবলি

৪.৯.১ রচনাত্মক প্রশ্ন

প্রশ্নের মান ১৮

১. অধিকারের তাৎপর্য বিচার করুন। অধিকারের অর্থ ও বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন।
২. অধিকারের শ্রেণিবিভাজন করুন।
৩. অধিকারের তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪.৯.২ মাঝারি ধরনের প্রশ্ন

প্রশ্নের মান ১২

১. মানবাধিকারের উপর একটি টীকা লিখুন।
২. অধিকারের শ্রেণিবিভাজনের একটি সূত্র নির্মাণ করুন। প্রতিরোধের অধিকার কি বাঞ্ছনীয়? আপনার উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দিন।
৩. অধিকার সম্পর্কে বার্কার ও ল্যাস্কির ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

৪.৯.৩ সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

প্রশ্নের মান ৭

১. অধিকার ও মানবাধিকারের সংজ্ঞা দিন।
২. রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের একটি তালিকা নির্মাণ করুন।
৩. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।
   ক. মানবাধিকারের শ্রেণিবিভাজন
   খ. অধিকারের সাধারণ শ্রেণিবিভাজন
   গ. অধিকার সম্পর্কে মার্কসীয় ভাবনা
   ঘ. প্রতিরোধের অধিকার।

একক ১ ❐ শাস্ত্রীয় গণতন্ত্র

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য
১.২ ভূমিকা
১.৩ গণতন্ত্র : সপ্তদশ শতক
১.৪ গণতন্ত্র : অষ্টাদশ শতক
১.৫ গণতন্ত্র : ঊনবিংশ শতক
১.৬ নমুনা প্রশ্ন
১.৭ গ্রন্থসূচী

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে ছাত্রছাত্রীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলির সঙ্গে পরিচিত হবেন:

- ভূমিকাতে সনাতনী গণতন্ত্র বিষয়ে একটি সামগ্রিক পরিচিতি পাওয়া যাবে।
- সপ্তদশ শতকে গণতন্ত্র
- অষ্টাদশ শতকে গণতন্ত্র
- ঊনবিংশ শতকে গণতন্ত্র

১.২ ভূমিকা

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে প্রাচীন গ্রীসে শাস্ত্রীয় গণতন্ত্রের সূচনা হয়েছিল। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র যা ছড়িয়ে পড়েছিল প্রাচীন এথেন্সের নগররাষ্ট্রে সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটলের বৌদ্ধিক মতবাদে তার বিশেষ কোনও প্রতিফলন ঘটেনি। প্লেটো লক্ষ করেছিলেন জ্ঞান এবং সম্পত্তির বিনিময়ে গণতন্ত্র হল উচ্ছৃঙ্খল জনতার শাসন। আবার অ্যারিস্টটল দেখেছিলেন গণতন্ত্রকে একটি প্রাচীন বিপথগামী বা বিকৃত সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন হিসেবে। তা হলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রাচীন এথেন্সকেই গণতন্ত্রের জন্মস্থান হিসেবে গণ্য করা হয়, যার কেন্দ্রবিন্দু ছিল অংশগ্রহণকারী গণতন্ত্র।

মধ্যযুগের ইউরোপের দীর্ঘ সময়টুকু বাদ দিলে গণতন্ত্রের ধারণার পুনরুত্থান ঘটে সপ্তদশ শতাব্দীতে ১৬৪০ সালের পিউরিটান বিপ্লবের সময়ে এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে রাজনৈতিক দর্শন হিসাবে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে মাত্র গত চারশ বছরে। রাষ্ট্রভাবনার গত আড়াই হাজার বছরের ইতিহাসকে তাই গণতন্ত্রের ইতিহাসের সমার্থক বলা যাবে না।

আধুনিক লেখকদের মতে, প্রাক্-আধুনিক বা প্রাক্-রেনেসাঁস পর্বে গণতন্ত্র বলতে বেঝাত এথেনীয় নগররাষ্ট্রীয় গণতন্ত্র। কিন্তু এথেন্সের গণতন্ত্র সীমাবদ্ধ ছিল শুধুমাত্র এথেন্সবাসীদের মধ্যে। এই সময়ে এথেন্সের এক-তৃতীয়াংশ মানুষই ছিলেন এথেন্সবাসী, কারণ বাকি দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ ছিলেন মেটিক (বহিরগত) এবং ক্রীতদাস, যাদের নগরিকত্ব ছিল না। গণতন্ত্র যদি মানুষের দ্বারা চালিত হয় তাহলে প্রচীন এথেনীয় গণতন্ত্র প্রকৃত গণতন্ত্র ছিল না, কারণ একটি বড় অংশের মনুষই এই গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ করতে পারত না। গ্রীসে ক্রীতদসত্ব সামাজিক প্রথা হিসাবে চালু

থাকলেও এথেনীয়দের সাফল্যকে খাটো করে দেখা চলে না। গণতন্ত্রের আবির্ভাবের আগে এথেন্সে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও বিত্তবানদের শাসন চালু ছিল। তাই খণ্ডিত হলেও এথেনীয় নাগরিকরা গণতন্ত্র একভাবে অর্জন করেছিল। তাই পশ্চিমী রাষ্ট্রতাত্ত্বিকদের মতে অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এথেনীয়রা যে গণতন্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সৃষ্টি করেছিল, তা ছিল আগমী দিনের বিশ্বে গণতন্ত্রের পূর্বসূরি। এথেন্সে গণতন্ত্রের উদ্ভবের পর এথেন্সবাসীরা একটি স্বাধীন পরিবেশ পেয়েছিল যেখানে তারা অভ্যন্তরীণ ও বিদেশনীতি, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হতে পারত। আলাপ-আলোচনার এই চরিত্রই হল গণতন্ত্রের নির্যাস।

অনেকের দ্বারা পরিচালিত বা সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন যেখানে গণতন্ত্রের প্রধান কাঠামোগত নীতি তৈরি করে দেয়, একটি মুক্ত, স্বাধীন, সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশই হল সেখানে গণতন্ত্রের মূল কথা। এথেনীয় গণতন্ত্র ছিল প্রধানত দাসভিত্তিক। উইল ডুরান্ট সম্ভবত ঠিক বলেছিলেন যখন তিনি এথেন্সের গণতন্ত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে "ইতিহাসে সংকীর্ণতম এবং সম্পূর্ণ, সংখ্যার দিক থেকে সংকীর্ণতম (যারা সুযোগ সুবিধা ভোগ করত) এবং আইন প্রণয়ন ও প্রাশাসনিক ব্যবস্থা নেবার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও সমানাধিকারের ভাবনাকে পূর্ণতম" আখ্যা দিয়েছিলেন।

এটা বলা হয়ে থাকে যে প্রাচীন এথেনীয় গণতন্ত্র এবং আধুনিক গণতন্ত্রের মাঝামাঝি সময়ে মধ্যযুগে ইতালি, ফ্রান্স জার্মানী এবং ছোট দেশ, যেমন বেলজিয়াম এবং হল্যান্ডের নগর-প্রজাতন্ত্রে বিভিন্ন স্বাধীন কমিউন গড়ে উঠেছিল। স্কিনার বলেন 'ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে লোম্বার্ডি ও টাসকানির অনেক কমিউন স্বাধীন নগর রাষ্ট্রের চেহারা নেয়। তাদের লিখিত সংবিধান এবং নির্বাচন ও স্বশাসনের ব্যবস্থা ছিল। স্কিনার আরও বলেন যে ইতালির নগর প্রজাতন্ত্র ছিল পরবর্তীকালের স্বৈরতন্ত্র ও স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিরুদ্ধে অনুপ্রেরণাস্বরূপ। তিনি সাবধান করেছেন যে নগর প্রজাতন্ত্র থেকে আধুনিকত গণতন্ত্রে একটি সরলরেখা টানাটা হবে অতিসরলীকরণ। প্রজাতান্ত্রিক ইতালিয়ান নগরগুলিতে স্বশাসন নিয়ে প্রজাতান্ত্রিক ইতালিয়ান নগরগুলিতে স্বশাসন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা খুব কম সময় ধরে চলেছিল। তাছাড়া বেশিরভাগ সময়ে তারা নিজেদের মধ্যে কলহে লিপ্ত ছিল। মধ্যযুগের কমিউনগুলিকে আধুনিক গণতন্ত্রের পূর্বসূরি বলা চলে না। কিন্তু এদেরকে সেতু হিসাবে গণ্য করা যায় গ্রীক প্রজাতন্ত্র ও আধুনিক সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে। মধ্যযুগীয় প্রজাতান্ত্রিক নগরগুলির বৈশিষ্ট্য ছিল যে এদের ভিত্তি ছিল ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন পেশাগত গোষ্ঠী। এই কমিউনগুলি কৃষকদের থেকে অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন ও তাদের বিরোধী হলেও ক্রীতদাসদের ওপর নির্ভরশীল ছিল না। এই গুণশীল গণতন্ত্রকে অতিক্রম করেছিল রেনেসাঁ-উত্তর প্রজাতন্ত্র ও গণতন্ত্র। জর্জ নোভ্যাক সঠিকভাবেই বলেছেন, আধুনিক গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হলো তার বৃহত্তর পরিসর। আধুনিক গণতন্ত্র তাই অল্প সংখ্যক মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না (যেমন ছিল প্রাচীন এথেন্স), এবং শুধুমাত্র শহরের মধ্যেও সীমাবদ্ধ থাকে না (যেমন মধ্যযুগীয় প্রজাতান্ত্রিক নগর): তারা পরিসরে জাতীয় এবং এর প্রতিযোগিতার ভিত সমস্ত দেশের মধ্যে হবার ফলে স্থানীয় একচেটিয়াদের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে না। পরিশেষে এটা লক্ষ করা যায় যে পশ্চিমে রাজনীতির চর্চায় গণতন্ত্রের ধারণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল উইলিয়াম অফ মইরব্যকে অ্যারিস্টটল-এর রাজনীতিকে লাতিনে অনুবাদ করার পরে। মইরব্যকে 'গণতন্ত্র' শব্দটি মানুষের শাসন অনুবাদ করেছিলেন। সময়টা ছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে। সেই সময় সীমিত পরিসরের কারণে প্রজাতান্ত্রিক নগরগুলিতে গণতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত না হলেও এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে এই নগরগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে গণতন্ত্রের বিকাশে। মধ্যযুগের এই কমিউনগুলির সব রাজনৈতিক পদের নির্বাচন ক্ষমতা ছিল, এবং এটাও সত্য ছিল যে ভোট দেবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল শুধুমাত্র পুরুষ এবং করপ্রদানকারী ব্যক্তিদের মধ্যে। কিন্তু এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও স্কিনার বলেছেন নির্বাচনের নীতি বিশেষ প্রশংসনীয়। সেই সময় গণতন্ত্রের প্রবক্তা হিসাবে মারসিলুইস অফ পাদুয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Defender of Peace'-এ (১৩২৪ খ্রি.) জোরের সঙ্গে দেখালেন যে একমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমেই শ্রেষ্ঠ শাসন ও ন্যায়বিচার পাওয়া সম্ভব।

১.৩ গণতন্ত্র : সপ্তদশ শতক

বিশ্বের সর্বত্র আজ গণতন্ত্রের যে ব্যাপ্তি তার সবই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের রাজনৈতিক চিন্তা এবং প্রয়োগের ফসল। তবে এগুলির মূল নিহিত রয়েছে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের বিভিন্ন বৈপ্লবিক ঘটনা ও শাস্ত্রীয় রচনার মধ্যে। এটা বলা যায় যে নয়া-দক্ষিণপন্থী বা নয়া রক্ষণশীল বা নয়া-উদারনীতিবাদীদের ইচ্ছা সত্ত্বেও গণতন্ত্রের ঐতিহ্য আরও বেশি ঐশ্বর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে সমস্ত গোষ্ঠী ও মানুষের মধ্যে। সমাজতন্ত্রী এবং উদারনীতিবাদীরাও গণতন্ত্রের পথ গ্রহণ করেছেন। প্রত্যেকটি ব্যবস্থা গণতন্ত্রের দাবি মেনে নিতে আগ্রহী, গণতন্ত্রই একমাত্র মানুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সরকার। তা ছাড়া রাজনৈতিক সাম্যের নীতি এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার বণ্টন গণতন্ত্রের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

প্রশ্ন ওঠে: আধুনিক গণতন্ত্র কি পারে প্রাচীন এথেন্সের প্রথা অনুযায়ী নাগরিকদের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করা সুনিশ্চিত করতে? উত্তরটি নেতিবাচক। গণভোট বা গণবৈঠক বাস্তবে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় খুবই কম দেখা যায়। বর্তমানে মানুষ নিজেকে নিজেই শাসন করে সরাসরি কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নেয় না। তাঁরা পাঠান কোনও প্রতিনিধিকে যাঁরা সিদ্ধান্ত নেন। সেজন্য বর্তমানে মানুষের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অর্থ নির্বাচনিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা। সেই কারণে গণতন্ত্রের অর্থ প্রতিনিধত্বমূলক গণতন্ত্র। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রিটেনে প্রথম প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার চালু হয়।

১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে পিউরিটান বিপ্লবের মাধ্যমেই আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সূচনা হয় এবং ইংলন্ডের গৃহযুদ্ধের লেভেলার নামধারী জঙ্গীগোষ্ঠীদের কৃতিত্ব হল প্রথম আধুনিক গণতন্ত্রী এই তকমা পাবার। ডেভিড উটন এদের সম্পর্কে বলেন লেভেলাররাই প্রথম যে রাজনৈতিক আন্দোলন গঠন করেছিল তার ভিত্তি ছিল গণসার্বভৌমত্ব। তাঁরাই ছিলেন প্রথম গণতন্ত্রী যাঁরা শুধুমাত্র নগর-রাষ্ট্রে অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র ও স্বশাসিত সরকারের জন্য নয়, গোটা রাষ্ট্রের জন্য প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের কথা বলেছিলেন। তাই গণতন্ত্র ছিল একটি বৈপ্লবিক ধারণা। এটি চালু করেছিলেন বিপ্লবীরা, যেমন লেভেলাররা। এটাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ যে গণতন্ত্রের উৎস বৈপ্লবিক। এটা এই ভুল ধারণাকে অপসারণ করবে, যা অনেক লেখক ভাবতে উৎসাহিত বোধ করেন যে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ গণতন্ত্রের বিরোধী। জর্জ নোভ্যাক Democracy and Revolution-এ বলেছিলেন যে পশ্চিমের অন্তত ছটি নির্দিষ্ট সামাজিক ও রাজনৈতিক ধাপ পুঁজিবাদ এবং গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটিয়েছিল। প্রথম ধাপ হল ষোড়শ শতাব্দীর শেষে ডাচ বিপ্লব, যার ফলে নেদারল্যান্ডস স্বাধীনতা অর্জন করেছিল এবং প্রজাতন্ত্র গঠন করেছিল। নোভ্যাকের-এর মত অনুযায়ী দ্বিতীয় বড় ধাপ হল সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলন্ডের (বৈপ্লবিক আন্দোলন) পিউরিটান বিপ্লব এবং গৌরবময় বিপ্লব। এই বিপ্লব উদীয়মান মধ্যবিত্তদের প্রতিপত্তিকে পার্লামেন্টে সুরক্ষিত করেছিল। তৃতীয় এবং চতুর্থ ধাপ হল আমেরিকান বিপ্লব (১৭৭৬) এবং ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯), পঞ্চম ধাপ হল ১৮৪৮-এ ইউরোপের তুলানামূলক দুর্বল বিপ্লব। এবং ষষ্ঠ ধাপ হল আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ গণআন্দোলন, যেটি আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ আরম্ভ করতে সহায়তা করেছিল (১৮৬১)।

১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে ইংলন্ডে বিপ্লব শুরু হয়েছিল রাজতন্ত্র এবং গির্জাকে আক্রমণ করে। গৃহযুদ্ধ, নোভ্যাক বলেছেন ত্বরান্বিত হয়েছিল প্রথম চার্লস-এর নিজের ক্ষমতাকে পার্লামেন্টে এবং পিউরিটান বিপ্লবের চার্চের কাছে ক্ষমতা স্থানান্তরিত করতে রাজী না হওয়ার কারণে। গোটা ইংল্যান্ডকে তীব্র গৃহযুদ্ধ কাঁপিয়ে দিয়েছিল যা সাধারণ মানুষকে একত্রিত করেছিল বিপ্লবী গণতন্ত্রের পক্ষে, যাকে বলা হয়েছে লেভেলারদের গণতন্ত্র। তারা প্রতিনিধিত্ব করেছিল জনসাধারণের প্রকৃত অর্থেই লড়াকু একটি বিপ্লবী গণতান্ত্রিক কর্মসূচির পক্ষে। এছাড়াও বিত্তহীন কৃষকদের নিয়ে একটি অতি-বাম গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল যার নাম ছিল 'ডিগার', যারা দাবি করত যে তারাই হল প্রকৃত লেভেলার। লেভেলারদের দাবি ছিল যে পার্লামেন্ট সাধারণ মানুষের দ্বারা চালিত হবে এবং তারা ছিল ব্যাপকতম নির্বাচনের পক্ষে। গণতন্ত্রের এই প্রচার সবথেকে বেশি করেছিলেন কর্ণেল 'রেনবরো' যাঁর মতে, "আমি মনে করি ইংল্যান্ডের সবচেয়ে পরাক্রমশালী

ব্যক্তির মতো দুর্বলতম মানুষটিরও জীবনের অধিকার আছে। লেভেলারারদের আন্দোলন বিভিন্ন দাবি তুলেছিল যা আধুনিক গণতন্ত্রের অংশ হয়ে ওঠে। তারা ব্যাপক গণতন্ত্রীকরণ চেয়েছিল গির্জার ও রাষ্ট্রের এবং পার্লামেন্টীয় বাৎসরিক নির্বাচনের। তারা প্রস্তাব করেছিল একটি সাংবিধানিক ব্যবস্থার যেখানে সংবাদপত্র হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন। লেভেলার আন্দোলনে পরিচিতি মুখ হলেন জন লিনর্বান, রিচার্ড ওভারটন, উইলিয়াম অয়ালভেন। মূলত এই বিপ্লবী গণতান্ত্রিক আন্দোলন টিকে ছিল এই স্বল্পসময়ে তারা যে কার্যকরী প্রভাব ফেলেছিল তার দৌলতে। হ্যারিনটন এবং উইলিয়াম পেথির মতন ব্যক্তিরা গণতন্ত্র সম্বন্ধে তাদের বক্তব্যে লেভেলারদের প্রস্তাব পুনুরুক্তি করেছিলেন। সি.বি. ম্যাকফারসেন বলেন যে সাম্যবাদীরা গণতান্ত্রিক ছিলেন না, কারণ সাম্যবাদীরা তাঁদের দাবিতে গণতন্ত্র শব্দটি ব্যবহার করেননি এবং তাঁরা ছিল সীমত ভোটাধিকারের পক্ষে। ডেভিড উটন ম্যাকফারসেনের বক্তব্যকে উপেক্ষা করে বলেছিলেন যে লেভেলারা শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক নন তারা প্রত্যক্ষভাবে ধর্মনিরপেক্ষও বটে। তাঁদের নেতা রিচার্ড ওভারটন নির্দলদের ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণার প্রস্তাব খারিজ করেছিলেন। তাঁদের সমস্যা ছিল যে তারা কোনো রাজনৈতিক দল তৈরি করেনি। তারা নির্বাচনে লড়েন নি এবং তাদের কোনও রাজনৈতিক দলভিত্তিক সরকারের ধারণা ছিল না। তারা প্রতিনিধিমূলক সরকার চেয়েছিল কিন্তু তারা কোনো পথ দেখায়নি কীভাবে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার পরিচালিত হবে। বিশ্বাস ছিল না সরকারের প্রাতিষ্ঠানিকতায়, তারা বিশ্বাস করত ব্যক্তিগত স্বাধীনতায়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে প্রশংসা করেছিলেন জন মিলটন তাঁর লেখা এরিওপ্যাগিটিকায়। (১৬৪৪)।

সপ্তদশ শতাব্দীতে গণতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং উদারনীতিবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। লেভেলাররা নিজেরাই ছিল ঘোর ব্যক্তিতন্ত্রবাদী। তারা বিশ্বাস করত যে প্রত্যেকের অধিকার আছে কাজ করার, উপাসনা করার। বিবেকের স্বাধীনতা, সরকার গঠনের স্বাধীনতা, নির্ভয়ে কথা বলার অধিকার, মত প্রকাশ করার এবং দাবি পেশ করার স্বাধীনতা আছে। তারা এটাও বিশ্বাস করত যে মানুষকে নিজের সম্পত্তির কেনাবেচার স্বাধীনতা থাকবে। গেটেল বলেছেন, পিউরিটান বিপ্লবের সময় মিলটন, যিনি ছিলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রথম প্রবক্তা, নাগরিক অধিকারের অন্যতম সূচক হিসেবে কেবলমাত্র মত প্রকাশের অধিকারের স্বাধীনতার পক্ষেই সওয়াল করেন নি,—তাঁর কাছে এটি ছিল যুক্তির ক্ষমতার বিকাশে ও মানুষের মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে পরম সহায়ক।

রাজতন্ত্র-ঘেঁষা চরম ক্ষমতার পক্ষে হংস ও কিলমার সওয়াল করলেও সপ্তদশ শতাব্দীর গণতন্ত্র উদারনীতিবাদের সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। উদারনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মূল উপাদানগুলি বিধৃত হয়েছিল জন লক্-এর Second Tradition on Civil Government রচনায়—যে সময়টা ছিল ইংল্যান্ডে গৌরবময় বিপ্লবের (১৬৮৮) কালপর্বে হুইগদের উত্থানপর্ব। নাগরিক সমাজ সম্পর্কে লক-এর ধারণা এটাই ছিল যে, এটি হল স্বাধীন মানুষদের সমাজ, যারা আইনের চোখে সমান, যারা প্রত্যেকের অধিকারের সম্মান সম্পর্কে সমানভাবে সচেতন থাকা ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হয় না। লক বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যক্তিস্বাধীনতার সম্পর্ককে। তাঁর স্পষ্ট ধারণা ছিল যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পূর্বশর্তটি হল ব্যক্তিগত সম্পত্তি যাকে নিশ্চিতভাবে আইনের অনুশাসন দিয়ে রক্ষা করতে হবে। জন গ্রে যেমন দেখিয়েছেন, লক-এর পরে উদারনীতিবাদের অন্যতম বক্তব্য এটাই হয়ে দাঁড়ায় যে, নাগরিক সমাজ ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যাপকতম প্রসার দাবি করে।

১.৪ গণতন্ত্র : অষ্টাদশ শতক

ইউরোপে অষ্টাদশ শতক বিপ্লবের শতক হিসাবে পরিচিত। বিশেষত অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ ছিল এমন একটি সময় যখন ঘটে গিয়েছিল পশ্চিমী সভ্যতার কতকগুলি সাড়া জাগানো ঘটনা, যা রচনা করেছিল আধুনিক গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির ভিত্তি। রবার্ট আর পামার-এর মতে ১৭৬০ থেকে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ এই চার দশক ছিল গণতান্ত্রিক বিপ্লবের

কালপর্ব। আমেরিকান বিপ্লব (১৭৭৬) এবং ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯) ছাড়া শিল্পবিপ্লবও (১৭৬০ সাল থেকে যার শুরু) আধুনিক পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে বিকাশে ইতিবাচক অবদান রেখেছিল। গণতান্ত্রিক মতাদর্শের শক্তি অঙ্গাঙ্গিভাবে শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত। একদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও অগ্রগতি এবং অপর দিকে উৎপাদনব্যবস্থার বৈপ্লবিক অদলবদল (যেমন ফ্যাক্টরি ব্যবস্থার মাধ্যমে বড় মাপের উৎপাদন) জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণকে সম্ভবপর করেছিল। এই উন্নয়নের সুবাদে বৃহত্তর জনগণের জন্য আরও বেশি সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা হয়, যার ফলে তারা একদিকে রোগ ও অনাহার ও অপরদিকে নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে ক্ষমতাবান হয়েছে। অর্থাৎ, শিল্পবিপ্লবের ব্যপ্তি ছিল বহুদূর প্রসারিত, যা পুরুষ এবং মহিলাদের এক বড় অংশকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাছাড়া বিভিন্ন উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবকেরা বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের পক্ষে জনগণের ক্ষমতাকে সংঘবদ্ধ করাকে প্রয়োজনীয় ও সম্ভবপর করে তুলতে পেরেছিল। শিল্পবিপ্লব গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য অপরিহার্য গণসংযোগের পরিসর বৃদ্ধিতে নেতৃত্ব দিয়েছিল। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন এনে শিল্পবিপ্লব পরোক্ষভাবে স্থানিক ও শ্রেণিপার্থক্যকে ভেঙে দিয়েছিল, যেগুলি বহুদিন ধরে দাঁড়িয়ে ছিল মানুষের মধ্যে ব্যবধান হিসেবে। এই ধরনের বাধা এবং অসাম্য ছিল গণতন্ত্রের পথে প্রতিবন্ধক। তাই শিল্পবিপ্লব রাজনীতিতে মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণকে সম্ভবপর করেছিল। বৈধতার গণতান্ত্রিক নীতিকে আরও জোরদার করার সঙ্গে সঙ্গে জনগণের মধ্য থেকে কার্যকরী নেতৃত্ব উৎসারিত হতে শুরু করে।

শিল্পবিপ্লব ছিল একটি অবিচ্ছিন্ন সামগ্রিক প্রক্রিয়া যা ছিল পুরনো দিনের সামন্ত প্রথার ভাঙনের সঙ্গে যুক্ত। আবিষ্কার ও যন্ত্রপাতির বিকাশ মানুষের উন্নতি ও সুযোগ বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল। পুরনো স্তরভেদভিত্তিক সম্পর্ক ভেঙে গেল এবং উৎপাদনের হাতিয়ারের দখল নিয়ে মালিকদের এক নতুন শ্রেণির, যা অর্থনীতি ও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে, তার উদ্ভব ঘটল। মার্কসবাদী পরিভাষা ব্যবহার করলে, শিল্পবিপ্লব বুর্জোয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠার রাস্তা প্রস্তুত করে দিয়েছিল, এবং বুর্জোয়া বা নতুন শ্রেণিগুলি তাদের মতাদর্শ হিসাবে গণতন্ত্রকে ঘোষণা করল এবং আরও ঘোষণা করল তাদের দুর্দান্ত রাজনৈতিক শ্লোগান হিসাবে স্বাধীনতা ও সাম্যের ধারণা।

গণতান্ত্রিক আন্দোলন আটলান্টিকের অন্য তীরে ইংল্যান্ডের উপনিবেশগুলিতে শুরু হয়। ১৭৭৬ সালের আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল আধুনিক সময়ের মধ্যে প্রথম বিজয়ী ঔপনিবেশিক বিদ্রোহ। বিজয়ের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্মাতারা একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে জনগণের ঐক্যসাধন করেছিলেন। প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার বেশিরভাগ যুক্তরাজ্যেই গঠিত হয়েছিল এবং কিছু নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ভোটাধিকারের সীমা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রসারিত করা হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্বে এই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিঃসন্দেহে বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল।

আমেরিকান বিপ্লব স্প্যানিশ কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে লাতিন আমেরিকার (বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে) মানুষের স্বাধীনতার যুদ্ধকে উদ্দীপিত করেছিল। এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই বিপ্লব শুধু ভোটদাতা হিসেবে নয়, শাসক হিসাবে মানুষকে সরকারি ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হবার মত একটি গণতন্ত্র তৈরি করল। মার্কিনরা পেল এমন এক ব্যবস্থা যেখানে 'সরকার হল সবার জন্য', যেখানে শাসক শাসিততে পরিণত হতে পারে। গর্ডন. এস. উড বলেন, 'প্রতিনিধিত্বকে প্রসারিত করে গোষ্ঠী ও সরকারের মাধ্যমে। আমেরিকানরা রাষ্ট্রীয় মাধ্যমে ও রাজ্যপর্যায়ে কর্মকর্তাদের সাংখ্যাধিক্যতে তাদের নতুন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নিরিখে ন্যায্যতা দান করতে পেরেছিল। তারা সবাই হয়ে উঠলেন সীমিত অর্থে জনগণের প্রতিনিধি। উড আরো লিখলেন, মানুষ সর্বত্র শাসন করছে, অথবা একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তারা কোথাও শাসন করছে না। আমেরিকানরা এখন নিজেদের মধ্যেই বলতে শুরু করলেন, তারা কেউই এমনকি ব্রিটিশরা প্রতিনিধিত্বের নীতিকেও বুঝতে পারেনি। অনেক আগে ম্যাডিসন ও ফেডেরালিস্ট-এ লিখলেন, প্রতিনিধত্বের ওপর নির্ভর করেই গোটা মার্কিনী সরকারি ব্যবস্থা চলে। আমেরিকানরা আরও দেখলেন যে সরকারকে চালাবে একটি অবসরভাগী শ্রেণি নয়, তাকে চালাবে মানুষ, যাকে খেটে রোজগার করতে হয়। তাই অষ্টাদশ শতকের শেষে গণতন্ত্রের

নতুন ভাবনায় অবসরভোগী জমির মালিকানাভিত্তিক শ্রেণিটির অবসান ঘটল। গণতান্ত্রিক তত্ত্বের বিকাশে তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯) অবদান বিপুল। গণতন্ত্র সামন্ত্রতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গড়ে ওঠেনি। ফরাসি বিপ্লব পুরানো ব্যবস্থাকে ভেঙে দিল।

এই বিপ্লব পুরানো ব্যবস্থার তিনটি প্রধান স্তম্ভকে—রাজতন্ত্র, গির্জা ও সামন্ত্রতান্ত্রিক অভিজাততন্ত্রকে পর্যুদস্ত করে দিয়েছিল। সুতরাং ইউরোপীয় সামন্ত্রতন্ত্রের শিরদাঁড়া ভেঙে দিয়ে গণতন্ত্রের পথ তৈরি হল। মার্কসবাদীরা ফরাসি বিপ্লবকে 'বুর্জোয়া বিপ্লব' হিসেবে দেখে থাকেন। ১৭৮৯-৯৯ পর্বে পর্যদে এবং কনভেনশনে গিরোন্দিস্তদের রক্ষণশীল ভূমিকা, তাদের ওপর প্যারিসের সাঁ কুলোতদের আক্রমণ, জ্যাকোবিন একনায়কত্ব থারমিডর প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি ঘটনা বিপ্লব ও গণতন্ত্রের সম্পর্ককে স্পষ্ট করেনা। তা সত্ত্বেও ১৭৮৯-এর এই যুগান্তকারী ঘটনা সভ্য বিশ্বের কাছে যে সামাজিক এবং রাজনৈতিক বার্তা বয়ে এনেছিল, তার অবদানকে প্রশংসা করতেই হয়। উদাহরণস্বরূপ এই বিপ্লবের মহান ইতিহাসবিদ হিসাবে জর্জ লেফেবার ১৭৮৯-এর বিপ্লবের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে মানুষের ও নাগরিকদের ঘোষণাকে গণ্য করেছিলেন। গণতান্ত্রিক কার্যকলাপের নিরিখে আইনশৃঙ্খলা তদারকির জন্য একটি নতুন সংস্থার সৃষ্টি এমনই এক দৃষ্টান্ত। জর্জ নোভাক লিখেছেন যে জ্যাকোবিন প্রজাতন্ত্রের সময়ে বিপ্লবের সবচেয়ে বড় স্থায়ী অবদান ছিল ফরাসি সেনাবাহিনীর পুনরুজ্জীবন ও গণতন্ত্রীকরণ। কোন সন্দেহ নেই যে রোবসপিয়ের এবং তাঁর অনুগামীদের গিলেটিন দিয়ে হত্যা করে ফরাসি বিপ্লব যে গণতন্ত্রের কুসুমকে প্রস্ফুটিত করেছিল তাকে নষ্ট করা হয়, কিন্তু নষ্ট হয়নি বিপ্লবের বার্তা। ধীরে ধীরে কিন্তু স্থিরভাবে দেশে 'আমজনতা' তাদের নেতা স্থির করে নেয়। ফ্রান্সে গ্রাকুস বারেয়ুফ নিজেই দরিদ্রদের সমস্যার সমাধানে একটি কমিউনিস্ট সমাধান বাতলে দিয়ে ১৭৯৬ সালে ক্ষমতা দখলের একটি ব্যর্থ প্রয়াস করেন। তাঁর ভাবনায় সাম্যের মাধ্যমে প্রকৃত গণতন্ত্র সুনিশ্চিত হবে।

ফরাসি বিপ্লবের গণতান্ত্রিক স্তর সীমিত হলেও এই বিপ্লব জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণাকে জনপ্রিয় করতে সফল হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর চিন্তাবিদদের মধ্যে যারা গণতন্ত্রের তাৎপর্যকে গুরুত্ব দেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মঁতেস্কু, রুশো বা বেনথাম। মঁতেস্কু তাঁর The Spirit of Laws-এ রাজনৈতিক সমাজতাত্ত্বিক হিসেবে সমাজব্যস্থার নীতি ও সরকারের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে সম্পূর্ণ নির্দেশ দিতে বলেন। তাঁর মতে স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে ভীতি ও রাজতন্ত্রের সঙ্গে সম্মানের ভাবনা সম্পর্কিত। যখন সমাজে নীতির ভাবনা প্রভাবশালী হয় তখন রাজনৈতিক ব্যবস্থা একটি গণতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক চেহারা নেয়। গণতন্ত্রকে ব্যক্তিস্বাধীনতার সবচেয়ে ভালোভাবে উপযোগী করার জন্য মঁতেস্কু ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি হিসাবে সরকারের তিনটি বিভাগের পৃথকীকরণ প্রস্তাব করেছিলেন, যার ফলে তৈরি হবে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ। ১৭৮৯ সালের বিপ্লবের এগারো বছর আগে রুশোর মৃত্যু হলেও তাঁর লেখনী দ্বারা বিপ্লবীরা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ও সমতা ছিল তাঁর আদর্শ। তাঁর সাধারণ ইচ্ছার ধারণা সমাজে সাধারণ স্বার্থের অনুযায়ী (সাধারণ ইচ্ছা সদস্যদের প্রকৃত ইচ্ছার জন্ম দেয়) এবং এই সাধারণ স্বার্থ, তিনি বিশ্বাস করতেন, কোনো প্রতিনিধিমূলক সরকারের দ্বারা সুরক্ষিত হতে পারেনা। রুশো ব্রিটিশ সংসদীয় গণতন্ত্রকে অনুমোদন করেন নি, প্রকৃত ও বৈধ কর্তৃত্ব শুধুমাত্র সাধারণ ইচ্ছার সার্বভৌমত্বের অধীনেই আসে। রুশোর চিন্তায় গণতান্ত্রিকতার উপাদান অস্বীকার করা যায় না। তাঁর প্রস্তাব ছিল নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সংসদকে ডেকে সাধারণ ইচ্ছার সার্বভৌম ভাবনাকে মান্যতা দেওয়া। জেরেমি বেনথাম, ব্রিটিশ হিতবাদী দর্শনের জনক, মননে ছিলেন উদারনীতিবাদী গণতন্ত্রী। দুঃখ ও আনন্দের ক্যালকুলাসের কথা বলেও সংখ্যাগরিষ্ঠের কল্যাণে সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্যের মৌলিক গণতান্ত্রিক নীতির কথা ভোলেন নি। শিষ্য মিল-এর তুলনায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক, যখন তিনি বললেন যে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় 'প্রত্যেকের মান সমান এবং কারও মান বেশি নয়।' বেন্থামের মতে, রাষ্ট্র হল ব্যক্তির চোখে একটি অছি এবং এটি হল একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। তাঁর কাছে সব মানুষের অধিকার সমান এবং আইনের চোখেও সবাই সমান। বেন্থামের বিকল্প ছিল গণতন্ত্রধর্মী, যার ভিত্তি ছিল সমতার নীতি। তাঁর কাছে যে সমাজে অসাম্য সেভাবে চোখে পড়েনা, সেই ব্যবস্থা যেখানে অসাম্য বিরাজ করে তার তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি ভাগ্যবান।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী উপাদান অষ্টদশ শতকের গণতন্ত্রের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়পর্ব ছিল আলোকায়নের পর্ব,—যে পর্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং ব্যক্তি ও সমাজের সমস্যার যুক্তিসম্মত বিবেচনা। সুতরাং কান্ট-এর মত একজন ভাববাদী দার্শনিকও বলেন যে, ব্যক্তিকে গণ্য করতে হবে উদ্দেশ্য হিসেবে, মাধ্যম হিসেবে নয়।

১.৫ ঊনবিংশ শতক

বাস্তবের দুনিয়ায় গণতন্ত্র একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতিকেই স্বীকৃতি দেয়। জনগণের শাসনকে বাস্তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন হিসেবেই মেনে নেয়া হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছাকে অগ্রাধিকার দেবার প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করেই একটি বিতর্কের জায়গা তৈরি হয়েছিল। 'জনগণের সার্বভৌমত্ব'-এর দাবিটি ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর গণতন্ত্রের ভাবনার ক্ষেত্রে একটি প্রধান সাফল্য। রুশো ও জ্যাকেবিনদের রচনায় তার নির্দশন মেলে। এই দাবির ওপর ভিত্তি করেই জনগণের সরকার এবং সমানভাবে প্রতিনিধিত্ব করবে জনগণের দ্বারা পরিচালিত সরকার,—এই ধারণাগুলি বিকশিত হয়েছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের চিন্তাবিদ্‌রা দেখলেন যে বাস্তবে গণতন্ত্র বলতে একচেটিয়াভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বকারী সরকারের ধারণাকেই মান্যতা দেয়া হল। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট ইংরেজ উদারনীতিবাদী চিন্তক জন স্টুয়ার্ট মিল-এর মতে, সংখ্যাগরিষ্ঠতার এই ভাবনা এক অলীক ধারণার ওপরে নির্ভরশীল। বিশিষ্ট ফরাসি চিন্তাবিদ্ আলেক্স দ্য তক্‌ভিল ও মিল-এর এই ভাবনাকে আঁচ করে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচার সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। এঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠতবাদের ভাবনা সম্পর্কে ছিলেন যারপরনাই নাস্তিক।

সংখ্যাগরিষ্ঠবাদ সংখ্যালঘু ও ব্যক্তির প্রতি এক ধরনের অসংবেদনশীল মনোভাব প্রদর্শন করে। যখন শক্তিশালী সংখ্যাগরিষ্ঠরা সংখ্যালঘুদের ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করে, তখন সেটি গণতন্ত্রের বিকৃতি হয়ে দাঁড়ায়। তাই মিল সংখ্যার গণতন্ত্রকে অলীক গণতন্ত্র আখ্যা দিয়েছিলেন। এই ধরনের গণতন্ত্রকে দাসত্বেরই পথে এক ধাপ গণ্য করা যায়। মিল-এর সমস্যা হল যে তিনি ছিলেন মূলত একজন উদারনীতিবাদী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তাবিদ। অন্য কোনও উন্নততর বিকল্প নেই,—সেই কারণেই তিনি প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রকে বাস্তবায়িত করেছিলেন। কিন্তু তিনি এও মানতেন যে আদর্শ হিসেবে সর্বোত্তম হলেও এটি সর্বত্র প্রযোজ্য নয় এবং মিল যে সব নির্ধারিত শর্ত দিয়েছিলেন বাস্তবে সেগুলি পূরণ করা বহু দেশের পক্ষেই অত্যন্ত কঠিন ও প্রায়শই অসম্ভব।

মিল-এর মতে, একটি গোষ্ঠীর, তার পছন্দমত একটি সরকার গঠনের জন্য, তিনটি শর্ত পূরণ করা আবশ্যক। (ক) তাঁরা সরকারটি সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক এবং বুঝতে সক্ষম কিনা; (খ) তাঁরা সরকারের প্রতিশ্রুতিগুলি বুঝতে ইচ্ছুক এবং সক্ষম কিনা; (গ) তাঁরা সরকারটিকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করতে ইচ্ছুক এবং সক্ষম কিনা। আর গণতন্ত্রই যখন পছন্দের বিষয়, মিল তখন অন্যান্য আরও কিছু শর্ত যোগ করেন। এমনকি, আধুনিক ভারতেও, যেখান পুরুষ ও মহিলারা দারিদ্র ও নিরক্ষতার শিকার, মিল-এর দেয়া শর্তগুলি বাস্তবায়িত হবে না। মিল জনগণের মতিগতি সম্পর্কে খুবই সন্দিহান ছিলেন। তিনি ছিলেন মূলত এলিটপন্থী। তিনি 'এক ব্যক্তি এক ভোট' নীতিকে সমর্থন করেনি। তিনি ছিলেন বহুত্ববাদী নির্বাচন প্রক্রিয়ার সমর্থক। তাঁর স্ববিরোধিতা এখানেই যে মহিলাদের ভোটাধিকারের প্রশ্নে প্রবলভাবে মুক্তমনা হলেও ভোট দানের প্রশ্নে তিনি ছিলেন মানসাপেক্ষ নির্বাচনের পক্ষে। এখানে তিনি তাঁর শিক্ষক বেন্থামের চেয়ে অনেক পিছনে ছিলেন।

সংখ্যালঘুদের অধিকারের জন্য মিল-এর উদ্বেগ ছিল অবশ্যই যথেষ্ট গণতান্ত্রিক। তিনি ঠিকই বলেছিলেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠদের যদি শাসন করার অধিকার থাকে তাহলে সংখ্যালঘুদেরও শুনানির অধিকার থাকবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে সংখ্যালঘুদের স্বর শোনার ও তাদেরকে রক্ষা করার ভাবনার জন্য তাঁর দেয়া প্রস্তাবগুলি ছিল

প্রশংসনীয়। মিল বিশ্বাস করতেন যে, বিচক্ষণ সংখ্যালঘুরা যদি তাঁদের ভোটকে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থায় একত্রিত করতে পারেন, তহলে প্রতিনিধিত্বমূলক সভারও উন্নতি ঘটবে। আলেক্স দ্য তকভিল গণতন্ত্রের অন্যতম চিহ্ন হিসেবে অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, গণতান্ত্রিক সরকার বা সংসদীয় রাজতন্ত্র (ব্রিটেনে) বলতে একটি অর্থই বোঝায়। প্রকৃত অর্থে এটি হল এমন একটি সরকার যেখানে মানুষ কমবেশি অংশগ্রহণ করে। তকভিল-এর মতে, এই ভাবনাটি রাজনৈতিক স্বাধীনতার ভাবনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাঁর গ্রন্থ Democracy in America-তে তকভিল গণতন্ত্রের সমালোচনায় একটি সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। ১৮৩০-এর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিচার করে তিনি এক শতাব্দী আগে মঁতেস্কু যা বলেছিলেন প্রায় সেই মতই সমাজ ও রাষ্ট্রের চরিত্রের মধ্যেকার সম্পর্ককে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তকভিল অবস্থার সমতা বিধানকেই গণতন্ত্র মনে করতেন। তাঁর মতে, সেই সমাজই গণতান্ত্রিক যেখানে সব ব্যক্তিই সামাজিকভাবে সমান এবং যেখানে উঁচু-নিচু ভেদাভেদ বা শ্রেণিবৈষম্য নেই, নেই কোনও বংশগত পার্থক্য ও আরোপ করা হবে না কোনও শর্ত। সব জীবিকা, সব পেশা, সব খেতাব এবং সব সম্মান হবে সবারই আয়ত্তাধীন, কারণ এই সাম্য সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেখা যায় না এবং সামন্ততন্ত্রে গণতন্ত্রের বিকাশ তাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের ফরাসি চিন্তাবিদ্‌রা গণতন্ত্রের ভিত্তির ওপরে জোর দিয়ে গণতন্ত্রকে বিচার করেছিলেন। ফরাসি চিন্তক রেমন্ড আঁরো (Raymond Aron) বলেছিলেন যে গণতন্ত্র গোটা সমাজকে সার্বভৌম গণ্য করে এবং শাসকদের নির্বাচনে সকলের অংশগ্রহণকে মান্যতা দেয়, যা হয়ে দাঁড়ায় একটি গণতান্ত্রিক সমাজের, একটি সমতাভিত্তিক সমাজের যৌক্তিক অভিব্যক্তি।

মিল তকভিল-এর প্রধান ভাবনাগুলি বিচার করে এবারে আমরা গণতান্ত্রিক তত্ত্ব ও প্রয়োগের বিকাশের ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে অবদান ছিল পশ্চিমের যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার, সেগুলির প্রভাবের দিকে দৃষ্টি দেব। তার একটি হল ১৮৪৮-এর ব্যর্থ ইউরোপীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা এবং অপরটি হল ১৮৬১-এর আমেরিকার গৃহযুদ্ধ। জর্জ নোভাক-এর মতে, আয়ারল্যান্ড থেকে অস্ট্রিয়া, অনেক দুর্যোগ বয়ে এনেও ১৮৪৮-এর ব্যর্থ প্রচেষ্টাগুলিও পরবর্তী দশকগুলিতে অনেক গণতান্ত্রিক সংস্কারের বিকাশের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। ১৮৪৮-এর বিপ্লব হাঙ্গেরিতে ভূমিদাসত্বের বিলুপ্তি এবং তার পরে ১৮৬৩ সালে দ্বিতীয়বার জার আলেকজান্ডার-এর রাশিয়াতে দাসদের বন্ধনমুক্তির ঘোষণাকে ত্বরান্বিত করেছিল। ইংল্যান্ডে ভোটাধিকারকে প্রসারিত করা হল এবং সুইজারল্যান্ডে ক্যান্টনগুলি পেল জাতীয় স্বায়ত্তশাসন। অপরদিকে নিঃসন্দেহে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ (গণতান্ত্রিক) বিপ্লব। আমেরিকার গোটা মানুষ গণতন্ত্রের অস্তিত্বকে রক্ষা এবং বাঁচিয়ে রাখতে সামিল হয়েছিলেন গৃহযুদ্ধে। কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ মার্কিনীদের জন্য গণতন্ত্র ও আত্মনিয়ন্ত্রণের বিষয়টি স্বীকৃতি পেয়েছিল বিংশ শতাব্দীতে, যখন কৃষ্ণাঙ্গের মুক্তি আন্দোলন পশ্চিমী গণতন্ত্রে একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করল।

প্রাচীন এথেনীয়দের কাছে গণতন্ত্র ছিল নাগরকিদের স্বশাসনের সমগোত্রীয়। বর্তমানে গণতান্ত্রিক শাসন বলতে বোঝায় বাজার অর্থনীতির ওপরে প্রতিষ্ঠিত, আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ, মানবাধিকার ও প্রতিনিধিত্বমূলক একটি ব্যবস্থা। এটিই আধুনিক বিশ্বের রাজনৈতিক জীবনে প্রাধান্য পায়। এথনীয় ব্যবস্থা ছিল সীমিত পরিসরের। অপরদিকে আধুনিক গণতন্ত্রের ভিত্তি হল সামাজিক সাম্য। জন ডান বলেন, "আমরা এথেনীয় পার্বত্য পথ থেকে অএনক দূরে সরে এসেছি। এথেন্সে সাপ্তাহিক সংসদীয় বৈঠকে সবাই মিলিত হয়ে স্থির করতেন 'পেলিস'-কে কী করতে হবে। আধুনিক গণতন্ত্রে, গুমপিটার-এর মতে, জনগণ যা করে তা হল স্থির করে দেয়া যে অপেক্ষাকৃত বেশি সংগঠিত কোন প্রার্থীরা শাসন করবেন।

১.৬ নমুনা প্রশ্ন

দীর্ঘ প্রশ্নমালা:

১. সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে শাস্ত্রীয় গণতন্ত্রের বিকাশের ধারাটি অনুসন্ধান করুন।

২. ঊনবিংশ শতাব্দীতে শাস্ত্রীয় গণতন্ত্র কীভাবে বিকশিত হয়েছিল সেটি বিশ্লেষণ করুন।

মাঝারি প্রশ্নমালা:

১. অষ্টাদশ শতকে শাস্ত্রীয় গণতন্ত্রের বিকাশটি পর্যালোচনা করুন।

২. গণতন্ত্র প্রসঙ্গে জে.এস. মিল ও তকভিল-এর বক্তব্য বিশ্লেষণ করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নমালা:

১. ইউরোপে এথেনীয় গণতন্ত্রকে শাস্ত্রীয় গণতন্ত্রের উৎস গণ্য করা হয় কেন?

২. ঊনবিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্রের ধারণার বিকাশে তকভিল-এর অবদান সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩. গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য মিল কী কী শর্ত সুপারিশ করেছিলেন?

১.৭ গ্রন্থসূচী

1. John Dunn, Democracy: *The Unfinished Journey*, 508 B.C. to 1993 A.D. Oxford: Oxford University Press, 1993.
2. George Novack : *Democracy and Revolution*. New York : Pathfinder Press, 1971.
3. John Gray: *Liberalism*. Second edtion. Minneapolis : University of Minnesota Press, 1995.

একক ২ ☐ সমকালীন গণতন্ত্র

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য
২.২ ভূমিকা
২.৩ গণতন্ত্রীকরণের তরঙ্গ
২.৪ বিংশ শতাব্দীর গণতন্ত্র প্রসঙ্গে রবার্ট ডাহ্‌ল
২.৫ গণতন্ত্রের বিভিন্ন মডেল
২.৬ নমুনা প্রশ্ন
২.৭ গ্রন্থসূচী

২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে ছাত্রছাত্রীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলির সঙ্গে পরিচিত হবেন:

- ভূমিকাতে সমকালীন গণতন্ত্র বিষয়ে একটি সামগ্রিক পরিচিতি পাওয়া যাবে।
- গণতন্ত্রীকরণের বিভিন্ন তরঙ্গ
- বিংশ শতাব্দীর গণতন্ত্র প্রসঙ্গে রবার্ট ডাহ্‌ল
- গণতন্ত্রের বিভিন্ন মডেল

২.২ ভূমিকা

যদিও বিংশ শতাব্দীকে সাধারণ মানুষের শতাব্দী কিংবা ফ্যাসিবাদ ও শৃংখলায়নের বিরুদ্ধে উদারবাদ ও গণতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়ের শতক হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে, এই শতাব্দীর শুরুটা কিন্তু গণতন্ত্রীদের পক্ষে খুব উৎসাহব্যঞ্জক ছিল না। বরং এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই মানুষ প্রত্যক্ষ করল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন-এর মত আশাবাদীরা ভেবেছিলেন যে এই যুদ্ধ পৃথিবীকে গণতন্ত্রের জন্য সুরক্ষিত করবে। কিন্তু এই যুদ্ধ উদারবাদী গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের ভাবনাকে কোনভাবেই আশ্বস্ত করল না। একদিকে সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক কলাকৌশল ও ফন্দিফিকির ও অপরদিকে গোটা ইউরোপ জুড়ে ফ্যাসিবাদ ও কর্তৃত্বকামী ব্যবস্থার উন্মেষ বিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্রের সম্ভাবনাকে স্তিমিত করে দিয়েছিল। বিশেষত তিরিশের দশকের জার্মানীতে হিটলারের উত্থান উদারবাদ ও গণতন্ত্রের পিছু হটাকে ত্বরান্বিত করেছিল। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ এরিক হব্‌সব্যম তাই বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগকে 'বিপর্যয়ের যুগ' আখ্যা দিয়েছেন—যেটিকে বিশিষ্টায়িত করেছিল উদারবাদের ক্ষয়।

উইলসন-এর ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছিল। পৃথিবীকে গণতন্ত্রের জন্য সুরক্ষিত করার বদলে বিশ্বযুদ্ধ আগামী কুড়ি বছরের মধ্যেই ফিরে এল এবং এবারে আরও এক নির্মম চেহারায়,—যা মানুষের দুঃখকষ্টকে বাড়িয়ে দিল আরও বহুগুণ। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সংযুক্ত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধ, মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের পক্ষে আন্দোলন,—সর্বোপরি উপনিবেশবাদ আবারও একবার গণতন্ত্রের পক্ষে আশার আলো দেখাল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে মানুষের প্রতিভার ও সৃজনশীলতার এক বিপুল প্রস্ফুটন ঘটল। মানুষের জীবনে বিপুল ও অভূতপূর্ব পরিবতর্দন দেখা গেল। এই শতাব্দীর শেষ তিন দশকে সাইবারনেটিক বিপ্লব ও তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ড পরিবর্তনের ধারাকে দ্রুততর করল। আজ আমরা যে তথাকথিত বিশ্বায়নকে দেখতে পাই, সেটি আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল থেকেই বহমান দ্রুত ও মৌলিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর প্রক্রিয়ারই পরিণতি। এই পরিবর্তন ও প্রগতিশীল রূপান্তরগুলি অবশ্যই গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। যেমন, বিংশ শতাব্দীর গোটা দ্বিতীয়ার্ধে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে সাফল্যের সঙ্গে একটি গণতান্ত্রিক সংসদীয় ব্যবস্থা ও তার সঙ্গে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া (যা ছিল উন্নয়নশীল অর্থনীতির অঙ্গ) জারি রইল।

হব্‌সব্যম-এর মত ইতিহাসবিদ অবশ্য বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উঠে আসা গণতন্ত্রগুলিতে সাধারণ মানুষের ভূমিকা নিয়ে এক ধরণের দোলাচলের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, এটা ছিল সেই রকমই এক দোলাচল, যেখানে 'জনগণের সরকার' কিংবা 'জনগণের জন্য সরকার',—এমন ভাবনা প্রতিষ্ঠা পেলেও কার্যত 'জনগণের দ্বারা পরিচালিত সরকার'-এর মত কোনও ভাবনার বাস্তবায়ন ঘটল না। জনগণের প্রতিনিধিরা একবার ক্ষমতার গন্ধ পেলেই সব রকম চেষ্টা চালান কীভাবে প্রতিবার তাঁরা ক্ষমতায় আসতে পারেন। সেই কারণে তাঁরা হয় নির্বাচমকগুলীকে নানা কায়দায় তুষ্ট রাখার চেষ্টা চালান, বিভিন্ন ধরনের প্রতিশ্রুতি দিতে কসুর করেন না, কিংবা নির্বাচনে কারচুপি করার জন্য নানা ধরনের পথ অবলম্বন করেন, যা কিনা নিকৃষ্ট গুণ্ডাবাজিও হতে পারে। সরকার বহু সিদ্ধান্তই নেয় নির্বাচকমণ্ডলী ও প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদকে উপেক্ষা করে। অনেক তথাকথিত 'গণতান্ত্রিক' রাষ্ট্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচনী নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখা হয়। এই ধরনের প্রশাসনিক নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত নির্বাচকমণ্ডলীর ওপর প্রভাব ফেলে,—যখন তাঁরা, অর্থাৎ সাধারণ মানুষ, ক্রমেই বোঝেন যে তাঁরা নিরুপায় ও ক্ষমতাহীন। আর যখন কর্পোরেট পুঁজি বা বড় বড় সম্পদের মালিকরা তথাকথিত জনগণের নেতাদের সঙ্গে প্রশাসনিক স্তরে গাটছড়া বাঁধেন, তখন গণতন্ত্র অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। জর্জ বার্নার্ড-শ যেমন তাঁর Apple Cat নাটকের মুখবন্ধে বলেছিলেন, গণতন্ত্রে টাকাই কথা বলে, টাকাই প্রচার করে, টাকাই সব কিছু কিনে নেয়। তাই গণতন্ত্র হয়ে দাঁড়ায় বিত্ততন্ত্র। এর ফলে গণতন্ত্র সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে ক্রমেই মোহভঙ্গ হয়। হব্‌সব্যম লিখলেন যে, এই শতাব্দীর শেষে নাগরিকদের এক বড় অংশই রাজনীতি থেকে সরে এলেন, এবং যার ফলে রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়টা ক্রমেই ন্যস্ত হতে শুরু করল, সমাজতাত্ত্বিক গেটানো মসকা যাকে বলেছেন, 'রাজনৈতিক শ্রেণের' হাতে। এই এলিট বা রাজনৈতিক শ্রেণি প্রকৃত গণতন্ত্রকে অস্বীকার করে। এলিট শাসন, যার সাধারণ মানুষের কাছে কোন দায়বদ্ধতা নেই, গণতন্ত্রে কোন অবদান রাখতে পারেনা। বিংশ শতকের গণতন্ত্রের প্রকৃত জগতে ধনসম্পত্তি, সবকিছুর বেসরকারীকরণ, আমোদপ্রমোদ ও ভোগবাদের ফলে সাধারণ মানুষের কাছে রাজনীতির আকর্ষণ ও গুরুত্ব কমতে শুরু করল। হারবার্ট মারকিউস যেমন বলেছেন, উন্নত দেশগুলিতেও ভোগবাদ সমাজকে একমাত্রিক করে তুলেছে। আর এই একমাত্রিক সমাজে সাধারণ মানুষের কাছে আত্মসুখই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। অ-রাষ্ট্রীয় বা অ-রাজনৈতক প্রতিষ্ঠানই সাধারণ মানুষের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষত, নির্বাচনী ব্যবস্থা বা রাজনৈতিক দলের তুলনায় প্রচারমাধ্যম হয়ে দাঁড়ায় সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

এর ফলে অবশ্য এমন সিদ্ধান্তে আসাটা ঠিক হবে না যে, এক দিকে এলিটদের কারসাজি ও অপরিদকে ভোগবাদ বিংশ শতাব্দীর গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে দিয়েছে। বিংশ শতাব্দীতেই ইতিহাসে সাধারণ মানুষের আবির্ভাব ঘটল নায়ক হিসেবে, তাঁদের নিজেদের সামগ্রিক অধিকারের জোরে। ক্রমেই বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষই ক্ষমতায় বৈধতা প্রদান করেছে। এমন কি, স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও জনগণের কাছে 'দায়বদ্ধতা'র কথা স্বীকার করে নিতে হয়। ঐস্লামিক মৌলবাদী রাষ্ট্রগুলিতেও জনবিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকেই সংগঠিত করতে হয়। ভয়ংকর নির্মম ও অত্যাচারী শাসককেও সচেতন থাকতে হয় যে তাঁর শাসনের এক ধরনের বৈধতা, এক ধরনের জনসমর্থন, এক ধরনের বশ্যতা তাঁকে জনগণের কাছে আদায় করে নিতে হবে। তবেই নিশ্চিত হতে পারে সেই ব্যবস্থার স্থায়িত্ব

ও সুরক্ষা। ১৯৮৯-৯০ পর্বে পূর্ব ইউরোপের ব্যবস্থাগুলি ভেঙে গিয়ে যে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হল, তা ছিল সাধারণ মানুষের ইচ্ছারই অভিব্যক্তি। উনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রদার্শনিক টি.এইচ. গ্রীন যখন বলেছিলেন যে 'বল নয়, সম্মতিই হল রাষ্ট্রের ভিত্তি', তখন তিনি বিংশ শতাব্দী ও তার পরবর্তী সময়ের গণতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠিটিই চিহ্নিত করেছিলেন।

ইংরেজ লেখক গ্রীন-এরও আগে এককালের ফরাসি অভিজাত পুরুষ আলেক্স দ্য তকভিল, যিনি পরে হয়ে দাঁড়ালেন গণতন্ত্রী, বলেছিলেন যে সব ইতিহাসই অভিজাতন্ত্রের ধ্বংসের ইঙ্গিত দেয় এবং জনগণের জন্য সরকার ও জনগণের দ্বারা পরিচালিত সরকারের ধারণা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে কোনও দীর্ঘমেয়াদী বাধা আর থাকবে না। ইংরেজ গণতন্ত্রী জন স্টুয়ার্ট মিলও লিখেছিলেন, 'বর্তমান পৃথিবীতে সমাজের গণতন্ত্রীকরণের পক্ষে অবশ্যই এক জোরালো ঝোঁক রয়েছে, যার সঙ্গে যুক্ত থাকুক বা না থাকুক রয়েছে জনপ্রিয় নৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি'।

গণতন্ত্রের পূর্বানুমান হল অংশগ্রহণের সমান অধিকার। ফলে জনগণের সরকার ও বর্ধিত নির্বাচকমণ্ডলীর উত্থান বাধ্য করল সামাজিক ক্ষমতা ও সুযোগের পুনর্বন্টনের বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দিতে। কিন্তু গণতন্ত্র কেবলমাত্র মানুষের অন্তর্নিহিত সাম্যের বিষয়টিকেই গুরুত্ব দেয় না, গুরুত্ব দেয় তাঁর সৎ গুণ বা যুক্তিবোধকেও। সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক লে বোঁ-র মতে মানুষ সমবেতভাবে যে আচরণ করে তা হয় আবেগপ্রবণ ও অযৌক্তিক। এই ভাবনাকে মেনে নেয়া যায় না। মসকা, প্যারোটো এবং মিচেলস-এর মত এলিট তাত্ত্বিকরাও প্রচার করেছিলেন যে সব গণতান্ত্রিক দলই আসলে এক ধরনের গণতন্ত্রের ভান করে এবং ক্ষুদ্র এলিটরাই পারে নিয়ন্ত্রণ ও শাসন করতে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় মিচেলস যখন বলেছিলেন যে গণতন্ত্রেও গোষ্ঠিতান্ত্রিক ঝোঁক বিদ্যমান, তখন তাঁর এই বক্তব্যকে গণতন্ত্রের সম্ভাব্য বিকৃতির সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে। কিন্তু মিচেলস যখন ঘোষণা করলেন যে এটাই হল 'গোষ্ঠিতন্ত্রের অমোঘ নিয়ম' এবং বললেন যে গণতন্ত্র হল একটি মতাদর্শগত অলীক ভাবনা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী কোন মানুষই সেটিকে গ্রহণ করেন নি।

বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে নয়া দক্ষিণপন্থার প্রবক্তারা বললেন যে গণতন্ত্রের ব্যর্থতার কারণ হল যে এই ব্যবস্থায় অপ্রয়োজনীয় আলোচনা এবং অপ্রতুল কাজ ছাড়া আর কিছুই হয় না। সমালোচকরা বরাবরই বলে এসেছেন যে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি হল শুধুই গল্প করার জায়গা। তাঁরা বিস্মৃত হলেন যে সংসদ হল তেমনই একটি স্থান যেখানে বিতর্ক ও আলোচনাই প্রাধান্য পায়। আলোচনার মাধ্যমেই 'গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির নিরসন হয়, বিভিন্ন ধরনের স্বার্থের মধ্যে বোঝাপড়া হয়, কার্যকরী হয় বিভিন্ন ধাঁচের সমঝোতা। বিংশ শতাব্দী এই সত্যটিও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করল যে গণতন্ত্র হল দলীয় ব্যবস্থা, দলীয় শাসনকে কার্যকরী করার একটি উপায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইউরোপীয় রাজনীতিতে খ্রিস্টান ডেমোক্রেসি যখন এক ধরনের জনভিত্তি অর্জন করল, পশ্চিম জার্মানী ও ফ্রান্সের নেতারা তখন বললেন যে গণতন্ত্র বলতে বোঝায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে পশ্চিমের দেশগুলিতে পুঁজিবাদের সংকট উন্নয়নের সোভিয়েত মডেল এবং লাগামছাড়া পুঁজিবাদ উভয়ের বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা করল জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ভাবনাকে। ষাটের দশকেই অ-কমিউনিস্ট দেশগুলিতে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণা গুরুত্ব পেতে শুরু করল। ভারতবর্ষের মত সদ্য স্বাধীন দেশগুলিতে নেহরুর নেতৃত্বে জনকল্যাণের প্রতি দায়বদ্ধতার ভাবনা ঘোষণা করা হল। কমিউনিস্ট দেশগুলির সমাজতন্ত্রের ভাবনা থেকে ভিন্ন কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের প্রবক্তরা কার্যত সোস্যাল ডেমোক্রেসির কর্মসূচিকেই মান্যতা দিয়েছিলেন। নেহরু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে একে 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ' আখ্যা দিয়েছিলেন।

পশ্চিমে অবশ্য অর্থনৈতিক নীতি হিসেবে গণতন্ত্রের ভাবনা ছিল সীমিত। ৮০-র দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রোনাল্ড রেগ্যান ও ব্রিটেনে মার্গারেট থ্যাচারের মত রক্ষণশীল নেতারা প্রচার করলেন যে গণতন্ত্রের সাফল্যের একমাত্র শর্ত হল বাজার অর্থনীতি এবং এভাবেই গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের সমঝোতা হতে পারে। রক্ষণশীলরা গণতন্ত্রের জন্য যে

নয়া-উদারবাদী প্রকল্প প্রস্তুত করলেন সেখানে জনকল্যাণের কোনও স্থান রইল না। এই হল নয়া-দক্ষিণপন্থার দর্শন, যা সূচনা করল বাজার অর্থনীতির দিকে ঝোঁকার। নিয়ন্ত্রণহীন অর্থনীতির কথা বললেও নয়া-দক্ষিণপন্থার সমর্থকরা কিন্তু রাষ্ট্রকে দুর্বল করার পক্ষে নন। যেটা দুর্বল হয় সেটা হল জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি। দুর্বল হয় না পুলিশ, মিলিটারি এবং আমলাতন্ত্র, অর্থাৎ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রশাসনিক কাঠামোটি। বরং নয়া-উদারবাদী রাষ্ট্র যথেষ্টই পরাক্রমশালী, যদিও এটি সওয়াল করে 'ন্যূনতম রাষ্ট্রভাবনার'। পশ্চিমের (যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে) নয়া-উদারবাদী রাষ্ট্রগুলি, আমরা সবাই জানি, বর্তমানে রাজনৈতিক ও সামরিক স্তরে অত্যন্ত শক্তিশালী। কিন্তু জনকল্যাণের কর্মসূচি নামমাত্র হওয়ার এই রাষ্ট্রগুলি ন্যূনতম রাষ্ট্রের ভাবনাকেই মান্যতা দেয়। কাঠামো ও প্রতিষ্ঠনের নিরিখে এগুলি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই (যেমন আইনসভা, নির্বাচনী ব্যবস্থা, সর্বজননী ভোটাধিকার ইত্যাদি)। কিন্তু ভাবনার দিক থেকে পশ্চিমের এই নয়া-উদারবাদী গণতন্ত্রগুলি বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা কেইনসীয় কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের আদর্শ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে।

২.৩ গণতন্ত্রীকরণের তরঙ্গ

বিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্রের তত্ত্ব ও প্রয়োগের বিকাশের ভাবনাকে স্যামুয়েল হান্টিংটনের গণতন্ত্রীকরণের তিনটি তরঙ্গের ধারণার নিরিখে অনুধাবন করা যায়। হান্টিংটন-এর ভাবনায় প্রথম দুটি তরঙ্গের মাধ্যমে পশ্চিম ইউরোপে ও উত্তর আমেরিকায় গণতন্ত্রের আগমন ঘটেছিল এবং তৃতীয় তরঙ্গের সূত্রপাত হল সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতনের পরে। প্রথম দুটি তরঙ্গ পশ্চিমে উদারবাদী গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করেছিল। প্রথম তরঙ্গের সূত্রপাত হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে, যা শুরু হয়েছিল ১৮২৮ সালে এবং বহমান ছিল ১৯২০-র দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মত দেশগুলিতে। দ্বিতীয় তরঙ্গটি বহমান ছিল ১৯৪৩ ও ১৯৬২ সালের মধ্যে, যা স্পর্শ করেছিল ইউরোপে জার্মানি ও ইতালিকে এবং এশিয়াতে জাপান ও ভারতবর্ষকে। এই রাষ্ট্রগুলিকে (রবার্ট ডাহ্‌ল যে শব্দটিকে জনপ্রিয় করেছেন) বলা হচ্ছে 'পলিয়ার্কি' বা বহুশাসনপ্রথা, কারণ এই ব্যবস্থাগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বহুদলীয় ব্যবস্থা, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুনিশ্চিত ও সুরক্ষিত পৌর স্বাধীনতা। এই দেশগুলিতে উদারবাদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, যাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল রাষ্ট্রগুলির সাংস্কৃতিক ও মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি, গণতন্ত্রকে বিশিষ্টতা প্রদান করেছিল। অপরদিকে এই রাষ্ট্রগুলি দাবি করে একটি সক্রিয় ও উন্নত পুরসমাজ যা হল এগুলির বৈশিষ্ট্য। তাদের আরও দাবি যে জনগণের প্রতিক্রিয়ার মান এই দেশগুলিতে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য। আবার এদের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের মডেলটিকেই আদর্শ 'বহুত্ববাদী গণতন্ত্র' হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। মার্কিন রাষ্ট্রব্যবস্থায় একাধিক চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এবং তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে কার্যকরীভাবে নিয়ন্ত্রণও করে।

ইউরোপীয় পলিয়ার্কিগুলিতে আরও একধরনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যাদেরকে বলা হয়েছে 'কনসোসিয়্যাশনাল গণতন্ত্র'—যে ধারণাটির উদ্গাতা ছিলেন আরেন্ড লিজপার্ট। তিনি এই ব্যবস্থাটি বলতে বুঝেছিলেন এমনই গণতন্ত্র যেখানে একাধিক রাজনৈতিক দল বা সংগঠন ক্ষমতার ভাগাভাগিতে অংশগ্রহণ করবে। এই ধরনের ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রশ্নে সহমত পোষণের মতই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতার প্রশ্নে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও ভাগাভাগির বিষয়টি। এই ধরনের গণতন্ত্র বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক সেই সব সমাজে যেগুলি ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, আঞ্চলিক, মতাদর্শগত বিষয়ে বিভাজিত। ইউরোপে অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড ও বেলজিয়াম এর নির্দশন।

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও এই দৃষ্টান্ত প্রযোজ্য, বিশেষত ১৯৯০-এর সময় থেকে,—যখন কেন্দ্রে জোট সরকার (রাজ্য স্তরে জোট সরকারের বিষয়টি যদি বাদও দেয়া যায়) গঠন একটি নিয়মিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, যখন একাধিক রাজনৈতিক দল একটি সাধারণ কর্মসূচির ভিত্তিতে ক্ষমতার ভাগাভাগিতে রাজী। একে অবশ্যই এক নতুন ধরনের

কনসোসিয়্যাশনাল গণতন্ত্র বলা যেতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ ও শেষ পর্যায় হান্টিংটন গণতন্ত্রীকরণের তৃতীয় তরঙ্গকে চিহ্নিত করেছিলেন। এর শুরুটা হয়েছিল গ্রীস, পর্তুগাল ও স্পেনে দক্ষিণপন্থী স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার ও লাতিন আমেরিকাতে সামরিক-শাসনের উচ্ছেদের মাধ্যমে। এর সঙ্গে মিলে গিয়েছিল ১৯৮৯ সালে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের ঘটনাটি। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি বেছে নিল পশ্চিম ইউরোপের উদারবাদী গণতান্ত্রিক মডেল। গণতন্ত্রীকরণের এই নব তরঙ্গের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বহুদলীয় নির্বাচন ও অর্থনৈতিক সংস্কার। তবে এই নতুন তরঙ্গের প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট-উত্তর দেশগুলির ক্ষেত্রে অনেক ভাষ্যকার 'আধা-গণতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহার করতে পছন্দ করেন। এ কথা বলা হয়ে থাকে যে উদারবাদী গণতন্ত্রের পক্ষে রায় দিলেও নিকট অতীতের 'প্রবল শৃংখলায়ণের' কারণে গুণগতভাবে উচ্চতর স্তরে গণতন্ত্রীকরণের ভাবনা এই দেশগুলিতে ঠাঁই পাওয়া খুব সহজ হবে না।

বাস্তবে বিভিন্ন গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। এবং যেহেতু কোন ব্যবস্থাই স্থবির নয়, তাই কোন মডেলকেই আদর্শায়িত করা যায় না। উত্তর আমেরিকায় 'উন্নত' গণতন্ত্রের মধ্যেও পার্থক্য আছে, যেমন আছে ইউরোপের একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে অপর রাষ্ট্রের—যার ভিত্তি হতে পারে প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যকারিতার মান অথবা সাধারণ মানুষের/নাগরিকদের অংশগ্রহণের প্রকৃতি। আর কেউ যদি 'সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতা'-র ভাবনাটি খেয়াল রাখেন, তাহলে বুঝতে অসুবিধে হয় না কেন সব গণতন্ত্রকে একটি বর্গের অধীনে আনা যায় না কিংবা গণতন্ত্রীকরণের বিভিন্ন তরঙ্গ থেকে উঠে আসা বিভিন্ন গণতন্ত্রের তুলনা কেন করা যায় না। এই প্রসঙ্গে ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত ফ্রান্সিস ফুকিয়ামার The End of History বইটির সারবস্তুকে স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁর দাবি, বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে অন্য কোনও নতুন মতাদর্শের আর স্থান নেই। বিভিন্ন ভাবধারা ও মতাদর্শে ইতিহাসের অবসানের কথা তিনি ঘোষণা করলেন। তাঁর মতে, পশ্চিমী সমাজে রাজনৈতিক মতাদর্শের নিরিখে বিচার করলে উদারবাদী গণতন্ত্রই সর্বোচ্চ স্তরে আসীন হয়েছে, যাকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের মাপকাঠিতে বিচার করলে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। স্পষ্টতই ফুকিয়ামা গৌরবান্বিত করেছিলেন মার্কিনী ধাঁচের পলিয়ার্কির মডেলটিকে। তাঁর বক্তব্যে মার্কিনী উদারবাদী গণতন্ত্রকেই মানুষের দ্বারা সৃষ্ট চূড়ান্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু আমরা এও লক্ষ করেছি যে কোনও গণৎকারের মত বিশেষ একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে আদর্শায়িত করার ভাবনা শুধু অবৈজ্ঞানিক নয় অস্থায়ীও বটে। এর কারণ হল যে, বিভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে এত বিচিত্র ধরনের পার্থক্য রয়েছে, তাদের উৎসও এতটাই আলাদা যে তাদের মধ্যে তুলনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানের চেষ্টা সম্ভব নয়।

২.৪ বিংশ শতাব্দীর গণতন্ত্র প্রসঙ্গে রবার্ট ডাহ্‌ল

খ্যাতনামা মার্কিন রাষ্ট্রতাত্ত্বিক রবার্ট ডাহ্‌ল তাঁর Democracy and its Critics বইতে লেখেন, 'আধুনিক গণতন্ত্রের ভাবনা ও প্রয়োগ রাজনৈতিক জীবনের দুটি প্রধান রূপান্তরের ফসল। প্রথমটি বিকশিত হয়েছিল প্রাচীন গ্রীসে ও রোমে খ্রিঃপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে... দ্বিতীয়টি, যার উত্তরসূরি আমরা, শুরু হয়েছিল যখন গণতন্ত্রের ভাবনা নগর-রাষ্ট্র থেকে ইতিহাসগতভাবে সরে এল জাতি, দেশ বা জাতি-রাষ্ট্রের আঙ্গিনায়।' ডাহ্‌ল আরও বলেন যে, এই দ্বিতীয় রূপান্তর গতি পেল ঊনবিংশ শতাব্দীতে, যদিও বিংশ শতাব্দীতেই ইউরোপ এবং ইংরেজিভাষী বিশ্বে গণতন্ত্রের ধারণা পেল আন্তর্জাতিক মান্যতা, শুধুমাত্র রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে নয়, একটি বাসনা ও মতাদর্শ হিসেবেও এটি প্রতিষ্ঠা পেল।

ডাহ্‌ল-এর মতে, নগর-রাষ্ট্র থেকে জাতি-রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের এই বিকাশের ফল হয়েছিল আট রকম। সেগুলি হল:

(১) প্রতিনিধিত্ব : গ্রীক গণতন্ত্রের তথাকথিত নাগরিকদের সভার ভাবনাকে স্থানচ্যুত করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জনপ্রতিনিধির ভাবনা ('তথাকথিত' এই কারণে যে, এথেন্স-এর মত নগররাষ্ট্রে, যার ভিত্তি ছিল দাসতন্ত্র, নাগরিকরা

ছিলেন বড় জোর নগরের মানুষের এক তৃতীয়াংশ মাত্র)। তাছাড়া গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বের ধারণাকে বুঝতে হবে একটি ঐতিহাসিক বিষয় হিসেবে এবং বড় মাপের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সমতার যুক্তি প্রয়োগের নিরিখে।

(২) সীমাহীন ব্যাপ্তি : উচ্চতম কোনও সীমা তত্ত্বগতভাবে বেঁধে দেয়া সম্ভব নয়। জুডিয়ার মত একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে, যার জনসংখ্যা একশ কোটির বেশি, গণতন্ত্রের আকৃতি বেঁধে দেয়া সমস্যার সৃষ্টি করে।

(৩) অংশগ্রহণকারী গণতন্ত্রের সীমারেখা : গণতান্ত্রিক এককটির আকৃতি বড় হলে সেখানে রাজনৈতিক অংশগহণের সুযোগ হয় সীমিত।

(৪) ভিন্নতা : একক বড় হলে রাজনৈতিক জীবনে মানুষের মধ্যে নানা ধরনের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। আঞ্চলিক আনুগত্য, নৃকুলগত/জাতিগত অস্তিত্ব, বিভিন্ন ধরনের জীবনশৈলী তার নির্দশন। নগর-রাষ্ট্রে নাগরিকরা ছিল আপেক্ষিকভাবে সমশ্রেণির। কিন্তু আধুনিক কালের বৃহৎ গণতন্ত্রে মানুষের মধ্যে ধর্মগত, রাজনৈতিক বিশ্বাসগত, ভাষাগত, ইতিহাসগত, অতিকথাগত বিভিন্নতা চোখে পড়ে।

(৫) বিরোধ : ভিন্নতা থেকে জন্ম নেয় রাজনৈতিক বিভেদ ও বিরোধ। তবে যেহেতু আধুনিক বৃহৎ গণতন্ত্রে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তার অনেকটাই বড় সেই কারণে রাজনৈতিক বিজ্ঞান ও বিরোধ থেকে আবশ্যিকভাবে তীব্র সামাজিক সংঘাতের জন্ম হয় না।

(৬) পলিয়ার্কি : ডাহ্‌ল এই শব্দটি ব্যবহার করেন পাশ্চাত্যে এবং ভারতবর্ষের মত বড় প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রকে চিহ্নিত করতে। পলিয়ার্কি বলতে বোঝায় এমনই একটি রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা যেখানে সরকারের সর্বোচ্চ পদাধিকারীরা বিভিন্ন প্রার্থী দল ও গোষ্ঠীর সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্বাচনে জিতে আসার লক্ষ্যে প্রণোদিত হন।

(৭) সামাজিক ও রাজনৈতি বহুত্ববাদ : এই পলিয়ার্কিতে অবস্থান করে একাধিক সামাজিক গোষ্ঠী ও সংগঠন, যারা নিজেদের আন্তঃসম্পর্কেও সরকারের সঙ্গে সম্পর্কেও স্বাধীন।

(৮) ব্যক্তির অধিকারের প্রসারণ : পলিয়ার্কিতে ব্যক্তির অধিকারের এক বিপুল ব্যাপ্তি ঘটে। ব্যক্তির অধিকারের সংখ্যা এবং প্রকার, যেগুলি আইনসিদ্ধ এবং কার্যকরী, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রসারিত হয়েছে। সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিই এখন এক গুচ্ছ মৌলিক রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করেন। এবং 'ন্যায়সঙ্গত বিচারের অধিকার'-এর মত ব্যক্তিগত অধিকার এখন রাষ্ট্রের সব মানুষই ভোগ করেন। ডাহ্‌ল মনে করেন যে আধুনিক গণতন্ত্রের আয়তনের ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সমাজের ভূমিকার তুলনায় প্রাধান্য পায় তার বিকল্প হিসেবে অধিকার সম্পর্কে সচেতনতার ভাবনা। তিনি আরও বলেন যে পলিয়ার্কিতে নাগরিকদের অন্তর্ভুক্তি ঘটে সরকারের সর্বোচ্চ আধিকারিকদের বিরোধিতা ও নির্বাচিত করার সুযোগ।

যে প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে একটি সরকারের গণতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা যায় যেগুলি হল: (ক) নির্বাচিত আধিকারিক; (খ) স্বাধীন ও সুষ্ঠু নির্বাচন; (গ) অন্তর্ভুক্তির ওপরে ভিত্তি করে নির্বাচন; (ঘ) দপ্তরে নির্বাচিত হবার অধিকার; (ঙ) বাক্-স্বাধীনতা; (চ) বিকল্প তথ্য; (ছ) সংস্থাগত স্বাতন্ত্র্য।

২.৫ গণতন্ত্রের বিভিন্ন মডেল

বিংশ শতকের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং রাষ্ট্রদার্শনিকরা গণতন্ত্রের বিভিন্ন মডেলের আলোচনা করেছেন। আমরা এই প্রসঙ্গে দেখেছি রবার্ট ডাহ্‌ল বহুত্ববাদী গণতন্ত্রেরও পলিয়ার্কির একটি মডেল পেশ করেছেন। মার্কসীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা জনগণের গণতন্ত্র বিষয়ক একটি মডেল পেশ করেন। ডেভিড হেল্ড উদারবাদী গণতন্ত্রের কয়েকটি মডেলের পর্যালোচনা করেছেন, যেমন, সংরক্ষণমূলক গণতন্ত্র, বিকাশশীল গণতন্ত্র এবং অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র।

প্রাচীন গ্রীসে এক ধরনের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ব্যবস্থা ছিল। অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও প্রাচীন গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রে মডেলটিকে

গণতন্ত্রের এক সনাতনী মডেল হিসেবেই দেখা হয়। যদিও জে. জে. রুশোর মত চিন্তাবিদ্‌কে নগর-রাষ্ট্রের এই মডেল যথেষ্টই প্রভাবিত করেছিল এবং সুইজারল্যান্ডের মত দেশে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের কিছু ব্যবস্থা এখনও বর্তমান, আজকের যুগে বৃহৎ গণতন্ত্রে 'পোলিস' জাতীয় নগর-রাষ্ট্রের মডেলের আর কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই বললেই চলে। তাছাড়া এই সনাতনী মডেলটির ভিত্তি ছিল চূড়ান্ত বৈষম্য ও বঞ্চনা। নাগরিক অধিকার মেটিকদের (যাঁরা নগর-রাষ্ট্রের বাইরে বাস করতেন) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। মহিলাদের ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের কোনও ব্যবস্থা ছিল না, কারণ তাঁরা গৃহস্থালীর কাজেই আটকে থাকতেন। আর ছিল বিপুল দাস-শ্রমিকরা, যাদের কাজ ছিল নাগরিকদের অবাধ বিনোদনের ব্যবস্থা করা (অর্থাৎ, যাঁরা গোটা জনসংখ্যার বিচারে সংখ্যালঘু), যাতে তাঁরা তথাকথিত 'প্রত্যক্ষ' গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

সংরক্ষণমূলক মডেল : এই মডেলটির উত্থান হয়েছিল সেই সময়ে যখন সরকারকে দেখা হত এমন একটি ক্ষমতার আধার হিসেবে যখন তার পক্ষে ব্যক্তির জীবনে যে কোন ধরনের হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হত। সেই অর্থে, এই মডেলটি ছিল বিংশ শতাব্দীর কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের বিপরীতধর্মী। সপ্তদশ শতাব্দীতে জন লক থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীর জেরেমি বেন্থাম পর্যন্ত বিভিন্ন ইংরেজ দার্শনিক এই মডেলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই মডেলটির মূল কথা হল গণতন্ত্রকে স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ভাবনার ওপরে দাঁড় করিয়ে প্রতিষ্ঠা করা। আদি উদারবাদের মূল ভাবনাই ছিল পরাক্রমশালী সরকারের চরম ক্ষমতার হাত থেকে কীভাবে ব্যক্তিকে রক্ষা করা যায় তা দেখা। লক-এর 'সম্মতি ভিত্তিতে সরকার'-এর ভাবনা এই রক্ষণশীল গণতন্ত্রের মডেলকেই প্রশ্রয় দেয়। জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকারকে রক্ষা করার জন্য লক তাদেরকে স্বাভাবিক অধিকার হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। সরকারের অবশ্যই কর চাপাবার কোনও অধিকার থাকবে না। লক সেই কারণে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে নাগরিকদের স্বাভাবিক অধিকার থাকবে সাংসদের নির্বাচন করার,যাতে তাদের সম্পত্তি জোর করে বাজেয়াপ্ত করা না যায়।

জেরেমি বেন্থাম, যিনি ঐতিহাসিক কারণেই গণতন্ত্রের প্রবক্তা হিসেবে ছিলেন লক-এর তুলনায় শ্রেষ্ঠতর, এবং তাঁর বন্ধু জেমস মিল 'রক্ষণশীল গণতন্ত্রকে' উপযোগিতাবাদের যুক্তি দিয়ে সমর্থন করেছিলেন। বেন্থামের 'সর্বাধিক মানুষের জন্য সর্বাধিক মঙ্গল (সুখ)'-এর ধারণার বাস্তবায়নের উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থাকে, যেখানে এমন কোনও পদক্ষেপ নেয়া হবে না যার ফলে নাগরিকদের আনন্দ (সুখ) হ্রাস পাবে কিংবা তাঁদের দুঃখ কষ্ট বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ, নাগরিকদের সুখ বৃদ্ধি করাটাই এই মডেলের উদ্দেশ্য। রক্ষণশীল গণতন্ত্রের এই মডেলটি তাই এক ধরনের সাংবিধানিক বা সীমিত গণতন্ত্রের পক্ষে শুধু নয়, এই মডেলটি সওয়াল করে এক ধরনের নেতিবাচক গণতন্ত্রের পক্ষেও। শেষ পর্যন্ত রক্ষণশীল গণতন্ত্র পর্যবসিত হয় এক ধরনের মুক্ত বাণিজ্যের রাজনৈতিক ব্যবস্থায়। আধুনিক কালের নয়া-উদারবাদী এবং নয়া দক্ষিণপন্থীরা এই মডেলটিকে তাই মান্যতা দেন।

বিকাশশীল মডেল : ব্যক্তির বিকাশের প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে এক দিকে রুশো (বেন্থামের সমসাময়িক) ও অপরদিকে জন স্টুয়ার্ট মিল (বেন্থামের ছাত্র) একটি বিকল্প মডেল পেশ করেছিলেন। রুশোর কাছে মূল বিষয়টি ছিল স্বাধীনতা এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মানুষ তখনই প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হবে যখন সরকারের কাজে প্রত্যক্ষভাবে ও নিয়মিতভাবে সে অংশ নিতে পারবে। অন্যভাবে বললে, তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে, সাধারণ ইচ্ছার সার্বভৌম কর্তৃত্বের অনুশাসনেই ব্যক্তি প্রকৃত স্বাধীনতার অর্থ খুঁজে পায়। সাধারণ ইচ্ছাকে বলা হয়েছে 'সার্বিক মঙ্গল', যেটি বলতে এক অর্থে বোঝায় সমাজের 'প্রকৃত ইচ্ছার' সমষ্টিগত সমাহার থেকে উৎসারিত শক্তিকে। ব্যক্তির এই 'প্রকৃত ইচ্ছা' হল ব্যক্তিসত্তার উচ্চতর প্রকাশ, যেটি ব্যক্তিসত্তার নিম্নতর প্রকাশ, অর্থাৎ 'বাস্তব ইচ্ছা' বা সংকীর্ণ ইচ্ছা থেকে ভিন্ন। এটা ধরে নেয়া হয় যে সাধারণ ইচ্ছা (ব্যক্তির উচ্চতর সত্তা)-কে মান্যতা দিয়ে গণতন্ত্রের একটি র‍্যাডিকাল বিকাশ ঘটা সম্ভব।

জেমস মিল-এর পুত্র, জে. এস. মিল বিকাশশীল গণতন্ত্রের অপর একটি মডেল খাড়া করেছিলেন। তাঁর কাছে অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গণতন্ত্রই ছিল আদর্শ ও সর্বোত্তম সরকার। এবং তাঁর বিচারে ব্যক্তির সম্ভাবনার যথাযথ

বিকাশের জন্য গণতন্ত্রই কাম্য। রুশোর মত মিল-ও মানুষের অংশগ্রহণের সর্বাধিক প্রসারণ চেয়েছিলেন (যদিও নিরক্ষর নারী-পুরুষদের তিনি বর্জন করেছিলেন)। কিন্তু রুশোর মত তিনি কোনও সার্বিক মঙ্গলের কথা বলেন নি। বরং তিনি মান অনুযায়ী ভোটের পক্ষে ছিলেন, যেখানে ব্যক্তির পারদর্শিতা/গুণাগুণ বিচার্য বিষয় হবে। তিনি তাই সংখ্যালঘুর অধিকারে পক্ষে ছিলেন এবং সতর্ক থাকতে বলেছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে (অর্থাৎ, মাঝারি মাপের মানুষদের স্বৈরতন্ত্র)। মিল ছিলেন এলিটপন্থী এবং সেই কারণে তাঁর বিকাশশীল মডেলে ছিল প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ঝোঁক। তিনি ছিলেন সেই ধরনের গণতন্ত্রের বিপক্ষে, যা উৎসাহ দেয় মধ্যমেধা, একরৈখিকতা ও অনুগামিতার ভাবনাকে।

অংশগ্রণকারী মডেল : প্রাচীন গ্রীক নগর-রাষ্টগুলি ছিল অংশগ্রহণকারী মডেলের একটি দৃষ্টান্ত। কিন্তু যে কথা আগেই বলা হয়েছে, প্রাচীন গ্রীক নগর-রাষ্ট্রে (পোলিস) মেটিক (বহিরাগত), মহিলা ও দাসদের অংশগ্রহণ ছিল ব্রাত্য। সমতার ভাবনার দ্বারা পরিচালিত বড় আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী রাজনীতির বিভিন্ন প্রকার দেখা যায়। যেমন, জনভোটতান্ত্রিক গণতন্ত্র। এটি হল এক ধরনের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র যেখানে শাসক ও শাসিতদের মধ্যে কোন মাধ্যম ছাড়াই সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এখানে সাধারণ মানুষ সরাসরি তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে গণভোট ছাড়া অপর যে পদ্ধতিটি অনুসৃত হয়, সেটি হল গণভোট। অংশগ্রহণকারী গণতন্ত্রের অপর প্রকারটি হল বহুত্ববাদী গণতন্ত্র, যেটি বর্তমানে অনেক গণতন্ত্রেরই বৈশিষ্ট্য। এটি পরিচালিত হয় বিভিন্ন চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর (স্বার্থগোষ্ঠীর) কার্যকলাপের মাধ্যমে, যার মাধ্যমে মানুষের দাবিদাওয়াগুলি মূর্ত হয়ে ওঠে। সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদের অনেক কিছুকেই সংশোধন করে বহুত্ববাদী গণতন্ত্র। বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর ক্রমাগত সংগঠিত চাপের ফলে (যার মাধ্যমে জনমতের নানা ধরনের প্রতিফলন ঘটে) সরকারও বাধ্য হয় প্রতিক্রিয়া জানাতে। তবে বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের যথার্থ অনুশীলনের জন্য কিছু পূর্ব শর্ত প্রয়োজন, যেমন, প্রতিযোগী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ক্ষমতার বিভাজন, বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতৃবর্গের তাঁদের সদস্যদের কাছে দায়বদ্ধতা, সরকারি প্রশাসনের নাগাল পাওয়া ইত্যাদি।

গণতন্ত্রের মার্কসীয় মডেল : বিংশ শতাব্দীর গণতন্ত্রের ভাবনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হল মার্কসীয় ভাষ্যটি। এই মডেলটি যেটি 'জনগণের গণতন্ত্র', 'সর্বহারার গণতন্ত্র' বা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র' নামে পরিচিত, রাশিয়া ও চীনে লেনিনীয় ও মাওবাদী আদলে গড়ে উঠেছিল। এই মডেলটির প্রধান উদ্দেশ্য হল শোষিত ও নিপীড়িত মানুষদের অবস্থার উন্নতি ঘটানো। সমাজবিপ্লবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে অন্বিত জনগণতন্ত্রের এই মডেলটি অন্য সব মডেলকে নিছক আনুষ্ঠানিক কিছু ব্যবস্থা, যেখানে গণতন্ত্রের মূল ভাবনাটাই অনুপস্থিত, হিসেবে গণ্য করে। এই মডেলটি মনে করে যে, গণতন্ত্রের মূল কথাটি হল শোষিত মানুষদের উন্নয়ন। একথা অনস্বীকার্য যে, পুঁজিবাদী সমাজ ও অর্থনীতি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছিল, যা সম্ভবপর হয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক/ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোগুলির ধ্বংসসাধনের মাধ্যমে। কিন্তু পুঁজিবাদ শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্রের সুফলগুলিকে সীমাবদ্ধ রাখে একটি ভাগ্যবান সংখ্যালঘুদের মধ্যে। প্রকৃত গণতন্ত্র সম্ভবপর একমাত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে। একজন মার্কসবাদীর কাছে একটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাই পুরোদস্তুর গণতন্ত্রীকরণের সুযোগ করে দেয় এবং সেই কারণে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রই হল প্রকৃত গণতন্ত্র। সমাজবিপ্লবের (সমাজতান্ত্রিক) গোটা প্রক্রিয়াটাই গণতান্ত্রিক হওয়ার সুবাদে এই বিপ্লবে সামিল হন হাজারে হাজারে পুরুষ ও নারী। ১৯৩০-এর দশকে চীনে 'লং মার্চ' ছিল জনগণের অংশগ্রহণের এমনই এক দৃষ্টান্ত। মার্কসবাদীরা দাবি করেন যে, ১৯১৭ সালের রাশিয়াতে এবং ১৯৪৯ সালের চীনে বিপ্লবী আন্দোলন জনগণের ক্ষমতাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিল।

মার্কসবাদীদের মতে, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে (পূর্বে ও পশ্চিমে) গণতন্ত্র হল বুর্জোয়া গণতন্ত্র যেখানে জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্রের সুযোগ সুবিধাগুলির বাইরেই থেকে যায়। সেই কারণে প্রয়োজন দেখা দেয় ধনতান্ত্রিক কাঠামোগুলিকে উৎখাত করে প্রকৃত গণতন্ত্র বা জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। রাশিয়াতে প্রথম সমাজতান্ত্রিক

বিপ্লব অনুষ্ঠিত হবার পরে ভি.আই. লেনিন আওয়াজ তুলেছিলেন, 'সব ক্ষমতা সোভিয়েতের হাতে দিতে হবে'। সোভিয়েত/ কাউন্সিল বলতে বোঝায় তৃণমূল স্তরে শ্রমজীবী মানুষদের নির্বাচনের দ্বারা গঠিত সংস্থা। বিপ্লবোত্তর রাশিয়াতে এরকম অসংখ্য কাউন্সিল বা সোভিয়ত গড়ে উঠেছিল, শ্রমিক সেনা, কৃষকদেরকে নিয়ে—যার ফলে সৃষ্ট হয়েছিল এক ধরনের 'কমিউন গণতন্ত্র'। সংক্ষেপে বলতে গেলে মার্কসবাদীরা তৃণমূল গণতন্ত্র নিয়ে এক ধরনের পরীক্ষা করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত উভয় দেশেই কমিউন গণতন্ত্র বা জনগণতন্ত্র প্রবল কেন্দ্রীভূত কমিউনিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণ ও ফন্দিফিকিরের কারণে বিকৃত রূপ ধারণ করেছিল। শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থরক্ষার নামে কমিউনিস্ট পার্টি জনগণের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল পার্টির মাতব্বর ও 'আমলাদের' অনুশাসন। সোভিয়েত রাশিয়াতে (১৯৩০ সাল থেকে ১৯৫৩ সালে স্তালিনের মৃত্যুর সময় পর্যন্ত) স্তালিনের সর্বোচ্চ নেতৃত্বে চূড়ান্ত রকমের আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ চালু হয়েছিল। চীনেও গণ কমিউনের ভাবনা মাও সে দং-এর মৃত্যুর পরে বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। জনগণতন্ত্রের ধারণা অচিরেই বাজার অর্থনীতি ও পার্টি নিয়ন্ত্রণের ভাবনার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হল।

২.৬ নমুনা প্রশ্ন

দীর্ঘ-প্রশ্নমালা:

১. 'গণতন্ত্রীকরণের তিনটি তরঙ্গ' বিষয়ে একটি টীকা লিখুন।

২. ডেভিড হেল্ড-কে অনুসরণ করে গণতন্ত্রের মডেলগুলি পর্যালোচনা করুন।

মাঝারি প্রশ্নমালা :

১. বিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্রের বিকাশ কীভাবে ঘটেছিল তার একটি রূপরেখা দিন।

২. গণতন্ত্র প্রসঙ্গে রবার্ট ডাহ্‌ল-এর ধারণা প্রসঙ্গে একটি টীকা লিখুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নমালা :

১. 'গণতন্ত্রীকরণের তৃতীয় তরঙ্গ' বলতে কী বোঝায়?

২. রবার্ট ডাহ্‌ল-এর মতে, পলিয়ার্কি বলতে কী বোঝায়?

৩. ডেভিড হেল্ড-এর মতে, গণতন্ত্রের 'উন্নয়নশীল মডেল' বলতে কী বোঝায়?

২.৭ গ্রন্থসূচী

1. David Held: *Models of Democracy*. Third editon. Stanford: Stanford University Press, 2006.
2. Robert Dahl : *Democracy and its Critics*. Yale : Yale Universitry Press, 1991.
3. J. W. Femia : *Marxism and Democracy*. Oxford : Clarendon Press, 1993.
4. John Dunn, *Democracy : The Unfinished Journey. 508 B.C. to 1993 A.D.* Oxford: Oxford University Press, 1993.

একক ৩ ☐ জাতীয়তাবাদ

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য
৩.২ ভূমিকা
৩.৩ উৎস ও অর্থ
৩.৪ জাতীয়তাবাদের বিভিন্ন প্রকার ও উপাদান
৩.৫ জাতীয়তাবাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ
৩.৬ নমুনা প্রশ্ন
৩.৭ গ্রন্থসূচী

৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে ছাত্রছাত্রীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলির সঙ্গে পরিচিত হবেন:

- ভূমিকাতে জাতীয়তাবাদ বিষয়ে একটি সামগ্রিক পরিচিতি পাওয়া যাবে।
- জাতীয়তাবাদের উৎস ও অর্থ্য
- জাতীয়তাবাদের বিভিন্ন প্রকার ও উপাদান
- জাতীয়তাবাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ

৩.২ ভূমিকা

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শব্দভাণ্ডারে জাতীয়তাবাদ হল একটি অন্যতম বিতর্কিত শব্দ। এখনও পর্যন্ত ভাষ্যকারদের মধ্যে এই বিষয়ে কোনও সহমত তৈরি হয়নি। জাতীয়তাবাদের কিছু প্রবক্তা এর একটি নরম ভাষ্য প্রদান করেন যার সুবাদে তাঁরা জাতীয়তাবাদ বলতে বোঝেন এক ধরনের অস্মিতার চেতনা, অহংবোধ, একটি দেশের মানুষের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি, যাকে ধরে রাখে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সীমারেখা। একে বলা যায় অন্তর্ভুক্তির মডেল। আবার জাতীয়তাবাদের এমন প্রবক্তারাও আছেন যাঁরা একে দেশপ্রেমের সঙ্গে একাত্ম করে দেখেন,—যা হল জাতীয়বাদের উগ্র ভাষ্য। একে বলা যায় জাতীয়তাবাদের একাত্মতার মডেল, যার সুবাদে জাতীয়তাবাদের ধারণার সঙ্গে জড়িয়ে যায় উগ্র ও আগ্রাসী মনোভাব, যা প্রভাবিত করে আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ককে।

এ্যান্ড্রিউ ভিনসন্টে-এর দেয়া সূত্র থেকে ধার করে বলা যায় জাতীয়তাবাদের দুটি ভাষ্য দেয়া যেতে পারে, যথা মুখ্য ও গৌণ। মুখ্য ভাষ্যে জাতীয়তাবাদ এক ধরনের জাতীয় আত্মচেতনার, যা হতে পারে নৃকুলজাত ও ভাষাগত, সমার্থক এবং যা প্রকাশিত হয় রাজনৈতিক ভাষার মাধ্যমে। এর উৎস খোঁজা হয় স্বীকৃত কোনও অতীতে, ইতিহাসে, সংস্কৃতি ও ভাষার মধ্যে—যা আনুগত্য ও ভালবাসার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। গৌণ ভাষ্যে জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেম নৃকুলতা ও জাতিকুলকর্তৃত্ববাদের সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়, যার ফলে সংকীর্ণতা ও স্থানিকতা প্রশ্রয় পায়। দেশপ্রেম সেখানে আনুগত্য, গর্ব ও স্বদেশের প্রতি ভালবাসার ভাবনাকে উৎসাহ দেয়, নৃকুলতা জৈবিক বা বংশগত মানদণ্ডে জ্ঞাতিত্বের ভাবনাকে উসকে দেয়। এ্যান্টনি স্মিথ-এর মত পণ্ডিতেরা মনে করেন যে জাতীয়াতবাদের মূল কথাটি হল নৃকুলতা, অর্থাৎ, জাতীয়তাবাদ জোর দেয় নৃকুলজাত প্রতীকী এক ধারণাকে। বিংশ শতাব্দীর ইউরোপে নাৎসীবাদের কুপ্রভাবে জাতীয়তাবাদ যুক্ত হয়ে গিয়েছিল জাতিকুলকর্তৃত্ববাদের সঙ্গে, যদিও অনেক ভাষ্যকারের মতে এই দুটি ভাবনার মধ্যে কোন অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করাটা ঠিক নয়।

জাতীয়তাবাদের যে কোন ছাত্রকেই অবশ্য একাধিক ধাঁধার সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমত, রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে জাতীয়তাবাদের উত্থান ও জাতীয়বাদের উৎস খুঁজতে গিয়ে এক ধরনের প্রাক্-আধুনিক, কাল্পনিক অতীতের আশ্রয় খোঁজার মধ্যে বিস্তর সমস্যা আছে। জাতীয়বাদের ভাবনা আধুনিক ইউরোপের ভাবনায় প্রবেশ করেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে, অর্থাৎ সাম্প্রতিক অতীতে, গণতন্ত্র, শিল্পায়ন ও জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণাকে আশ্রয় করে। দ্বিতীয়ত, জাতীয়তাবাদের অত্যন্ত শক্তিশালী দাবি ও আবেদনের ও তার উৎসকে ঘিরে যে দার্শনিক ও তাত্ত্বিক অস্পষ্টতা রয়েছে—এই দুই-এর মধ্যে একটা অসঙ্গতি রয়েছে। তৃতীয়ত, জাতীয়তাবাদ মতাদর্শ হিসেবে যে সব বিষয়ের দাবিদার, তার মধ্যেও একটা ধোঁয়াশা রয়েছে, কারণ জাতীয়তাবাদ নিজেই বহুলাংশে অন্য অনেক মতাদর্শ থেকে বিভিন্ন উপাদান আহরণ করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে,—যেমন, উদারবাদ, ফ্যাসিবাদ, রক্ষণশীলতাবাদ, এমনকী সমাজতন্ত্রও। ফলে জাতীয়তাবাদ হয়ে দাঁড়ায় এক ধরনের মতাদর্শগত মিশেল, সেখানে বিভিন্ন ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি একে অপরের পথে এসে দাঁড়ায়। তাই জাতীয়তবাদ এক না বহু,—এই প্রশ্ন থেকে যায়।

৩.৩ উৎস এবং অর্থ

জাতীয়তবাদের উৎস একাধিক এবং এই প্রশ্নে ভাষ্যকারদের মধ্যে নানা মত আছে। প্রথমত, জাতীয়তাবাদের উৎস খোঁজা হয় প্রাক্-আধুনিক অতীতের এক ধরনের জাতি ভাবনায়, যার মূল ভিত্তি নৃকুলতা। এ্যান্টনি স্মিথ-এর মত পণ্ডিতদের মতে, যাঁরা এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন, তাঁদের চোখে নৃকুলতাই হল জাতীয়তাবাদের ভিত্তি এবং আধুনিক কালের জাতি হল এই নৃকুলতার ভাবনার সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলিরই সম্প্রসারিত রূপ। দ্বিতীয়ত, হানস কোহ্ন এবং মূলত তাঁর ভাবনার কাছাকাছি আর্নস্ট গেলনার ও বেনেডিক্ট অ্যাডারসন মনে করেন যে জাতীয়তাবাদ হল আধুনিকতার সঙ্গে জড়িত একটি ধারণা, যেটির উদ্ভব হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীতে এবং যার প্রসার ঘটেছিল ফরাসি বিপ্লবের পরবর্তী পর্যায়ে। তৃতীয়ত, হব্সব্যমের মতো ইতিহাসবিদ্ জাতীয়তাবাদকে মনে করেন আধুনিক একটি ধারণা এবং তার উৎস খোঁজেন ১৮৩০ সালে, যার খণ্ডিত রূপের ধারণা পাওয়া যায় আমেরিকান ও ফরাসি বিপ্লবে। গেলনারও এই মতের অনুসারী। এই সূত্র ধরে বলা যায় যে ফিক্টে, ভন হুমবোল্ট, অ্যাডাম মূলার প্রমুখেরা জাতি বলতে একটি সংহত, সাংস্কৃতিক মণ্ডলীকে বোঝেন, যেটি তার ভবিষ্যৎ খুঁজে পায় একটি সংগঠিত, স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের মাধ্যমে। এর ফলাফল দ্বিবিধ। এক : মানুষ তাঁর নৈতিকতাকে খুঁজে পায় জাতি-রাষ্ট্রে অংশগ্রহণের মধ্যে—যেমনটি হেগেল বলেছিলেন। দুই : রাষ্ট্র তার ভবিষ্যতের স্বার্থে অপর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গতভাবেই বলপ্রয়োগ করতে পারে।

হব্সব্যম ও মিয়োল্লাভ হর্রোখ জাতীয়তাবাদকে বিশ্লেষণ করেছেন তার নির্দিষ্ট বিকাশের নিরিখে,—কোনও একক অর্থ হিসেবে নয়। হর্রোখ-এর মতে, প্রথমত জাতীয়তাবাদ নিহিত রয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর লোকগাথা, লোকাচার, সামাজিক নানা প্রথার মধ্যে। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জাতীয়তাবাদ রাজনৈতিক প্রচারের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। তৃতীয়ত, জনসমর্থন নিয়ে জাতীয়তাবাদ রূপান্তরিত হয় গণআন্দোলনে। হব্সব্যম জাতীয়তাবাদের তিনটি পর্যায়কে চিহ্নিত করেছিলেন— এক : ১৮৩০-৮০ ছিল উদারবাদী মানবতাবাদের পর্ব। দুই : ১৮৮০-১৯১৪ ছিল রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদী ভাবনার পর্ব। তিন : ১৯১৮-৫০ পর্বে জাতীয়তবাদ তার চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল।

৩.৪ জাতীয়তাবাদের প্রকার ও উপাদান

জাতীয়তবাদের বিভিন্ন প্রকারের অভিব্যক্তি হল এর বিভিন্ন রূপ। মোটামুটি জাতীয়তাবাদের প্রধান রূপগুলি হল : উদারবাদী, রক্ষণশীল, রোম্যান্টিক, অখণ্ড, ধর্মীয় ও উপনিবেশবাদ-বিরোধী।

উদারবাদী জাতীয়তাবাদ: আলোকায়নের দর্শনের ওপরে ভিত্তি করে উদারবাদী জাতীয়তাবাদ, যেটি যুক্ত ভইসেপ্পে মাৎসিনি (১৮০৫-৭২)-র ভাবনার সঙ্গে, ঘোষণা করে যে প্রতিটি জাতি হবে স্বাধীন, কিন্তু তার সরকারটি হবে সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক। এটির অর্থ জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের ভাবনাকে স্বীকৃতি দেয়া। কিন্তু দুটি সমস্যা থেকে যায়। এক: রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বলেছিলেন যে প্রতিটি জনমণ্ডলী যদি এই অধিকার প্রয়োগ করতে চায়, তাহলে প্রকৃত জাতীয়তাবাদর সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাকামী, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে এমন জাতীয়তাবাদের মধ্যে পার্থক্যটি কীভাবে করা হবে? দুই একটি কৌশলী তাত্ত্বিক প্রশ্নও উঠে আসে। উদারবাদ ও জাতীয়তাবাদ হল পরস্পরবিরোধী ভাবনা, কারণ উদারবাদ যেখানে যুক্তিসঙ্গতভাবেই বিশ্বজনীনতা ও বিশ্বনাগরিকতার ভাবনাকে প্রশ্রয় দেয়, জাতীয়তাবাদ তার বিরোধিতা করে।

রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদ : ফরাসি বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এর প্রতিষ্ঠা। এটি ছিল ফরাসি বিপ্লবের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, অধিকার ও তাঁর অস্তিত্বের জানান দেবার ভাবনার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা এডমান্ড বার্ক ও জোসেফ দ্য মইসত্রে জাতিকে দেখেছিলেন একটি ক্রমোচ্চ ব্যবস্থা হিসেবে, একটি জৈবিক ও সংহত মণ্ডলীর একক হিসেবে যাকে ঘাঁটানোর প্রয়োজন নেই। রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদ তাই স্থায়িত্বের পক্ষে কথা বলে এবং নিন্দা করে রাজনৈতিক ব্যবস্থার যেকোনও পরিবর্তন।

রোমান্টিক জাতীয়তাবাদ : এটি মূলত জাতীয়তাবাদের জার্মান ভাষ্য, যার সঙ্গে যুক্ত ফিকটে, হার্ডার, শ্লেগেল, নোভালিস, মূলার ও তাঁদের সমসাময়িক অনেকে। এই ভাষ্যটি জাতির ধারণার সঙ্গে একাত্ম করে দেখে ভাষার বিশুদ্ধতা, লোকসংস্কৃতি ও লৌকিক আচারবিচার, সংস্কৃতি ও আত্মার বিশিষ্টতাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রের বিভিন্ন উৎসবে ও শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে এর প্রকাশ ঘটেছিল।

অখণ্ড জাতীয়তাবাদ: অখণ্ড জাতীয়তাবাদ কাল্পনিক স্তরে এক ধরণের সংহত, সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী জাতীয়তাবাদের ভাবনাকে হাজির করে। দুটি বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ে ইতালি ও জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের উত্থানকে এই জাতীয়তাবাদ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। স্বাভাবিক যুক্তিতেই এর ফলে প্রশ্রয় পেয়েছিল জাতীয়তাবাদের এক আগ্রাসী ও সংকীর্ণ ভাষ্য, যার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না আন্তর্জাতিক ও বিশ্বজনীনতার ভাবনা।

ধর্মীয় জাতীয়তবাদ : জাতীয়তাবাদের এই ভাষ্যটি কোনও এক ধর্মীয় ভাবনার সঙ্গে অন্বিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত করে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের ভাবনা, যা প্রশ্রয় দেয় অপরের প্রতি অসহিষ্ণুতাকে। এর চূড়ান্ত রূপ হল ধর্মীয় মৌলবাদ। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদের এই রূপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিল রয়েছে অখণ্ড জাতীয়তাবাদের।

উপনিবেশবাদ-বিরোধী জাতীয়তাবাদ : উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পরিণতিতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাঁচ দশকে এই ধরণের জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটেছিল। অনেক দেশে (যেমন ভারতবর্ষে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে) এই সব সংগ্রামের নেতারা পরিচালিত হয়েছিলেন জাতীয়তবাদের উদারবাদী ভাষ্যের দ্বারা; আবার আফ্রিকার মত বহু দেশে উপনিবেশবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদকে প্রভাবিত করেছিল সমাজতন্ত্র, নৈরাজ্যবাদের মত র‍্যাডিক্যাল ভাবধারা। জাতীয়তাবাদের এই বিভিন্ন প্রকার জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের সাধারণ উপাদানগুলি বুঝতে সাহায্য করে। সেগুলি হল: মানবপ্রকৃতি, ভাষা এবং জাতি-রাষ্ট্র।

মানব প্রকৃতি : জাতীয়তাবাদের অন্যতম উপাদান হল মানবপ্রকৃতি। জাতীয়তাবাদের সঙ্গে এর সম্পর্কটিকে ব্যাখ্যা করা যায় এইভাবে যে সুনির্দিষ্ট ভিন্নতা সত্ত্বেও মানুষের আছে আত্ম-নির্ধারণের ক্ষমতা। তাছাড়া মানুষের আত্মিক সত্তাটি সমাজে প্রোথিত। শেষ বিচারে মানুষ নিজেকে আবিষ্কার ক'রে তার আত্মোপলব্ধি ঘটে তার নিজস্ব জনমণ্ডলীর মধ্যে এবং এভাবেই একটি জাতির তথাকথিত আত্মিক উন্মেষ ঘটে। একটি জাতির এই তথাকথিত মানবায়ন মানবাত্মারাই প্রসারিত রূপ।

ভাষা : যদিও ভাষাকে জাতীয়তাবাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়, এর মধ্যে এক জটিলতা আছে। পৃথিবীতে সুইজারল্যান্ড, ভারতবর্ষের মত অনেক বহু ভাষাভাষী দেশ যেমন আছে, আছে এমন কিছু দেশ যেখানে একই ভাষা বিভিন্ন স্থানীয় ভাষ্যে বলা হয়, যা বোঝা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তা সত্ত্বেও, যেমন বেনেডিক্ট

অ্যান্ডারসন বলেছেন, ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হিসেবেই গণ্য হয়ে থাকে। তাঁর মতে, ইউরোপে বিভিন্ন ভাষার বিকাশ ঘটেছিল 'মুদ্রণ-পুঁজিবাদের' পরিণতিতে,—এবং জাতীয়তাবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে এটি ছিল এক বৃহৎ পদক্ষেপ। এর মূল যুক্তিটি হল যে মুদ্রিত ভাষা, বিশেষত সংবাদপত্রের উদ্ভাবন ভাষার ভিত্তিতে একটি জনমণ্ডলীকে সংহত করতে বড় রকমের সাহায্য করেছিল। অ্যান্ডারসন আরও দেখিয়েছেন যে, গ্রীক, রুশ ও সার্বো-ক্রোট জাতীয়বাদের ক্ষেত্রে ভাষাচর্চা, ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে নানা উদ্ভাবন, নানা ধরনের সাহিত্যিক কর্মকাণ্ড অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। একইভাবে এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশগুলিতে মুদ্রিত স্থানীয় ভাষা ও ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত বইপত্রের সান্নিধ্যে আসার ঘটনা জাতীয়তাবাদী অনুভূতিকে গভীরতর করেছিল।

জাতি-রাষ্ট্র : জাতীয়তাবাদের ধারণা রাষ্ট্রীয় ভাবনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। জাতীয়তাবাদের সব প্রবক্তাই এই মতাদর্শকে শক্তিশালী রাষ্ট্রের ভাবনার সঙ্গে যুক্ত করেন। জাতি-রাষ্ট্রের জন্ম যেহেতু সাম্প্রতিক কালে এবং যেহেতু এটি একটি আধুনিক ধারণা, জাতীয়তাবাদও আধুনিকতারই ফলশ্রুতি। তা ছাড়া সার্বভৌমত্ব যেহেতু জাতি-রাষ্ট্রের একটি বৈশিষ্ট্য, সেই কারণে জাতীয়তাবাদ ও সার্বভৌমত্ব গভীরভাবে সম্পর্কিত। সার্বভৌমত্বের ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জাতীয়তাবাদের ভাবনার উন্মেষের কয়েক শতক পূর্বে। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে, ফরাসি বিপ্লবের যুগে সার্বভৌমত্বের ধারণা এক নতুন মাত্রা পেল, যখন এটি যুক্ত হল জনগণের ধারণার সঙ্গে এবং জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণা এবারে প্রচারে এল। এইভাবে সার্বভৌমত্বের ধারণাকে আর শাসক বা আইন বা রাজার নিরিখে বিচার না করে তাকে সম্পর্কিত করা হল 'জনগণের' সঙ্গে, এবং 'জনগণের' ধারণাটি একাত্ম হয়ে গেল জাতির ধারণার সঙ্গে। জাতীয়তাবাদ এইভাবে অর্জন করল একটি নতুন মাত্রা।

৩.৫ জাতীয়তাবাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ

যদিও আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শব্দভাণ্ডারে জাতীয়তবাদ একটি অত্যন্ত জাগ্রত ও গুরুত্বপূর্ণ ধারণা, এর দাবিগুলিকে বিভিন্ন মহল থেকে চ্যালেঞ্জ করাও হয়েছে। প্রথম, উদারবাদীরা চ্যালেঞ্জ করেন এই বলে যে, বর্তমান সমাজ যেহেতু বহুজাতি ও বহুসংস্কৃতিভিত্তিক, বহুস্তরীভূত এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ, সেই কারণে ব্যক্তির একটি মাত্র সুনির্দিষ্ট পরিচয়কে সমর্থন করা যায় না। জাতীয়তাবাদ যে একটি মাত্র বিশেষ অস্তিত্বকে মান্যতা দেয়, তাকে চ্যালেঞ্জ জানায় এই প্রতিস্পর্ধী ভাবনা। এর ফলে বৈধতা পায় সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদ এবং প্রান্তিক হয়ে যায় সংখ্যালঘুরা। তাছাড়া উদারবাদ যে বিশ্বনাগরিকত্ব ও বিশ্বজনীনতার কথা বলে, জাতীয়তাবাদের দাবি তাকে খারিজ করে দেয়।

দ্বিতীয়ত, জাতীয়তাবাদকে অপর একটি চ্যালেঞ্জ জানায় মার্কসবাদ। মার্কসবাদ জাতীয়তাবাদের যে সমালোচনা করে তার মূল কথাটি হল যে, মার্কসবাদ যে শ্রেণিহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকে চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করে, তার সঙ্গে জাতীয়তাবাদের স্থানিকতা কিংবা সুনির্দিষ্টতার ভাবনা সঙ্গতিহীন। মার্কসবাদীদের মতে জাতীয়তাবাদ শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত এবং রাষ্ট্র প্রসঙ্গে মার্কসবাদী ভাবনারও প্রতিস্পর্ধী। মার্কসবাদ মনে করে যে জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এমন একটি প্রক্রিয়ার পরিণতিতে যেখানে পুঁজিবাদ ছিল সামন্ততন্ত্রের উত্তরসূরি। তার অর্থ ছিল বাজার অর্থনীতিতে উত্তরণ, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশ এবং স্থানীয় পার্থক্যের বিনাশসাধন। মার্কসবাদী প্রকল্পের মূল কথাই হল শ্রেণিশোষণ থেকে মুক্তি এবং মুক্তি জাতীয়তাবাদের সীমাবদ্ধতা থেকেও, কারণ মার্কসবাদের শেষ কথা হল গোটা বিশ্ব জুড়ে শোষণমুক্ত সমাজের ভাবনার বাস্তবায়ন।

তৃতীয়ত, বিশ্বায়নের উদ্ভবের পরে, যখন আধুনিক প্রযুক্তি ও নয়া-উদারবাদী অর্থনীতির দৌলতে বহুজাতিক সংস্থাগুলি একটি বৃহৎ শক্তি হিসেবে উদয় হয়েছে, জাতীয়তাবাদের কাছে তখন সেটি হয়ে দাঁড়িয়েছে এক নতুন চ্যালেঞ্জ। এর তাৎপর্যটা এই যে, রাষ্ট্রগুলির জাতীয় অর্থনীতি বর্তমানে এই সংস্থাগুলির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গেছে এবং যার ফলে রাষ্ট্রের জাতীয় সার্বভৌমত্বকে এরা জানাচ্ছে কার্যত এক নতুন ধাঁচের চ্যালেঞ্জ। এরা এখন

পরিচিত অ-রাষ্ট্রীয় শক্তি হিসেবে, যারা বিশ্বায়িত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বাজারের সুবাদে জাতীয়তাবাদী নিজস্বতার ভাবনাকে খারিজ করে দেয়। যদিও রাজনৈতিক সীমানাগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে রয়েছে, জাতীয়তাবাদ চিরকাল যে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের কথা বলে এসেছে, এই অ-রাষ্ট্রীয় শক্তির উত্থানের ফলে সেটি এখন প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

চতুর্থত, জাতীয়তাবাদকে এক নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জ জানায় বিশ্বনাগরিকতা ও আন্তর্জাতিকতাবাদের ভাবনা। যেমনটি আমরা দেখেছি, ঐতিহাসিক কারণেই জাতীয়তাবাদের ভাবনার সঙ্গে জড়িত রয়েছে এক ধরণের একাত্মতার ভাবনা, যার প্রকাশ ঘটেছে অপর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আগ্রাসী অভিযান—যা প্রতিফলিত করে অসহিষ্ণুতা ও রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের মানসিকতা। ইউরোপের ইতিহাসে এর অসংখ্য নিদর্শন মেলে। ইতিহাসগতভাবে জাতীয়তাবাদ তাই শোষণ, যুদ্ধ ও হিংসার স্মৃতি বয়ে আনে। বিশ্বানাগরিকতা ও আন্তর্জাতিকতাবাদের ভাবনার দ্বারা পরিচালিত হয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের একাধিক চিন্তাবিদ এই বিষয়টির প্রতি উদ্বেগ প্রকাশ করে আপসহীনভাবে জাতীয়তাবাদের দাবিগুলিকে খণ্ডন করেছিলেন। তাঁদের কাছে বাস্তবিকই জাতীয়তাবাদ সভ্যতার পক্ষে এক বড় বিপদ। কান্ট এই ভাবনার প্রতিভূ ছিলেন, যিনি বিশ্বনাগরিকত্বের ভাবনাকে প্রশংসা করে চিরন্তন শান্তি ও সীমাহীন বিশ্বের কথা বলেছিলেন। আন্তর্জাতিকতাবাদের অপর এক বড় প্রবক্তা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি ইউরোপীয় শক্তিগুলির জাতীয়তাবাদ এবং এশিয়ার উদীয়মান শক্তি জাপানের জাতীয়তাবাদ—উভয়েরই সমালোচক ছিলেন। জাতীয়তাবাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই বিতৃষ্ণা তাঁকে গান্ধী এবং সমকালীন অনেকের থেকেই দূরে সরিয়ে দিয়েছিল, কারণ স্বাদেশিকতার নামে তিনি কোন ধরনের সংকীর্ণতা বা জাতীয়তাকে মেনে নেবার পক্ষে ছিলেন না। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী, যা ছিল তাঁর স্বপ্নের প্রকল্প, তাঁর আন্তর্জাতিকতার আদর্শের সঙ্গী হয়ে রয়েছে।

৩.৬ নমুনা প্রশ্ন

দীর্ঘ-প্রশ্নমালা:

১. জাতীয়তাবাদের উৎস ও অর্থ পর্যালোচনা করুন।
২. জাতীয়তাবাদের বিভিন্ন প্রকার বিশ্লেষণ করুন।

মাঝারি প্রশ্নমালা :

১. জাতীয়তাবাদের উপাদানগুলি পর্যালোচনা করুন।
২. জাতীয়তাবাদের প্রতি চ্যালেঞ্জগুলি আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নমালা :

১. 'উগ্র জাতীয়তাবাদ' বলতে কী বোঝায়?
২. রোমান্টিক জাতীয়তাবাদের অর্থ কী?
৩. জাতীয়তাবাদের দাবিকে মার্কসাবদ কেন প্রশ্ন করে?

৩.৭ গ্রন্থসূচী

1. Andrew Vincent : *Modern Political Ideologies*. Third Edtion (West Sussex : Wiley–Blackwell, 2010).
2. David Miller, 'Nationalism', in John S. Dryzek et at (eds.), *The Oxford Handbook of Political Theory*. Oxford : Oxford University Press, 2006.
3. P. Gilbert, *The Philosophy of Nationalism*, Boulder, Colo: Westview Press, 1998.
4. M. Canovan, *Nationhood and Political Theory*. Cheltenham : Elevard Elgar, 1996.

একক ৪ ☐ ফ্যাসিবাদ

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য
৪.২ ভূমিকা
৪.৩ উৎস
৪.৪ স্বরূপ
৪.৫ বিভিন্ন ব্যাখ্যা
৪.৬ নমুনা প্রশ্ন
৪.৭ গ্রন্থসূচী

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে ছাত্রছাত্রীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলির সঙ্গে পরিচিত হবেন :

- ভূমিকাতে ফ্যাসিবাদ বিষয়ে একটি সামগ্রিক পরিচিতি পাওয়া যাবে।
- ফ্যাসিবাদের উৎসসমূহ।
- ফ্যাসিবাদের স্বরূপ।
- ফ্যাসিবাদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা।

৪.২ ভূমিকা

যদিও একটি সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী এবং রক্ষণশীল মতাদর্শ হিসেবে ফ্যাসিবাদ সাধারণভাবে হিংসা, জঙ্গিপনা, উগ্র জাতীয়তাবাদ, কর্তৃত্ববাদ, একদলীয় ব্যবস্থা ও ব্যক্তিপূজার ভাবনার সঙ্গে জড়িত, এর তাত্ত্বিক ভিত্তির বিষয়টি অনেক সময়ই অস্পষ্ট থেকে যায় বা আলোচিত হয় না। এমনই ঘটে মূলত এই কারণে যে আমাদের কাছে ফ্যাসিবাদের প্রকাশ ঘটে ইতিহাসগতভাবে ইতালিতে মুসোলিনির ও জার্মানিতে হিটলারের আমলে ফ্যাসিবাদ যে চেহারা নিয়েছিল, তার মাধ্যমে। অবশ্যই ফ্যাসিবাদের ইতিহাসে এই দুটি রূপ ছিল প্রধান, কিন্তু ফ্যাসিবাদী আদর্শ অন্য চেহারাতেও আত্মপ্রকাশ করেছিল, যেমন দুটি যুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্যায়ে সালাজার-এর পর্তুগালে ও ফ্রাংকো-র স্পেনে। একই সময়ে এশিয়াতে জাপানে ফ্যাসিবাদ ক্ষমতায় আসে ও এক প্রবল আগ্রাসী চেহারা নেয়। মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে এই একই সময়ে ফ্যাসিবাদ বিভিন্ন চেহারার ক্ষমতায় এসেছিল। সাধারণভাবে ফ্যাসিবাদ বলতে বোঝায় তেমনই এক ভাবাদর্শ যা গণতান্ত্রিক কাঠামোতে আমরা যে সব মূল্যবোধের সঙ্গে পরিচিত তার বিরোধিতা করে। এর ফলে পশ্চিমী রাষ্ট্রতত্ত্বের ইতিহাসের গভীরে ফ্যাসিবাদের যে দার্শনিক/তাত্ত্বিক শিকড়গুড়ি প্রোথিত রয়েছে, তা নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামানো হয় না। এও সাধারণভাবে ভাবা হয় যে উদারবাদ ও সমাজতন্ত্রের মতাদর্শের থেকে ফ্যাসিবাদ এই অর্থেই আলাদা যে, এটি বিংশ শতাব্দীর মতাদর্শ হওয়ার ফলে এর উৎস নিহিত রয়েছে বিংশ শতকেই। এই আপাত ধারণার ভিত্তিতে কিন্তু মতাদর্শ হিসেবে ফ্যাসিবাদের কোনও প্রকৃষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে না। তাছাড়া, অ্যান্ড্রিউ ভিনসেন্ট-এর মতে, ফ্যাসিবাদের দৃশ্যমান চরিত্র অনেক সময়েই এর জটিল অস্পষ্ট চেহারাকে আড়াল করে রাখে, কারণ একদিকে যখন ফ্যাসিবাদ নিজেকে গলাবাজি ও প্রচারের মাধ্যমে জনসমক্ষে হাজির করে, অপরদিকে এর মতাদর্শগত ভাবনাগুলি অনেক সময়েই অস্পষ্ট থেকে যায়। যেমন, নাৎসিরা 'জাতীয় সমাজতন্ত্র'-এর মত যে শব্দবন্ধ ব্যবহার করত, তার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক

ভাবাদর্শের তুলনা করাটা একেবারেই বাহ্যিক, এবং এভাবেই স্পষ্ট হয় মতাদর্শগত প্রশ্নে ফ্যাসিবাদের ক্ষেত্রে ধোঁয়াসার জায়গাটি। আবার, ইতালীর ফ্যাসিবাদের জনক মুসোলিনি গোড়ার দিকে যুক্ত ছিলেন ইতালির সোস্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে এবং ফ্যাসিবাদের প্রথম পর্বে অনেক ইতালীয় ফ্যাসিস্ট নিজেদেরকে 'জাতীয় সিন্ডিক্যালিস্টপন্থী' হিসেবে পরিচয় দিতেন, যদিও ফ্যাসিবাদের সঙ্গে রাষ্ট্রকেন্দ্রিকতার ভাবনা ছাড়া কোনও ধরনের সমাজতন্ত্রের কোনও সম্পর্ক ছিল না।

৪.৩ উৎস

'ফ্যাসিবাদ' শব্দটি ভাষাগতভাবে লাতিন শব্দ 'ফ্যাসেস' শব্দ থেকে উৎসারিত, যা বলতে বোঝায় প্রাচীন রোমে একগুচ্ছ শলাকাকে একত্রিত করে শক্তিমত্তা প্রদর্শনের যে ভাবনা প্রচলিত ছিল, তাকে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে যদিও মুসোলিনির নেতৃত্বে ইতালীয় ফ্যাসিবাদের সমর্থকেরা তাঁদের বক্তব্যে ঐক্য ও শক্তির কথাই বলতেন, 'ফ্যাসি' এই শব্দটি একটি সমাজতান্ত্রিক মাত্রাও পরিগ্রহ করেছিল। ১৮৯২ সালে ইতালিতে সিসিলিয়ান গোষ্ঠীগুলি নিজেদেরকে ফ্যাসিবাদী আখ্যা দিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে মুসোলিনি ছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সোস্যালিস্ট পার্টির সদস্য এবং ফ্যাসিবাদ একটি দক্ষিণপন্থী মতাদর্শে রূপান্তরিত হল যখন তিনি তাঁর নিজস্ব দল গঠন করে ইতালিতে রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন এবং উদারবাদ ও সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করে ফ্যাসিবাদ একটি রক্ষণশীল চেহারা নিল।

মোটামুটিভাবে ফ্যাসিবাদের উৎস চারটি। এক: একে ভাবা হয় মনের এক আবেগ হিসেবে, যা জার্মান ধারণা লোকচৈতন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। জার্মানিতে নাৎসি ভাবাদর্শ ছিল নর্ডিক আবেগের সঙ্গে সম্পর্কিত, যেমন ইতালির ফ্যাসিস্টরা তাঁদের ভাবনাকে জড়িয়েছিলেন রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাসের সঙ্গে। দুই: জাতীয়তবাদ, ক্ষমতা ও শক্তির যে ধারণাগুলির ওপরে ফ্যাসিবাদ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, যেগুলির উৎস খোঁজা হয়, অদ্ভুত শোনালেও, রেনেসাঁ ও আলোকায়নের ভাবনায়। উদাহরণ হিসেবে, একজন বিশিষ্ট ইতালীয় ফ্যাসিস্ট, আলফ্রেদো রক্কো, ম্যাকিয়াভেলি, ভিকো ও মাৎসিনিকে ইতালীয় ফ্যাসিবাদের জনক মনে করতেন, কারণ তাঁদের দর্শন ছিল ক্রিয়াধর্মী। তিন: ফ্যাসিবাদের উত্থানের পিছনে এক গুচ্ছ বৌদ্ধিক প্রবাহ মদত যুগিয়েছিল, যেগুলির উৎস ছিল ঊনবিংশ শতকের ইউরোপ। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য জার্মান রোমান্টিক ভাবাদর্শ, সামাজিক ডারউইনীয়বাদ, এলিটতত্ত্ব, সংঘবদ্ধতা, জীবনমুখিতা ও শ্রমিকসংঘবাদ,—যেগুলি একই সঙ্গে আত্মা, আত্মবাদ ও সামূহিকতার ভাবনাকে গুরুত্ব দেয়। চার: বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক, যেমন আর্নস্ট নোল্টে, এফ. এল. কারসটেন, হিউ ট্রেভার-রোপার মনে করেন যে ফ্যাসিবাদ হল মূলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বা দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ের একটি বিশেষ ঐতিহাসিক পর্বের ফসল। এঁদের মতে, ফ্যাসিবাদের উত্থানের নেপথ্যে, বিশেষত ইতালিতে ও জার্মানিতে, যে ঘটনাগুলি কাজ করেছিল সেগুলি হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিভিন্ন দেশের জয়-পরাজয়, ভার্সাই চুক্তির অপমানমূলক শর্তগুলি মেনে নিতে জার্মানিকে বাধ্য করা, রুশ বিপ্লব, বামপন্থার সংগঠিত উত্থান, কাইসার প্রজাতন্ত্রের অবসান এবং বৃহৎ মন্দা।

৪.৪ স্বরূপ

ফ্যাসিবাদের অনেক প্রকারভেদ থাকলেও নিম্নোক্ত উপাদানগুলি দিয়ে ফ্যাসিবাদকে চিহ্নিত করা যায়।

এক: ফ্যাসিবাদ মনুষ্যচরিত্রকে ইচ্ছাশক্তির ও ক্রিয়াশীলতার নিরিখে বিচার করে। যেহেতু ক্রিয়াই মুখ্য, চিন্তা এখানে গৌণ। এরই ফলে ফ্যাসিবাদে বৈধতা পেয়েছিল হিংসা এবং লুপ্ত হয়েছিল যুক্তি। তরুণ ফ্যাসিস্ত কর্মীরা উজ্জীবিত হতেন তাঁদের ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে হিংসাকে সম্পর্কিত করে,—যার মধ্যে তাঁরা খুঁজে পেতেন এক ধরনের রোমান্টিক জেহাদিপনা ও বীরত্বের গন্ধ। তাছাড়া যথার্থ ফ্যাসিস্ত ভাবনার মানুষকে দেখা হয় সামাজিক, যূথবদ্ধ জীব হিসেবে, যাকে লালন করে প্রকৃতি, যা ছোট করে দেখে ব্যক্তিকে এবং যা উৎসাহিত করে শর্তহীন বৈষম্যকে,—যে বৈষম্যকে জৈবিকভাগে নির্ধারিত হবার ফলে দূর করা যায় না।

দুই: ফ্যাসিবাদ সম্পূর্ণভাবেই উদারবাদবিরোধী, কারণ এটি বিরোধিতা করে বহুত্ববাদের, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের, সংসদীয় গণতন্ত্রের, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের, স্বাভাবিক অধিকারের, সাম্যের, মুক্ত সমাজের, বিশ্ব নাগরিকত্বের ও সহনশীতার ধারণার। তবে, যেমন গ্রীফিন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন, নীতিগত ভাবে ফ্যাসিবাদ সংসদীয় গণতন্ত্রের বিরোধী নয়। ফ্যাসিবাদ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যবহার করেই ক্ষমতায় আসে যাতে এদেরকে শেষ পর্যন্ত ধ্বংস করা যায় ও একদলীয় শাসন কায়েম করা যায়, যেমন ঘটেছিল হিটলার যখন ১৯৩৩ সালে ক্ষমতায় এসেছিলেন।

তিন: যদিও সাধারণভাবে এটা মনে করা হয় যে ফ্যাসিবাদ হল একটি রক্ষণশীল মতবাদ, কারণ চার্চ হল ফ্যাসিবাদের অন্যতম সঙ্গী এবং তার কাজই হল অতীতের নানা প্রতীক ব্যবহার করে উগ্র জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগকে উসকে দেয়া, গ্রীফিন কিন্তু মনে করেন যে ফ্যাসিবাদকে নিছক রক্ষণশীল মতবাদ বলাটা ভুল হবে। ফ্যাসিবাদ অতীতের প্রতীকগুলি ও পুরাকাহিনী নিয়ে যখন গৌরবগাথা প্রচার করে, তার অর্থ কিন্তু নিছক অতীতচারিতা বা অতীতের পুনরুদ্ধার নয়। ফ্যাসিবাদের প্রকল্পটি হল প্রাচীন ব্যবস্থার পুনর্নবীকরণ ও পুনর্জন্ম, কিন্তু একেবারে তা নিজস্ব আধুনিক ধাঁচে, যেখানে জাতির অতীতভাবনার একটি কার্যকরী মূল্য থাকলেও তার অর্থ ঘড়ির কাঁটাকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দেয়া নয়। মুসোলিনি প্রাচীন রোমের গৌরবের কথা বলে ঠিক এই কাজটাই করেছিলেন।

চার: ফ্যাসিবাদ গণমোহিনী রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেয়, কারণ, ম্যাক্স ওয়েবার থেকে ধার করে বলা যায়, এটি সনাতনী এবং আইনী যৌক্তিক কর্তৃত্বের ভাবনাকে অস্বীকার করে। মুসোলিনির নিজেকে 'দুচে' ও হিটলারের নিজেকে 'ফ্যুয়েরার' ঘোষণা করার সুবাদে দুটি দেশেই এই মনোভাবই প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। কোন কোন বিশেষজ্ঞ এই যুক্তিতে ফ্যাসিবাদকে এক ধরনের ধর্মীয় ভাবনা বলতেও কসুর করেন না। তবে এই ধর্ম বলতে তাঁরা বোঝেন 'মানবধর্মী', 'পুর' বা 'রাজনৈতিক' ধর্ম, কারণ খেয়াল রাখতে হবে যে শেষ পর্যন্ত ফ্যাসিবাদ ক্রিয়াশীল থাকে মনুষ্যসমাজেই, মানুষের তৈরি সংস্থার মাধ্যমে এবং মানুষের ইতিহাসেরই অভ্যন্তরে। অর্থাৎ, ধর্ম যে অধিবিদ্যার ভাবনার দ্বারা বিশিষ্টায়িত, ফ্যাসিবাদে তার কোনও চিহ্ন পাওয়া যাবে না এবং পৃথিবীর সব মহান ধর্মই শান্তি ও সহানশীলতার যে বাণী প্রচার করে, ফ্যাসিবাদ তার সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী ভাবনা।

পাঁচ : ফ্যাসিবাদ তার দৃষ্টিভঙ্গিতে যুক্তিবাদ বিরোধী। তাই উদারবাদের প্রতিষ্ঠার ইউরোপে আলোকায়নের মানবতাবাদী ঐতিহ্য ও দৃষ্টবাদীদের ভাবনা যে ভূমিকা পালন করেছিল, ফ্যাসিবাদের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। বরং অতিকথা, বিশ্বাস, প্রতীককে সঙ্গী করে এবং জাতি, নেতা ও সাংস্কৃতিক অস্মিতার কথা বলে ফ্যাসিবাদ যুক্তিবাদের বিরোধিতাকেই প্রশ্রয় দেয়।

ছয় : ফ্যাসিবাদ চতুরভাবে সমাজতন্ত্রের আওয়াজ তুলে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে—যেমনটি করেছিলেন হিটলার নাৎসি জার্মানিতে। নাৎসি দলটি তাদের মতাদর্শ হিসেবে ঘোষণা করেছিল জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রকে এবং তাৎপর্যপূর্ণভাবে হিটলারের দলটির পুরো নামটি ছিল National Socialist German Workers' Party, যদিও ১৯৩৩ সালে ক্ষমতায় এসেই হিটলার বেআইনী ঘোষণা করেছিলেন সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টিকে এবং গোটা নাৎসি রাজত্বে কায়েম করেছিলেন এই দুটি দলের বিরুদ্ধেই সন্ত্রাস ও নিপীড়ন। ফ্যাসিবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের আপাত মিল শুধুই এটুকুই যে, ফ্যাসিবাদের অন্যতম কৌশলই ছিল রুশ বলশেভিকবাদের দাবির মোকাবিলা করতে গিয়ে এই কথাটি বলা যে, ফ্যাসিবাদই হল 'প্রকৃত' সমাজতন্ত্র। তার পিছনে যুক্তিটা ছিল এই যে, পুঁজিবাদ থেকে ভিন্ন এই মতাদর্শ শক্তিশালী কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে ও পরিকল্পনার ভাবনায় বিশ্বাস করে, এবং সেই সঙ্গে সংঘবদ্ধতারও, যার ফলে পুঁজিবাদের প্রগতির ফলে যে সব উন্নয়ন ঘটেছে, সেগুলিকে কাজে লাগিয়ে এক নতুন পৃথিবী গঠিত হবে যেখানে অবসান হবে দাসত্ব ও শোষণের।

সাত : ফ্যাসিবাদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সর্বনিয়ন্ত্রণবাদের ভাবনা, কারণ ফ্যাসিবাদ বিশ্বাস করে যে ব্যক্তির জীবনকে জুড়ে দিতে হবে এক ধরনের নৈতিক উদ্দেশ্য ও গৌরবের ভাবনার সঙ্গে, যার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রাষ্ট্রজীবনের ভাবনা। এই প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য ফ্যাসিবাদ চালু করে সামাজিক প্রযুক্তির এক সুবৃহৎ প্রকল্প, যার মাধ্যমটি হল একটি চরম কেন্দ্রীভূত 'সামগ্রিক' রাষ্ট্র, যার হাতে থাকবে প্রচণ্ড ক্ষমতা। তার অর্থ এক দিকে প্রচার ও

মগজ ধোলাই-এর মাধ্যমে এক ধরনের সহমত তৈরি করা ও অপরদিকে যারা এই মতবাদের বিরোধী তাদের বিরুদ্ধে নিপীড়ন ও সন্ত্রাস প্রয়োগ করা। ফ্যাসিস্ত ব্যবস্থায় তাই ভিন্ন মতের কোনও স্থান নেই।

আট: মার্কসবাদ, যার ভিত্তি হল প্রধানত শ্রমিকশ্রেণির সমর্থন, ফ্যাসিবাদ থেকে ভিন্ন এই অর্থে যে, ফ্যাসিবাদের ভিত্তি একাধিক শ্রেণি। ফ্যাসিবাদ 'গোটা রাষ্ট্রের' জন্য সমর্থন চায় আর সেই কারণে সে পৌঁছতে চায় সমাজের সব অংশের কাছে, যথা একজন অভিজাত পুরুষ, একজন কৃষক, একজন বেকার, একজন 'শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া' ব্যক্তি কিংবা ফুটপাথবাসী—সবার কাছেই।

নয়: ফ্যাসিবাদ পুরোপুরি বিরোধী বিশ্বনাগরিকতার ভাবনার এবং সেই কারণে বহুসংস্কৃতি, বহুধর্ম বা বহুজাতিক সমাজের ভাবনার প্রতি অসহিষ্ণু। যদিও সব ফ্যাসিস্ত ব্যবস্থায় 'অনুপ্রবেশকারী', 'বিদেশী' বা 'বহিরাগত'দের (যাঁরা তাঁদের নিজেদের স্বদেশ ছেড়ে এসেছেন) বিরুদ্ধে প্রচার চালানো বা হিংসা প্রয়োগ করা হয় না, হিটলারের ইহুদি-বিরোধিতা ছিল এই প্রকল্পেরই এক জাজ্বল্যমান নিদর্শন।

৪.৫ বিভিন্ন ব্যাখ্যা

ফ্যাসিস্ত মতাদর্শকে বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করে নানা ধরনের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এবং সেই কারণে এর চরিত্র সম্পর্কে কোনও সহমতে আসা যায় না। তবে এই পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যা ফ্যাসিস্ত মতাদর্শের জটিল চরিত্রের ওপর চমৎকার আলোকপাত করে।

মার্কসীয় ব্যাখ্যা : ফ্যাসিবাদের চরিত্র বিশ্লেষণের ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে অন্যতম আদি ব্যাখ্যা দেন মার্কসবাদীরা, যদিও তাঁদের মধ্যে তিনটি ধারা আছে। সবচেয়ে পরিচিত ব্যাখ্যাটি পাওয়া যায় জর্জি দিমিত্রভের লেখায়, যাঁর বক্তব্য ছিল কমিনটার্নের ভাষ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাঁর মতে, ফ্যাসিবাদের উত্থানের উৎসকে খুঁজতে হবে শিল্পের একচেটিয়া পুঁজিকরণ এবং মানুষের গণতান্ত্রিক আর্তির বিরোধের মধ্যে। ফ্যাসিবাদ হল একচেটিয়া পুঁজির হাতের একটি অস্ত্র যা দিয়ে বৃহৎ ব্যবসা ও একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থকে হিংস্রভাবে দমন করা হয়। কিন্তু অনেক ভাষ্যকার এই প্রশ্ন তোলেন যে এই ব্যাখ্যাটি খুব সন্তোষজনক নয়, কারণ ফ্যাসিবাদ যদি একচেটিয়া পুঁজি ও বৃহৎ ব্যবসার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে, তাহলে হাঙ্গেরি ও রোমানিয়ার মত মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে, যেখানে পুঁজিবাদের তেমন কোনও বিকাশ ঘটেনি, ফ্যাসিবাদী উত্থানকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? একটি দ্বিতীয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন প্রখ্যাত ইতালীয় মার্কসবাদী আন্তোনিও গ্রামসি। তাঁর মতে, ফ্যাসিবাদ নিছক একটি অর্থনৈতিক বিষয় নয়। এটি অবশ্যই একটি মতাদর্শ যার বাস্তবতা অনস্বীকার্য। ফ্যাসিবাদ ইতালিতে জনগণের চেতনায় মতাদর্শগতভাবেই প্রবেশ করেছিল এবং সেজন্য এর মোকাবিলা করতে হবে মতাদর্শগত স্তরেই। সেটাই প্রাথমিক কাজ। একটি তৃতীয় ভাষ্য দিয়েছেন নিকোস পুলানৎজাস, যাঁর মতে ফ্যাসিবাদ হল বোনাপার্টবাদ বা সীজারবাদের একটি প্রকার, যার ফলে অতি-সংসদীয় কোনও গোষ্ঠী ফিনান্স পুঁজি ও শিল্পপুঁজির মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়ে রাষ্ট্রকে তার মত করে পরিচালনা করে এবং এই মত অনুযায়ী ফ্যাসিবাদ কোনও একটি বিশেষ শ্রেণির স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে না।

মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা : এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী ফ্যাসিবাদের বিষয়টিকে বোঝার জন্য প্রয়োজন ফ্যাসিবাদের মনস্তাত্ত্বিক ইতিহাস, ফ্যাসিস্ত মানসিকতার মানসিক গঠন। এরিক ফ্রম, থিওডর আডেরনো, উইলহেলম রাইখ প্রমুখ ব্যক্তি, যাঁরা ফ্রয়েড এবং ইয়ুং-এর ওপরে গবেষণা করেছেন, ফ্যাসিবাদকে বিচার করেছেন মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে। এই ব্যাখ্যাকারেরা মনে করেন যে এক ধরনের একাকীত্ব, স্থানচ্যুতি, জীবনের প্রথম পর্বে যৌনতার অবদমন, সৃজনশীলতার অস্বীকৃতি পুরুষদের মধ্যে এক প্রকারের হতাশা ও ক্ষমতাহীনতার ভাবের জন্ম দেয়। তা থেকেই জন্ম নেয় আগ্রাসী মনোভাব এবং কষ্ট দিয়ে আনন্দ পাওয়ার মানসিকতার—যা থেকেই পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠা পায় হিংসাশ্রয়ী রাজনীতি। উইলহেমল রাইখ বলেছিলেন যৌন বিপ্লবের কথা, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে একমাত্র তাহলেই ঘটতে পারে যৌনমুক্তি, যার সুবাদে ফ্যাসিবাদের রাস্তাকে রোখা যেতে পারে। আভোরনো 'কর্তৃত্ববাদী ব্যক্তিত্ব' শব্দবন্ধটি উদ্ভাবন

করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে বিচ্ছিন্নতা ও নিরাপত্তাহীনতার শিকার জার্মানির নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে কষ্ট দেবার, কষ্ট দিয়ে আনন্দ পাবার যে মানসিকতা বিকশিত হয়েছিল, তা থেকেই গড়ে উঠেছিল 'কর্তৃত্ববাদী ব্যক্তিত্ব।' ভবিষ্যতে এই রকমের ব্যক্তিমানসকে কেন্দ্র করেই ফ্যাসিবাদের বিকাশ ঘটেছিল।

ধর্মীয় ও নৈতিক ব্যাখ্যা : বেনদেত্তো ক্রোচে এবং আর.জি. কলিংউড-এর মত দার্শনিকেরা ফ্যাসিবাদকে দেখেছেন এমন একটি যুগের ফসল হিসেবে যখন নৈতিকতার জোর এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত হারিয়ে গিয়েছিল। বিখ্যাত ইতালীয় দার্শনিক ক্রোচে বললেন যে ফ্যাসিবাদ হল স্বাধীনতার ভাবনার ইতালীয় ঐতিহ্যের বিকৃতি এবং তিনি খেদোক্তি করেছিলেন যে অবক্ষয় যখন জাঁকিয়ে বসে, তখন এই অবক্ষয়প্রাপ্ত মানুষদের সমর্থনেই কর্তৃত্ববাদী সরকার বেঁচে থাকে। ব্রিটিশ দার্শনিক কলিংউড-এর মতে, ফ্যাসিবাদের বিকাশ ঘটেছিল কারণ এটি ছিল খ্রিস্টীয় ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ। এটি ছিল খ্রিস্টীয় ঐতিহ্য ছেঁকেই স্বাধীনতার ভাবনার জন্ম,—এই ধারণার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ। জার্মান ফ্যাসিবাদের আদি ভাষ্যকার রাউশনিং ফ্যাসিবাদী দর্শনকে বলেছিলেন সাংস্কৃতিক ও নৈতিক নৈরাজ্যের প্রকাশ, যা ঘোষণা করে 'ঈশ্বরের মৃত্যু'।

রাজনৈতিক ব্যাখ্যা : ফ্যাসিবাদের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা মূলত এ কথাই বলে যে ফ্যাসিবাদ ছিল ইউরোপে উদারবাদী গণতন্ত্রের সংকটের ফসল। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ে উদারবাদী মূল্যবোধের অবক্ষয় ও পতন ফ্যাসিবাদের উত্থানে সহায়তা করেছিল। তাছাড়া অনেক ভাষ্যকার আছেন যাঁরা ফ্যাসিস্ত নেতৃবৃন্দের জীবনের রাজনৈতিক দিকটির প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং বলেন যে তাঁদের ব্যক্তিত্বের মধ্যেই কর্তৃত্ববাদী মানসিকতা নিহিত ছিল, পরবর্তীকালে ফ্যাসিবাদের উত্থানের ক্ষেত্রে যা সহায়তা হয়েছিল।

৪.৬ নমুনা প্রশ্ন

দীর্ঘ-প্রশ্নমালা:

১. মতাদর্শ হিসেবে ফ্যাসিবাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।
২. ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যাগুলি সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

মাঝারি প্রশ্নমালা :

১. ফ্যাসিবাদের উৎসগুলি অনুসন্ধান করুন।
২. ফ্যাসিবাদের মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক ব্যাখ্যাগুলি বিশ্লেষণ করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নমালা :

১. এ কথা কেন বলা হয় যে মতাদর্শ হিসেবে ফ্যাসিবাদ শব্দবাজির দৌলতে চাপা পড়ে যায়?
২. ফ্যাসিবাদের সঙ্গে রক্ষণশীলতাবাদের সম্পর্কটি ব্যাখ্যা করুন।
৩. ফ্যাসিবাদের মার্কসীয় ব্যাখার ওপরে মন্তব্য করুন।

৪.৭ গ্রন্থসূচী

1. Andrew Vincent : *Modern Political Ideologies*. Third Edtion (West Sussex : Wiley–Blackwell, 2010).
2. Roger Griffin (ed.), *Fascism* (Oxford and New York : Oxford University Press, 1989)
3. Roger Griffin, *The Nature of Fascism* (London: Routledge, 1993).
4. James A. Gregor, *Interpretations of Fascism* (Morristown NJ: General Learning Press, 1974).

একক ১ ❐ সমাজতন্ত্র

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য
১.২ ভূমিকা
১.৩ আধুনিক সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত
১.৪ ইউটোপিয়ান সোসালিজম বা কল্প সমাজবাদ
১.৫ ফেবিয়ান সমাজবাদ
১.৬ গিল্ড সমাজবাদ
১.৭ সিন্ডিকাল সমাজবাদ
১.৮ বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ
১.৯ সমাজতন্ত্রের বিপক্ষে যুক্তি
১.১০ সমাজতন্ত্রের পক্ষে যুক্তি
১.১১ সারসংক্ষেপ
১.১২ নমুনা প্রশ্ন
১.১৩ গ্রন্থসূচী

১.১ উদ্দেশ্য

এই ইউনিটটি পড়ে আমরা জানতে পারব—:

- সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবার উদ্ভবের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত।
- ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল।
- বিভিন্ন ধরনের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা-কল্প সমাজবাদ, ফেবিয়ান সমাজবাদ, গিল্ড সমাজবাদ; সিন্ডিকালিজম ও বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ।
- সমাজতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য
- সমাজতন্ত্রের পক্ষে ও বিপক্ষে আলোচনা

১.২ ভূমিকা

সমাজতন্ত্র একটি বহু ব্যবহৃত শব্দ; যেমন জেড বলেছেন, 'এটি এমন একটি টুপির মত যেটি সবাই পরে বলে তার নিজস্ব আকার হারিয়ে ফেলেছে।' এই প্রচলিত শব্দটিকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে ও সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এর বর্তমান দেওয়া সংজ্ঞাগুলির কোন একটি কেন্দ্রবিন্দু নেই। ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ধারা সময়ের সাথে সাথে উঠে এসেছে।

সমাজতন্ত্রের পরিঠামোর মধ্যে নানা ধরনের মতামতের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। ইউটোপিয়ান সমাজতান্ত্রিক

ফেবিয়ান সমাজতান্ত্রিক, সিন্ডিকালিস্ট, গিল্ড সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক, রাষ্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিক থেকে শুরু করে বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক বা মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিকদের দেখতে পাওয়া যায়। বললে হয়তো ভুল হবে না, যে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে সমাজতন্ত্রের ধারণা যতটা বিতর্কের সৃষ্টি করেছে তেমনটা বোধহয় আর কোন ধারনা করেনি।

মত-পার্থক্যের কথা বলা হয়েছে। তবে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কয়েকটা সাধারণ সংজ্ঞা দেওয়া যাক : তা হলে সমাজতন্ত্রের মূল বিষয়গুলি বুঝতে সুবিধা হবে।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার দেওয়া সংজ্ঞা অনুসারে সমাজতন্ত্র হল সেই নীতি বা তত্ত্ব যেটির লক্ষ্য কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বর্তমানের তুলনায় উন্নততর বণ্টন ও তার নিয়ন্ত্রণে উন্নততর সম্পদের উৎপাদন সৃষ্টি করা।

অধ্যাপক এলী বলেন, একজন সমাজবাদী উন্নত অর্থনৈতিক সম্পদের বণ্টন ও মানবিকতার উৎকৃষ্টতার লক্ষ্যে রাষ্ট্রে সংগঠিত সমাজের দিকে তাকায়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ভাইয়ের রক্ষাকর্তা হিসাবে দেখেনা; আশা করে প্রত্যেকে তার নিজের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য কাজ করবে।

সমাজবাদীদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধারার চিন্তাভাবনার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। তবে মূল কতকগুলি বিষয়ে তাদের মধ্যে কমবেশি ঐকমত্য দেখা যায়। সেগুলি হল:

১। উৎপাদনের বেসরকারি মালিকানা ও পুঁজিবাদ সম্পর্কে সমালোচনামূলক দৃষ্টি।

২। জমি, পুঁজি, উৎপাদনের যন্ত্র ও পরিবহণ সহ সব শিল্পের যৌথ মালিকানা।

৩। শিল্পের বেসরকারি মালিকানা ও পরিচালনের পরিবর্তে সমাজবাদীরা সমবায়ভিত্তিক মালিকানার কথা ও উৎপাদন যন্ত্রের রাষ্ট্রীয় মালিকানার কথা বলে।

৪। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শিল্প সংস্থার নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে শ্রমিক সুরক্ষা ও যথাসম্ভব মজুরির সমতা আনায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ আশা করা হয়।

৫। সমাজকে একটি সম্পূর্ণ ব্যবস্থা হিসাবে দেখা হয় ও ব্যক্তিকে সেই ব্যবস্থার অংশ বিবেচনা করা হয়।

৬। শ্রমের প্রতি ও তার ন্যায়-এর দাবির প্রতি সম্মান দেখানো হয়।

১.৩ আধুনিক সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত

কিছু চিন্তাবিদ আছেন যাঁরা প্লেটোর রিপাবলিকে প্রকাশিত সাম্যবাদের ধারণায় আধুনিক সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার উৎস খুঁজে পান। আরো কেউ কেউ তার উৎস দেখেন খ্রিস্টিয় ধর্মে; আবার অনেকে ১৭ শতকের ইংরেজদের গৃহযুদ্ধের দিকে তাকান। তবে বলা যায় যে আধুনিক সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা অনেকাংশেই শিল্পবিপ্লব ও ফরাসি বিপ্লব থেকে উদ্ভূত।

শিল্পবিপ্লবের ফলে১৮ ও ১৯ শতকে ইউরোপে বড় কারখানা, শিল্পে শ্রমিক শ্রেণি ও শ্রমিকদের তীব্র শোষণ, অমানবিক কাজের পরিবেশ, বস্তির বিস্তার ও ন্যূনতম পরিষেবার অভাব দেখা দেয়। এই পটভূমিতে নানা ধারার সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা উঠে আসে। উদ্দেশ্য হল শ্রমিক শ্রেণির দুর্দশা মোচন করা। ক্রমেই শব্দটির প্রচলন বাড়তে থাকে। সমাজতান্ত্রিক মতবাদ Laisse Faire বা অবাধ বাণিজ্য মতবাদের বিপরীতে অবস্থান করে। অবাধ বাণিজ্য মতবাদ রাষ্ট্রের কার্যকলাপ যথাসম্ভব সীমিত রাখার কথা বলে, অর্থনৈতিক ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে। বলাবাহুল্য এই দৃষ্টিভঙ্গি শ্রমের শোষণের সহায়ক হয় বলে সমালোচনা ওঠে। সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ঠিক এর বিপরীতে অবস্থান নেয়। সরকারের কার্যক্ষেত্রের সংকোচন নয়, বিস্তারের কথা বলে। সমাজবাদীরা বিশ্বাস করেন, সঠিকভাবে সংগঠিত হলে রাষ্ট্র শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে আর সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক

নৈতিক ও নান্দনিক স্বার্থ তুলে ধরবে।

উনিশ শতকের ইউরোপে ধারাবাহিক চিন্তার বিকাশ ও আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে আধুনিক সমাজতান্ত্রিক চেতনার প্রকাশ ঘটে। এই সময়ে দেখা যায় সর্বত্র বিভিন্নভাবে সমাজতান্ত্রিক দর্শন নিয়ে মানুষ চিন্তা ভাবনা করছে এবং কীভাবে তাকে বাস্তব রূপ দেওয়া যায় তার পরিকল্পনা তৈরি করছে। এই লোকেরা (যাদের মধ্যে জন স্টুয়ার্ট মিলও ছিলেন) ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ছিলেন; তাঁরা আলাদা আলাদা ধরনের সমাজতন্ত্রের কথা বলেন। তব, তাঁরা সকলেই নিজেদের মত করে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ভিত গড়ায় অবদান রাখেন। এটি এমন একটি আন্দোলন যেটি আজও টিকে আছে। সময়ের সাথে সাথে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার যে মূল ধারাগুলি উঠে এসেছে সেগুলিকে নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করবো।

১.৪ কল্পসমাজ

কল্পসমাজবাদ আধুনিক সমাজতন্ত্রের প্রথম রূপ। ১৯ শতকের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনায় কল্পসমাজবাদের প্রাধান্য ছিল। এটি একই সময়ে একাধিক চিন্তাবিদের চিন্তাপ্রসূত তবে ভিন্ন ভিন্ন রূপে।

ফরাসি ও ইংরেজ সমাজবাদীদের মধ্যে এই চিন্তাধারার প্রতি উল্লেখযোগ্য সমর্থন ছিল। প্রথমদিকের সমাজবাদী তথা সাঁ সিঁ মো, ফুরিয়ার, ওয়েন প্রভৃতিদের সমালোচনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে মার্ক্স ও এঙ্গেলস 'কল্পবাদী' আখ্যা দেন; সেই পরিচয়টাই থেকে যায়।

এই প্রারম্ভিক সমাজবাদীরা উপলব্ধি করেন যে চারপাশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সাধারণ শ্রমিকের প্রতি খুবই অন্যায্য। এই অসন্তোষ থেকেই তাঁদের মনে নানা প্রশ্ন ওঠে। তাঁরা প্রশ্ন তোলেন ক্ষমতাসীন শ্রেণি তথা শিল্পের মালিকদের অতখানি ক্ষমতা থাকা উচিত কিনা। কে কাজ করবে তা চিহ্নিত করার অধিকার তাদের আছে কিনা। তাদের কি মজুরি নির্ধারণ করতে দেওয়া উচিত? নিজেদের স্বার্থে শ্রমিকদের ব্যবহার করার অধিকার কি তাদের থাকা উচিত? সমাজবাদীদের মতে এগুলি উচিত নয়। মার্কিন ও ফরাসি বিপ্লবের রাজনৈতিক সমতার আন্দোলনের পরের ধাপ হিসাবে তারা আর্থ-সামাজিক সমতার আন্দোলনকে দেখেন। তাঁরা সমস্ত মানুষের প্রতি ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আদর্শ সম্প্রদায় ও সহযোগিতাভিত্তিক কমিউনের স্বপ্ন দেখেন। কল্পসমাজবাদীদের কাছে সমাজতন্ত্র ছিল পূর্ণ সত্য, যুক্তি ও ন্যায়ের প্রকাশ। তাঁরা মনে করতেন এটা শুধু আবিষ্কারের অপেক্ষায় ছিল—যার পর নিজ ক্ষমতায় তা পৃথিবীকে জয় করতে পারবে। পূর্ণ সত্য হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় এই সমাজতন্ত্রকে সময়, স্থান ও মানুষের অগ্রগতির ইতিহাস-নিরপেক্ষভাবে দেখা হয়। সমাজের মন্দ দিকগুলিকে অপসারণ করার জন্য যুক্তির প্রয়োজন এমনটাই মনে করা হয় আর তার জোরেই উৎকৃষ্ট সামাজিক ব্যবস্থার রূপরেখা আবিষ্কার করা সম্ভব। এ সবের জন্য ধারাবাহিক প্রচার প্রয়োজন আর যেখানে সম্ভব, তা পরীক্ষামূলকভাবে দেখা প্রয়োজন।

থমাস মোর-এর ইউটোপিয়া (১৫১৬)-তে এই স্বপ্নের ভিত্ অনেকখানিই পাওয়া যায়। মোর-এর কাছে 'ইউটোপিয়া' ছিল একইসঙ্গে 'নেই স্থান' ও 'ভাল স্থান'। ইউটোপিয়া ছিল সেই ভাল জায়গা যা কোথাও নেই বা থাকতে পারেনা। ইউটোপিয়া একটি সমালোচনাভিত্তিক আদর্শ ও অবাস্তব স্বপ্ন।

রবার্ট ওয়েন ও কাউন্ট দ্য সাঁ সিঁ ম দুজন উল্লেখযোগ্য কল্পবাদী চিন্তাবিদ ছিলেন।

রবার্ট ওয়েন ১৭৭১-এ জন্মগ্রহণ করেন। কারখানায় শ্রমিক ও শিশুদের প্রতি ব্যবহারে তিনি বিচলিত ছিলেন। ফলে তাদের প্রতি আচরণ পরিবর্তন করাকে তিনি তাঁর লক্ষ্য নির্ধারণ করেন। তিনি দ্রুত কাপড় শিল্পে উন্নতি করেন ক্রমে তিনি নিউ ল্যানার্ক-এর মালিকানা অর্জন করেন। নিউ ল্যানার্ক এমন একটি গ্রাম যেখানে দুহাজার লোকের বাস আর বেশ কয়েকটি কারখানা ছিল। নিজের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে ওয়েন সঙ্গে সঙ্গে কাজের ঘণ্টা কমিয়ে দেন, শিশু শ্রম

কমান, স্কুল গড়েন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করেন। ইংল্যান্ডে সবাই আশ্চর্য হল দেখে যে এতসব সত্ত্বেও তিনি বিপুল মুনাফা করতে সক্ষম হন। তিনি তাঁর সাফল্যকে তুলে ধরতে গ্রন্থ রচনা করেন ও বিস্তর প্রচার চালান। তাঁর আশা ছিল তিনি তাঁর দৃষ্টিকোণ দ্বারা রাজনীতিবিদদের প্রভাবিত করে পরিবর্তন আনাতে পারবেন ও অন্যান্য কারখানার মালিকদেরও প্রভাবিত করতে পারবেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল যে ন্যায্য ব্যবহারের নীতিকে কৃষিক্ষেত্রে ও সমাজের সর্বত্র কার্যকর করা আর একটি 'নয়া নৈতিক ব্যবস্থা' সৃষ্টি করা। তাঁর সর্ববৃহৎ প্রচেষ্টা ইন্ডিয়ানায় নিউ হার্মনি নামক গোষ্ঠী বানানোর ক্ষেত্রে দেখা যায়। তাঁর ছেলের পরিচালনায়, ১৮২৬ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ওয়েনের আদর্শ সম্পূর্ণ স্বনির্ভর সম্প্রদায়। তবে পাঁচ বছ পর এটি ভেঙে পড়ে। হতাশ হলেও ওয়েন পরিবর্তনের লক্ষ্যে ১৮৫৮-তে তাঁর শেষ সময় পর্যন্ত কাজ করে যান।

কল্পবাদের বিকাশে ফরাসিরা ও বিশেষভাবে যুক্ত ছিল। ফ্রান্স-এ কান্ট দ্য সাঁ সিঁ ম (১৭৬০-১৮২৫) ছিলেন এর জনক। ফরাসি বিপ্লবের সময়ে তিনি বয়েসের দিক থেকে তুলনামূলকভাবে নবীন ছিলেন, কিন্তু তবু তাঁর বৈপ্লবিক আদর্শ তাঁকে প্রভাবিত করে। তিনি ও তাঁর সমর্থকরা বিশ্বাস করতেন যে বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সরকার পরিচালিত হওয়া উচিত। এমন বিশেষজ্ঞ দল হওয়া উচিত যেটি সরকারের সব কাজ পরিকল্পনা করবে ও শ্রম পরিচালন করবে। তাঁর সমর্থকরাই প্রথম সমাজবাদী যাঁরা শ্রমিকদের স্বার্থে পরিকল্পিত সমাজ গঠনের কথা বলেন—এমন একটি ধারণা যেটি তাঁদের ক্ষুদ্র আন্দোলনের চেয়ে অনেক দীর্ঘস্থায়ী হয়। সাঁ সিঁ ম-র মতে মূল বিরোধটি শ্রমিক ও অলস ব্যক্তির মধ্যে। অলস ব্যক্তি কেবল সনাতন সুবিধাভোগী শ্রেণির মানুষ নয়; তাদের মধ্যে তারাও অন্তর্ভুক্ত যারা উৎপাদন ও বিতরণের সঙ্গে যুক্ত না থেকে অপরের আয়ের উপর জীবনধারণ করে।

ব্যক্তি হিসাবে কল্পবাদীরা বড় চিন্তাবিদ না হলেও যৌথভাবে তাঁদের চিন্তার ঐতিহ্য মূল্যবান প্রমাণিত হয়। তাঁরা সমকালীন সমাজের বিভিন্ন সমস্যার আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন এগুলির মোকাবিলার জন্য টুকরো টুকরো ভাবে সামাজিক পরিবর্তন নয়। প্রয়োজন সার্বিক পরিবর্তন। সমাজতান্ত্রিক চিন্তায় কল্পবাদীর সমানাধিকারের ক্ষেত্রে সহযোগিতা, সংগঠন ও ঐক্যের গুরুত্ব তুলে ধরে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তাঁরা আঠারো ও উনিশ শতরে মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেন। একদিকে তাঁরা ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব অনুভব করেন, অন্যদিকে তাঁরা শিল্পবিপ্লবের ভয় ও আশার ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালান।

ওয়েন ও সাঁ সিঁ ম একা ছিলেন না। মার্কসবাদের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত উনিশ শতকের সমাজতান্ত্রিক চিন্তায় কল্পবাদের প্রাধান্য ছিল। ঐ সময়ে ইউরোপে আরো অনেক উল্লেখযোগ্য কল্পবাদী সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদের উদ্ভব ঘটে। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন লুই ব্লাঙ্ক ও চার্লস ফুরিয়ার। বাস্তবে, এই দর্শন কখনই বিলুপ্ত হয় না। ছোট হলেও উৎসাহী গোষ্ঠীরা মাঝে মধ্যেই পরীক্ষামূলক কমিউন গঠন করে। মিশ্র ফলাফল লক্ষ করা যায়। তবে তাঁরা আশা রাখেন একদিন সাফল্য আসবে আর বিশ্বকে পরিবর্তন করার বিষয়ে প্রভাবিত করতে পারবে। সাম্প্রতিক কালে কল্পবাদের প্রতি আগ্রহ অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর একটা কারণ কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের প্রতি মোহভঙ্গ ওঁর একটি কারণ হল সবুজ চিন্তার বিস্তার। (পরিবেশ সংক্রান্ত চিন্তা)।

১.৫ ফেবিয়ান সমাজবাদ

১৯ শতকের শেষের দিকে ইংল্যান্ডে অনেকে সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। আশির দশকের গোড়ার দিকে বেশ কিছু সমাজবাদী আন্দোলন ইংল্যান্ডে গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে নানা অনুঘটক ছিল। তার মধ্যে ছিল ১৮৬৭-র আইন অনুসারে শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে ভোটাধিকার বিস্তার ও সরকারের কর ও শিল্প নিয়ন্ত্রণের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মোকাবিলায় জনসাধারণের হতাশা। সত্তরের দশকের অর্থনৈতিক মন্দা, জমি-প্রশ্নে আন্দোলন, অনুবাদের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে মার্কস-এর চিন্তাভাবনার বিস্তার ও সনাতন Laissez faire নীতির উপরে খ্যাতনামা

ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদদের আক্রমণ। সমাজতান্ত্রিক মতামত প্রসারের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের মধ্যে ছিল—সোস্যাল ডেমক্রেটিক ফেডারেশন, সোস্যালিস্ট লীগ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি ও ফেবিয়ান সোসাইটি।

অক্টোবর ২৪, ১৮৮৩-তে ফেবিয়ান সোসাইটি গঠিত হয়। এডিস নেস্‌বিট্, হুবার্ট ব্ল্যান্ড, এডওয়ার্ড পিসের সাথে মিলে একটি সমাজবাদী বিতর্ক সংস্থা গঠন করেন। তবে, ফেবিয়ান সোসাইটির নামটা পরের বছর অর্থাৎ ১৮৮৪-তে এক নতুন সদস্য ফ্রাঙ্ক পড়মোর-এর দেওয়া। সেপ্টেম্বর ১৮৮৪-এ জর্জ বার্নার্ড শ এই সোসাইটিতে যোগদান করেন ও তার পরের বছর সিডনি ওয়েব এর সাথে যুক্ত হন। পরবর্তীকালে এই দুজন সোসাইটির সক্রিয় ও প্রভাবশালী সদস্য হন।

এই সোসাইটির নামকরণ ফেবিয়াস কাংকটেটরের নামে করা হয়। তিনি একজন বিখ্যাত রোমান যোদ্ধা ছিলেন। হ্যানিবালের সঙ্গে সরাসরি সংঘাত এড়িয়ে যুদ্ধ নীতি গ্রহণ করার জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। তিনি দ্রুত ছোট ছোট আক্রমণ চালিয়ে যুদ্ধে বিপর্যয় এড়িয়ে যান। তিনি ঐ সোসাইটির যথার্থ প্রতীক।

ঐ সোসাইটির লোকেরা (যারা ফেবিয়ান হিসাবে পরিচিত হন) মনে করেন সামাজিক গণতন্ত্র বিপ্লব ও সহিংস পথে আসবে না,বরং ধীর ও দৃঢ় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে আসবে। তাঁদের মূল ধারণা ছিল যে পুঁজিবাদ অধিকাংশ মানুষের প্রতি অবিচার করে এবং এটি একটি আধুনিক সমাজের পক্ষে অনুপযুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। প্রায় সব সমাজবাদীদের মত তাঁরাও মনে করতেন যে উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা শ্রমিকদের হাতে থাকা উচিত। ফেবিয়ানদের কাছে আইন প্রণয়ন, প্রতিবাদ, স্থানীয় ভাবে আন্দোলন সংগঠিত করাই ছিল উদ্দেশ্য সফল করার পথ যার মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণির দুর্গতি দূর করা যাবে বলে তাঁরা মনে করতেন। তাঁরা শিক্ষা ও পর্যায়ক্রমে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার গ্রহণযোগ্যতা গড়ে তোলার ওপর জোর দেন, বলপ্রয়োগ করে মানুষকে দীক্ষা দেওয়া নয়।

বিপ্লবের বিষয়ে ফেবিয়ানরা মার্কস-এর সঙ্গে একমত ছিলেন না, তাঁদের আন্দোলন মূল সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলি তুলে ধরার লক্ষ্যে ছিল, যেমন শ্রমিকদের সহায়তা করে অর্থনৈতিক সাম্যের সৃষ্টি করা। তারা বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক অধিকার গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে একজোট হয়ে ১৯০৬-তে লেবার পার্টি গঠনে সহায়তা করে। তখন থেকে এই দুটি সংস্থার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় থাকে। বিংশ শতাব্দীতে দলের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী নির্বাচনে ফেবিয়ান সোসাইটি যুক্ত থেকেছে।

এই আন্দোলনের আবেদন ছিল শ্রমিক শ্রেণির কাছে। কিন্তু এর সমর্থনের বেশিটাই আসে সমাজের বিত্তশালী অংশ থেকে। তারা দেশের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার বিষয়ে ব্যাপক গবেষণার লক্ষ্যে বিপুল অর্থ ব্যয় করে।

ফেবিয়ানরা তৎকালীন ব্রিটিশ জনমতের পরিবর্তনের এক উল্লেখযোগ্য প্রতিফলন ঘটায়। সেটি হল, বেসরকারি উদ্যমের সামাজিক উপযোগিতা সম্পর্কে অনাস্থা ও রাষ্ট্রের আইনী ও প্রশাসনিক ক্ষমতার মাধ্যমে কুব্যবহার রদ করে মানবিকতা আনার প্রতি ক্রমবর্ধমান আস্থা। উল্লেখযোগ্য যে ফেবিয়ানরা তাদের কর্মনীতিকে উদারবাদের সম্প্রসারণ হিসাবে তুলে ধরেন। ফেবিয়ান এসেস (১৮৮৯)-এ সিডনি ওয়েব বলেন, 'গণতান্ত্রিক আদর্শের অর্থনৈতিক দিকটাই হল সমাজতন্ত্র'।

১৯৩০-এ ফেবিয়ানরা খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায়। বলা যায়, ফেবিয়ানদের অবদান তত্ত্বের চেয়ে কাজের ক্ষেত্রে বেশি ছিল। তাঁরা যে নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রিটিশ আর্থ সামাজিক বিষয় সংক্রান্ত তথ্যসংগ্রহ করে ব্যাখ্যা করেন তাতে সেই দেশের সরকারের পক্ষে সতর্কভাবে ধীরে ধীরে বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব হয়। ফেবিয়ানদের শক্তির মূল ছিল স্পষ্টভাবে প্রয়োগ-উপযুক্ত কার্যকরী প্রকল্পর রূপরেখা দক্ষভাবে নির্ধারণ করায়। বিশেষত (১) সামাজিক আইন প্রণয়ন ক্ষেত্রে—যথা কাজের ঘণ্টা হ্রাস করা, বেকারত্বের বিরুদ্ধে সুরক্ষা; স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা ও মজুরির ন্যূনতম মান, ও শিক্ষার সুযোগের উন্নতি ঘটানো। (২) গণ পরিষেবার গণ মালিকানা ও (৩) উত্তরাধিকার ও বিনিয়োগের উপর কর।

ফেবিয়ান সোসাইটির প্রভাব আজও বর্তমান। সেটা লক্ষ করা যায় শিক্ষা ও সচেতনতার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ লেবার পার্টির (যেটিকে ফেবিয়ানরা গড়ে তুলতে সহায়তা করে) বাম ঘেঁষা চিন্তাবিদদের মধ্যে।

১.৬ গিল্ড সমাজতন্ত্র

সমাজতন্ত্রের একটি ধরণ হিসাবে গিল্ড সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে ব্রিটেনে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে। ফেবিয়ান সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতাদের অভিজ্ঞতা ও ফেবিয়ানইজম্-এর প্রতি সমাজতান্ত্রিক বিরোধিতার ওপর দাঁড়িয়ে গিল্ড সমাজতন্ত্র গড়ে ওঠে। গিল্ড সমাজতন্ত্রের মূল লক্ষ্য ছিল 'শিল্পে স্ব-শাসন' ও স্ব-শাসনের কেন্দ্র হিসাবে কারখানা বা অন্য কাজের জায়গাকে দেখা। তবে, শিল্পে উপভোক্তাদের স্বার্থও স্পষ্টভাবে প্রতিনিধিত্ব পাবে এমনটাই মনে করা হয়। কিন্তু ঠিক কিভাবে তা করা হবে সেবিষয়ে গিল্ড সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। অন্য অনেক ধারার সমাজতান্ত্রিকদের তুলনায় গিল্ড সমাজতান্ত্রিকরা রাষ্ট্রের বিলুপ্তি সম্পর্কে অনেক বেশি স্পষ্ট ছিলেন। তাঁরা মনে করেন, গিল্ড সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই রাষ্ট্রের অবলুপ্তির প্রক্রিয়া শুরু হবে।

গিল্ড সমাজবাদের মূল ধারণাগুলি এ. জে পেন্টি (একজন স্থপতি) এ. আর. অরেজ (স্কুল শিক্ষক, সাংবাদিক ও লেখক) ও এস জি হবসন্ (সাংবাদিক ও বক্তা)-র রচনায় প্রথম উঠে আসে। এঁরা শুরুতে ফেবিয়ান সোসাইটির সদস্য ছিলেন। কিন্তু ফেবিয়ানদের কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক সমাজতন্ত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করায় অসন্তুষ্ট হন। ১৯১৫-এ ন্যাশনাল গিল্ডস্ লীগ গঠিত হয়। এটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, অন্যদের সঙ্গে, ডব্লিউ. মেলর্ ও এম.বি. রেকিট। এই সংস্থাই গিল্ড সমাজতন্ত্রের মূল প্রচারকেন্দ্রে হিসাবে গড়ে ওঠে; গিল্ডস্ম্যান নামক একটি মাসিক পত্রিকা ও নানা প্রচারপত্র ও পুস্তিকা প্রকাশ করে ও সদস্যদের রচিত গ্রন্থ বিক্রি করে। ব্রিটিশ শ্রমিক আন্দোলনে এরা সাগ্রহ শ্রোতা পায় কারণ তারা ব্রিটিশ শ্রমিকদের সামনে এমন কিছু বক্তব্য নিয়ে আসে যার জন্য শ্রমিকরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে কিছুটা প্রস্তুত ছিল। গিল্ড সমাজবাদীদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ ট্রেড ইউনিয়নগুলির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। গিল্ড সমাজবাদীরা মনে করতেন পুঁজির মালিকদের হাত থেকে শ্রমিকদের কাজের শর্ত নির্ধারণের ক্ষমতা ও তাদের শ্রম থেকে উৎপন্ন লাভ অধিগ্রহণ করার ক্ষমতা তুলে নেওয়া উচিত। গিল্ড সমাজবাদীরা জাতীয় শ্রমিক নিয়ন্ত্রিত গিল্ডের মাধ্যমে শিল্পে স্বশাসনের কথা বলেন। এই তত্ত্বটি—যেটি আর্থার জে পেন্টি তাঁর 'রেস্টোরেশন অফ দি গিল্ড সিস্টেম' (১৯০৬)-তে তুলে ধরেন—মধ্যযুগীয় কারিগরি শিল্পের গিল্ডের ধারণাটির উপর প্রতিষ্ঠিত। গিল্ড সমাজবাদীরা মনে করতেন—যে শ্রমিকদের শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কাজ করা উচিত, রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য নয়। গিল্ড সংগঠিত সমাজে রাষ্ট্রের ভূমিকা প্রশাসনিক ইউনিট ও উৎপাদন যন্ত্রের মালিকের হবে; আর গিল্ডগুলি স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও তার কাছে কর প্রদান করবে। গিল্ড সমাজবাদীরা ক্রিয়ার ভিত্তিতে সমাজকে সংগঠিত করায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁদের মতে 'ততগুলি নির্বাচিত প্রতিনিধিগোষ্ঠী থাকা উচিত যতগুলি মূল ক্রিয়ার গ্রুপ আছে...' [জি ডি কোল্, সেল্ফ গর্ভমেন্ট ইন ইন্ডাস্ট্রি (১৯১৭) পৃ. ৩৩-৩৪] তাঁরা মনে করতেন, ক্রিয়ার ভিত্তিতে সংগঠিত না হলে সমাজ গণতান্ত্রিক হতে পারেনা।

তবে, কীভাবে ক্রিয়ার ভিত্তিতে সমাজজীবনকে ভাগ করা হবে ও প্রতিটি ক্রিয়ার জন্য ক্রিয়া-ভিত্তিক গোষ্ঠী স্থাপন করা হবে সে বিষয়ে গিল্ড সমাজবাদীদের মধ্যে কোন মতৈক্য ছিল না। এছাড়াও, গিল্ডগুলিকে স্থানীয় না জাতীয় স্তরে সংগঠিত করা হবে সে নিয়েও মত পার্থক্য ছিল। তবে মোটামুটি ভাবে যে বিষয়ে ঐকমত্য ছিল তা হল যে পুঁজিবাদী সমাজ থেকে গিল্ড সমাজব্যবস্থায় যাওয়ার প্রক্রিয়া হবে সচেতন, বিবর্তনমূলক ও স্বাভাবিক। গিল্ড সমাজবাদীরা রাজনৈতিক পদক্ষেপের চেয়ে অর্থনৈতিক পদক্ষেপের উপর বেশি গুরুত্ব দেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কয়েকটি কার্যকারী গিল্ড গঠিত হয়। এদের মধ্যে সব থেকে শক্তিশালী গিল্ড 'দি ন্যাশনাল বিল্ডিং গিল্ড' ১৯২২-এ ভেঙে যায়; তার পর থেকে এই আন্দোলনের শক্তি হ্রাস পায়। ১৯২৫-এ ন্যাশনাল গিল্ডস লীগ ভেঙে যায়। তবু বলা যায় তার অস্তিত্বকালে ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নের ওপর যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

যদিও গিল্ড সমাজবাদী আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি তবু তার প্রভাব ছিল উল্লেখযোগ্য। ট্রেড ইউনিয়ন, সমাজবাদীরা, যুদ্ধ পরবর্তী সিন্ডিকালিস্ট সহ বিভিন্ন সংস্থার নিয়ন্ত্রণে গিল্ড সমাজবাদীদের মতাদর্শের নানাদিক গ্রহণ করে। গিল্ড

সমাজবাদী লেখকরাও কিছু তাত্ত্বিককে প্রভাবিত করতে পারে বিশেষত বহুত্ববাদী বক্তব্যকে তুলে ধরে যে আধুনিক শিল্পের পরিবেশে স্বাধীনতা ও সমতা সুরক্ষিত করার একমাত্র পথ হল বিভিন্ন স্বশাসিত কার্যকর গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপকভাবে ক্ষমতা বণ্টন, যেখানে প্রতিটি সংস্থাই বিশেষ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাজের মধ্যে দিয়ে যুক্ত থাকবে এবং বৃহত্তর সমাজের সেবা করবে।

১.৭ সিন্ডিকাল সমাজবাদ

উনিশ শতকের শেষের দিকে শ্রমিক শ্রেণীর সামাজিক মতবাদ হিসাবে ফ্রান্সে সিন্ডিকাল সমাজবাদের উদ্ভব। 'সিন্ডিকালিজম্' শব্দটা 'সিন্ডিকাট' থেকে নেওয়া—ফরাসিতে যার অর্থ হল শ্রমিক ইউনিয়ন। এই মতবাদের মূল ধারণাগুলি—আলাদা আলাদাভাবে বিভিন্ন দেশে উঠে এলেও সব থেকে বিস্তারিতভাবে ফ্রান্সে উঠে আসতে দেখা যায়। যাঁদের হাতে এই মতবাদ প্রধানত গড়ে ওঠে, তাঁরা হলেন পেল্লোটিয়ার ভিক্টর গ্রিফুয়েপুল এমিলি পুগেট, এমিলি পাটুয়া, লিও জুহাক্স্, জর্জেস সোরেল, হুবার্ট লাগার্ডেল্ ও এডুয়ার্ড বার্থ।

'লেবার এক্সচেঞ্জ' বা 'বুর্সেজ্ দ্যু ট্র্যাভেল' সংস্থাগুলির মাধ্যমে সিন্ডিকালবাদকে প্রথম সামনে আনা হয়। প্রথমটি প্যারিতে ১৮৮৭-এ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে বিভিন্ন প্রদেশের শহরে অন্যগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে এগুলি এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও পরে এগুলি সামাজিক ও শিক্ষাগত কাজের সাথে যুক্ত হয়। ১৮৯৩-তে বুর্সেজের একটি জাতীয় ফেডারেশন গঠিত হয়। প্রধানত এরই উদ্যোগে ১৮৯৫-তে মজুরি শ্রমিকদের একটি নতুন জাতীয় সংগঠন বানানো হয়। এটির নাম ছিল দি জেনারেল ফেডারেশন অফ লেবার। এই সংগঠন ফ্রান্সের প্রধান জাতীয় শ্রম সংগঠনে পরিণত হয়।

সিন্ডিকালবাদের মূল বক্তব্য ছিল যে শ্রমিকরা নিজেরাই একমাত্র তাদের নিজেদের কাজ ও জীবনের অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করবে। যে সামাজিক পরিবর্তন দরকার তা শুধু তাদের নিজেদের ও তাদের নিজেদর উপযোগী পদ্ধতিতে। মূল উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিককে সম্মান ও স্বাধীনতার এমন একটা স্তরে নিয়ে যাওয়া যা উৎপাদক হিসাবে তার প্রাপ্য।

সিন্ডিকালবাদীরা নিজেদের সমাজবাদের একটা নতুন ধারা হিসাবে চিহ্নিত করেন। তাঁরা সংস্কারমূলক বোঝাপড়ারও পক্ষে ছিলেন না। আবার সনাতন সমাজতান্ত্রিকদের মত রাজনৈতিক পদ্ধতিতে শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পক্ষেও ছিলেন না। বাস্তবে সিন্ডিকালিস্টরা রাজনৈতিক তৎপরতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁরা মনে করতেন সাধারণ শ্রমিক সংগঠন (শিল্পের বা কারিগরির ভিত্তিতে সংগঠিত) স্থানীয় শ্রমিক কাউন্সিল এই সংস্থাগুলির জাতীয় ফেডারেশন ও কনফেডারেশনের সাথে যৌথভাবে কাজ করে শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লব আনতে ও তারপর সামাজিক কর্মকাণ্ড সামলাতে সক্ষম হবে। পদ্ধতিগত দিক থেকে এটি শ্রমিক শ্রেণির 'Direct action'-এর উপর নির্ভরশীল হবে, যথা স্ট্রাইক, অন্তর্ঘাত ও বয়কট।

১.৮ বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ

কার্ল মার্কস্ ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের জনক হিসাবে বিবেচিত হন। মার্কসবাদীদের মতে, ওঁদের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা মার্কসবাদ বাস্তব ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন। আর তাই তাকে বলা হয়, 'বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ'। এছাড়াও তাকে বৈপ্লবিক সমাজবাদও বলা হয়।

কার্ল মার্কস ১৮১৮ সালে একটি মধ্যবিত্ত জার্মান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বন ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং বেশ অল্প বয়সেই হেগেলের দর্শনের প্রভাবে আসেন। তেইশ বছর বয়সে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি

লাভ করেন। তিন দশকেরও বেশি সময়কাল ধরে সমাজ, ইতিহাস, অর্থনীতি ও রাজনীতি বিষয়ে তাঁর নানা রচনার মধ্য দিয়ে মার্কস বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৮৬৪-এ প্রথম সোসালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল গঠনের পিছনে তিনিই মূল চালিকা শক্তি ছিলেন এবং পরবর্তীকালে সমাজবাদী আন্দোলনের প্রধান ব্যক্তিত্ব হিসাবে থেকে যান। ফ্রেডরিক এঙ্গেলস প্রাশিয়া-র এক বিত্তশালী উৎপাদকের সন্তান ছিলেন। তিনি মার্কস-এর বন্ধু, সহযোগী, সাহায্যকারী ও ব্যাখ্যাকার হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁদের বন্ধুত্ব আজন্মকাল থেকে যায়। সমাজবাদ বিষয়ে বেশ কিছু সুপরিচিত তাত্ত্বিক কাজ তাঁরা যৌথভাবে রচনা করেন। ১৮৪৮ সালে মার্কস্ ও এঙ্গেলস-এর 'ম্যানিফেস্টো অফ দি কমিউনিস্ট পার্টি' প্রকাশিত হয়। এটিতে বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণির অতীতের সংগ্রাম, আধুনিক বুর্জোয়া প্রলেজরীয় সংঘাত, পুঁজিবাদের অবশ্যম্ভাবী বিনাশের দিকে অগ্রসর হওয়া ও অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে শ্রমিক শ্রেণির করণীয় বিষয় নিয়ে স্পষ্টতম প্রতিবেদন এতে পাওয়া যায়। নির্বাসিত শ্রমিকদের একটি সংস্থা 'লীগ অফ কমিউনিস্ট'-দের জন্য এটি রচিত হয়। আজ সব সমাজবাদী গ্রন্থের মধ্যে এটি সব থেকে বেশি পঠিত। বহু ভাষাতে এর অনুবাদ হয়েছে।

বাস্তব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে মার্কস্-এর সরাসরি প্রভাব 'ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অফ দি ওয়ার্কিং মেন্'-এ তাঁর ভূমিকার মধ্যে দিয়ে। ১৮৬৪-এ এটি গঠিত হয়। পরে এটি প্রথম ইন্টারন্যাশনাল হিসাবে পরিচিতি পায়। এটি বারো বছর টিঁকে ছিল। এই সংগঠনটি লন্ডনে গড়ে ওঠে। ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নের সদ্যসরা, ফ্রান্সের বিপ্লবী শ্রমিক গোষ্ঠীর নেতারা ও আরো কিছু ইউরোপীয় দেশের রাজনৈতিক উদ্বাস্তু মিলে এই সংগঠন গড়ে তোলেন। এটি মূলত মতের আদানপ্রদান, সহযোগিতা গড়ে তোলা ও বিভিন্ন দেশে শ্রমিক অধিকারে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পিত হয়। সরকারের হস্তক্ষেপ ও অভ্যন্তরীন মতবিরোধ প্রথম ইন্টারন্যাশনালকে দুর্বল করে দেয়। তবে এটি বহু দূর থেকে বহু শ্রমিক প্রতিনিধিকে এক জায়গায় আনতে সক্ষম হয়, যা আগে কখনও হয়নি। এছাড়াও এটি বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের মধ্যে স্বার্থের ঐক্যের অনুভূতি জোরালো করে।

মার্কসের সমাজতন্ত্র বিষয়ক তাত্ত্বিক কাজ অসংখ্য বই, পুস্তিকা ও চিঠির মধ্যে ছড়ানো আছে। কার্ল মার্কস্ ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস-এর গড়ে তোলা বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ হেগেলের দর্শন, ফরাসি বিপ্লবী চিন্তা ও ব্রিটিশ শিল্পবিপ্লবের অধ্যয়নের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই তত্ত্বকে গড়ে তোলা ছিল মার্কসের সারা জীবনের ধ্যান-জ্ঞান। দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে তিনি নিয়ত তার অর্থনৈতিক মডেলগুলিকে উন্নততর করার চেষ্টা চালান। আর তাঁর এই প্রচেষ্টা বৃহৎ তিন খণ্ডের গ্রন্থ 'ক্যাপিটাল'-এর রূপ নেয়। সারাজীবন তিনি মার্কসীয় বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে যান, আর তার জন্য কাজ করে যান।

সমাজ বিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মার্কস হেগেল-এর ডায়ালেক্টিক্সের ধারণা গ্রহণ করেন। যে প্রক্রিয়ায় উন্নততর সমাজব্যবস্থার দিকে সমাজের অগ্রগতি হয় সেটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্কস ডায়ালেক্টিক্স ব্যবহার করেন। ডায়ালেক্টিসের মূল তত্ত্ব হল—বিপরীতের মিলন। হেগেল এটি ব্যবহার করেন চিন্তার ক্ষেত্রে, মার্কস বস্তুর ক্ষেত্রে। সে দিক থেকে মার্কস হেগেলের তত্ত্বটি পরিবর্তন করেন।

মার্কসীয় দর্শনের একটি মূল নীতি হল ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা। অর্থনৈতিক বিষয়ই ইতিহাসের মূল নিয়ামক বলা হয়। প্রতিটি সমাজেই উৎপাদনের প্রক্রিয়া উৎপাদনের সম্পর্ক ও সামাজিক শ্রেণি সম্পর্কের ধারা নির্ধারণ করে। উৎপাদন যন্ত্র ও উৎপাদন সম্পর্ক যৌথভাবে সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি গঠন করে। এর উপর গড়ে ওঠে সমাজের উপরিকাঠামো। তাতে থাকে আইন, ধর্ম, শিল্পকলা, সংস্কৃতি ইত্যাদি।

মার্কস ও তাঁর অনুগামীরা ইতিহাসকে শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস হিসাবে দেখেন। প্রত্যেক সমাজে দুটি প্রধান শ্রেণি থাকে। একটি যারা উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা ভোগ করে। অন্যটি যারা তা করে না। এই দুটি শ্রেণির সংঘাতের মধ্যে দিয়েই সামাজিক পরিবর্তন ঘটে।

নতুন শ্রেণির উদ্ভব ঘটে কিন্তু শ্রেণি সংগ্রাম থেকে যায়। তখন নতুন দুটি শ্রেণির মধ্যে তা চলে। একটি পুঁজিবাদী সমাজে মার্কস দুটি প্রধান শ্রেণির কথা বলেন—বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়। প্রথমটি উৎপাদন ব্যবস্থার মালিক, শ্রমিকদের (প্রলেতারিয়দের) নিয়োগ করে। প্রলেতারিয়রা তাদের নিজেদের শ্রম বাদে আর কিছুরই মালিক নয়। বুর্জোয়ারা প্রলেতারিয়দের শ্রম থেকে উদ্বৃত্ত আহরণ করে নিজেদের মুনাফা আহরণ করে।

মুনাফা সমাজের বিবর্তনের ধারা মার্কসের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। প্রলেতারিয়েত যতই নিপীড়িত হবে, নিঃসম্বল হবে ও বৃহত্তর হবে বিশ্বের সম্পদ ক্রমেই স্বল্পসংখ্যক মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত হবে। শেষ পর্যন্ত এমন একটা সময় আসবে যখন শ্রমিক শ্রেণি বিপ্লবে সামিল হবে আর বুর্জোয়াদের ক্ষমতাচ্যুত করবে। একটি নতুন সমাজব্যবস্থা, সমাজতন্ত্রের সূচনা হবে। একটা সময়ে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রয়োজন হবে নতুন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে কিন্তু তার পর ধীরে ধীরে রাষ্ট্র শুকিয়ে যাবে। যখন কোন অর্থবহ দিক থেকে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকবে না তখন যথার্থ কমিউনিজম্ প্রতিষ্ঠিত হবে ও মানুষের ইতিহাসে প্রথমবার সহযোগিতা ও সাম্যের যুগ প্রতিষ্ঠিত হবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপ পাবে আর শ্রমিকরা কারো অধীনস্থ থাকবে না।

মার্কস মার্কসবাদী কমিউনিস্ট বিপ্লব দেখে যাননি। তিনি যে ধরনের বিপ্লবের কথা বলেছিলেন সাধারণত সে ধরনের বিপ্লবের কথা মনে হলে প্রথমেই আমাদের ১৯১৭-এর রুশ বিপ্লবের কথা মনে হয়। তার সাফল্য কোন প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে মার্কসের সার্বিক মতাদর্শের না হলেও, তার মূল বিশ্বাসের সাফল্যের প্রথম উদাহরণ। বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভ্লাদিমির ইল্লির লিউয়াভ্র (যিনি ইতিহাসে লেনিন নামে পরিচিত) নেতৃত্বে গঠিত হল। যদিও লেনিন মার্কসের আদর্শের অধিকাংশটাই গ্রহণ করেন। তিনি কিছু পরিবর্তন করেন ও বেশ কিছু যোগও করেন। ৯ এপ্রিল ১৮৭০ এ রাশিয়াতে ভাদিমির ইল্লিচ্ ইউলানভ হিসাবে লেনিন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বৈপ্লবিক কার্যকলাপের পাশাপাশি মার্কসবাদ গড়ে তোলায় তাঁর উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিক অবদান ছিল। তাঁর সুপরিচিত পুস্তক-পুস্তিকার মধ্যে আছে—What is to be done? (১৯০২), Two tactics of social Democracy in the Democratic Revolution (১৯৫০), Imperialism: The Highest Stage of Capitalism (১৯১৬), State and Revolution (১৯১৮), Leftwing Communism (১৯২০)।

মার্কসীয় তত্ত্বের ক্ষেত্রে লেনিনের মূল অবদান হল—বিপ্লবী কৌশল, দলের ভূমিকা, পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিষয়ে। কমিউনিস্ট অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে মার্কসের ধারণাকে তিনি আরো বিস্তারিত করেন। দলের অগ্রগামী ভূমিকার ধারণাকেও লেনিন গড়ে তোলেন। লেনিন বিস্তারিতভাবে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম্, জননীতি, পুঁজিবাদী তত্ত্ব ও সাম্রাজ্যবাদ প্রসঙ্গে লেখেন। তাঁর অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ হল Imperialism: The Highest Stage of Capitalism. তাতে তিনি বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করেন কীভাবে একটা উন্নতস্তরে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি করে।

১.৯ সমাজতন্ত্রের বিপক্ষে যুক্তি

সমাজতন্ত্রের বিপক্ষে প্রায়শই যে যুক্তিগুলো শোনা যায় সেগুলি হল—

১. সমাজবাদীদের দেওয়া বিধানগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক ও মানবচরিত্রগত কারণে অবাস্তব।
২. সমাজতন্ত্র কর্মদক্ষতা ও কঠোর শ্রমের পরিবর্তে চলনসইতাকে সমর্থন করে।
৩. সমাজবাদীরা রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে অতিরিক্ত মূল্য দেয়।
৪. যৌথ মালিকানা ও ব্যক্তি সঞ্চয়ের উপর সীমাবদ্ধতা ব্যক্তির চেষ্টাকে নিরুৎসাহ করে।
৫. সমাজবাদ সক্ষম, পরিশ্রমী ব্যক্তিকে অলস ও নির্বোধ ব্যক্তির সঙ্গে তার শ্রমের ফসলকে ভাগ করে নিতে বাধ্য করে। এটা বিচক্ষণ বা যুক্তিসঙ্গত কাজ নয়।
৬. সমাজবাদীরা রাষ্ট্রকে দিয়ে সেই সব কাজ করায় যার জন্য রাষ্ট্র উপযুক্ত নয়।
৭. সমাজবাদীদের নীতি যে প্রতি ব্যক্তি তার শ্রম অনুসারে পুরস্কৃত হবে একটি অতিসরলীকৃত ধারণা যা শুধু নিজের হাতে করা কাজকে বোঝায় কিন্তু পুঁজি ও দক্ষতার মূল্য দেয়না।

৮. সমাজবাদ শ্রমিকদের অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেয় এবং তাদের কোন অধিকার নেই।

৯. সমাজবাদ অর্থনীতির সঠিক যুক্তিকে লঙ্ঘন করে। একটি জনবহুল রাষ্ট্রের জনসাধরণের সব চাহিদা মেটানো, শ্রমকে পরিচালন করা ও বিতরণ ব্যবস্থার দায়িত্ব নেওয়া কোন সরকারের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভ নয়।

১০. সমাজবাদের মৌলিক ধারণা মানব চরিত্রের বিপরীতে যায়। ফলে, মানব প্রকৃতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ছাড়া সমাজবাদ সফল হতে পারেনা।

১১. সমালোচকদের মতে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হলে ও বজায় রাখতে হলে কঠিন নিয়ন্ত্রণের উপর নির্ভর করতে হবে।

১২. সমাজতন্ত্র বেসরকারি উদ্যোগের অবসানের ফলে উৎপাদনের মান ও পরিমাণ দুই-ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

১৩. হার্বার্ট স্পেন্সার 'The coming of slavery'-তে ও জে.এস. মিল 'Political Economy'-তে যুক্তি দেন যে সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা বৃদ্ধি পাবে না বরং হ্রাস পাবে এবং ব্যক্তিচরিত্রের অবনতি হবে।

১.১০ সমাজতন্ত্রের পক্ষে যুক্তি

১. একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে শ্রমজীবী মানুষ তার প্রাপ্য পায়। তার শ্রমের ফসল অন্যরা লুঠ করেনা।

২. সমাজবাদ ন্যায় ও অধিকারের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

৩. পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতার ফলে অতি-উৎপাদন, মজুরি হ্রাস, সস্তা পণ্য ও বেকার শ্রমিক সৃষ্টি হয়। সমাজতন্ত্র প্রতিযোগিতার অবসান ঘটিয়ে ও সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করে ঐসব সমস্যার অবসান ঘটায়।

৪. সমাজতন্ত্র গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক পরিপূরক।

৫. এটি নৈতিকতার পক্ষে।

৬. এটি একমাত্র ব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তির পূর্ণ চারিত্রিক বিকাশ সম্ভব হয়।

৭. সমাজতান্ত্রিকদের কাছে রাষ্ট্র একটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত অংশের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ইউনিট, বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির একত্রীকরণ নয়। ফলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অধিকার ও কর্তব্য পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত।

১.১১ সার সংক্ষেপ

অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে শিল্পায়নের সময়কালে পুঁজিবাদ ও Laissez Faire নীতির সমালোচনা করে সমাজবাদের উদ্ভব। শিল্প উৎপাদনের প্রেক্ষিতে শ্রমের যে ক্রমবর্ধমান ও অসহনীয় শোষণ চলছিল তার অবসান ঘটানো ছিল সমাজবাদের লক্ষ্য। সমাজবাদীদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধারা দেখা যায়। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য ও তা প্রতিষ্ঠা করার পদ্ধতির বিষয়ে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। আধুনিক প্রেক্ষিতে মার্কসীয় ধারা বা যেটিকে 'বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ' বলা হয় সেটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সোভিয়েট ইউনিয়ন গঠনের মধ্যে তার প্রথম ও বাস্তবের নিকটতম প্রয়োগ। ঐ রাষ্ট্রের পতন সমাজতন্ত্রের বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি ধাক্কা, তবে তার ফলে সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব বাতিল হয় না। এত বছরে মার্কসবাদ আলাদা আলাদা ভাবে ব্যাখ্যা হয়েছে; তার আদর্শে অসংখ্য সক্রিয় গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। মার্কসবাদ এখনও ভীষণভাবে বেঁচে আছে, তবে মার্কস্ যেভাবে ভেবেছিলেন হয়তো সেভাবে নয়।

১.১২ নমুনা প্রশ্ন

বড় রচনাত্মক প্রশ্ন:

১. কল্প সমাজবাদের মূল নীতিগুলি কী?

২. ফেবিয়ান সমাজবাদীদের অবদান আলোচনা করুন।

৩. সমাজবাদের বিপক্ষের মূল যুক্তিগুলি সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করুন।

মাঝারি প্রশ্ন:

১. সমাজবাদের বিস্তারে রবার্ট ওয়েন-এর অবদান সংক্ষেপে লিখুন।

২. সিন্ডিক্যাল সমাজবাদের মূল নীতি কী?

৩. লেনিন মার্কসবাদে কি ধরনের পরিবর্তন আনেন?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. ইউটোপিয়া-র লেখক কে ছিলেন?

২. ফেবিয়ান সোসাইটি কবে গঠিত হয়?

৩. কোন্ দেশে গিল্ড সমাজবাদের উদ্ভব হয়?

১.১৩ গ্রন্থসূচী

একক ২ ☐ নৈরাজ্যবাদ

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য
২.২ নৈরাজ্যবাদের সংজ্ঞা
২.৩ নৈরাজ্যবাদের ঐতিহাসিক রূপরেখা
২.৪ নৈরাজ্যবাদী চিন্তার ভিন্ন ভিন্ন ধারা
২.৫ নৈরাজ্যবাদের মূল্যায়ন
২.৬ সারসংক্ষেপ
২.৭ নমুনা প্রশ্ন
২.৮ গ্রন্থসূচী

২.১ উদ্দেশ্য

এই ইউনিটটি পড়ে আমরা জানতে পারব—

- রাজনৈতিক দর্শন হিসাবে নৈরাজ্যবাদের অর্থ।
- নৈরাজ্যবাদী দর্শনের উত্থানের ইতিহাস
- নৈরাজ্যবাদী চিন্তার বিভিন্ন ধারা
- নৈরাজ্যবাদের অবদান ও সীমাবদ্ধতা

২.২ নৈরাজ্যবাদের সংজ্ঞা

নৈরাজ্যবাদ শব্দটি এমন একটি রাজনৈতিক দর্শনের কথা বলে যেটি রাষ্ট্রবিহীন সমাজের ধারণা সমর্থন করে। অনকে ক্ষেত্রে স-হিংস বা অ-হিংস আন্দোলনের মাধ্যমে বর্তমান সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্য থাকে। বেঞ্জামিন টাকার-এর মতে, নৈরাজ্যবাদী দর্শন মনে করে 'মানুষের সব বিষয় ব্যক্তি বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত এবং রাষ্ট্রকে তুলে দেওয়া উচিত।'

নৈরাজ্যবাদকে প্রায়শই এমন একটি তত্ত্ব মনে করা হয় যেটি রাষ্ট্র ক্ষমতার বিরোধিতা করে। এটা অবশ্য অতি সরলীকরণ রাখা। এর থেকে তাত্ত্বিক পর্যায়ের জটিলতাগুলি বোঝা যায় না।

সনাতন নৈরাজ্যবাদ আশ্চর্যরকম ভাবে নানা রাজনৈতিক মতবাদের সাথে নানা দিক থেকে সহমত ছিল। উদারনীতিবাদীদের মতো রাষ্ট্রকে অনেক সময়েই বোঝা মনে করত ও ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী ভাবত। মার্কস সহ, সমাজবাদীদের মতো শোষণমূলক, পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিরোধিতা করত। আর, রক্ষণশীলদের মতো ছোট ছোট স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের আদর্শ কেন্দ্রবিন্দু মনে করত। এই ভিন্ন ভিন্ন সূত্রের মতামতের মেলবন্ধন হওয়ায়, কিছু বিশ্লেষক মনে করেন নৈরাজ্যবাদ আকর্ষণীয় কিছু অবস্থানের অ্যাডহক সংযুক্তিকরণ। একেবারেই এলোমেলো। কারণ উদারনীতি, সমাজবাদ ও রক্ষণশীল অবস্থানের মধ্যের বিরোধ অভ্যন্তরীণ টেনশনের কারণ। নৈরাজ্যের নানা দিক থেকে সংজ্ঞায়িত হয়েছে। 'Anarchism' শব্দটির উৎস হল 'Anarcny', যেটি গ্রীকভাষা থেকে

নেওয়া দুটি শব্দ থেকে উঠে এসেছে। শব্দ দুটি হল 'AV' এবং 'Apxn'; প্রথমটির অর্থ অনুপস্থিতি, দ্বিতীয়টির অর্থ সরকার। আজও অভিধানগুলি নৈরাজ্যবাদ বা Anarchism-কে সরকারের অনুপস্থিতি হিসাবেই সংজ্ঞা দেয়। তবে, নৈরাজ্যবাদীরা, ইতিহাসবিদরা ও ভাল অভিধানিকরা নৈরাজ্যবাদকে একটি ইতিবাচক তত্ত্ব হিসাবে তুলে ধরেন।

একটি প্রথম সারির আধুনিক অভিধান-ওয়েব্স্টারের Third International Dictionary—নৈরাজ্যবাদের সংজ্ঞা হিসাবে বলে—'একটি রাজনৈতিক তত্ত্ব যেটি সব ধরনের সরকার ও সরকারের নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করে ও ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে তাদের নিজেদের ব্যক্তি ও গোষ্ঠী পর্যায়ে স্বেচ্ছা সহযোগিতার সুপারিশ করে।' অন্য কিছু অভিধানও একইভাবে নৈরাজ্যবাদকে দেখে। ব্রিটানিকা ওয়েবস্টার অভিধান বলে,নৈরাজ্যবাদ একট রাজনৈতিক তত্ত্ব যেটি সমস্ত সরকারি কর্তৃত্বকে নিষ্প্রয়োজন ও অবাঞ্ছিত মনে করে এবং ব্যক্তি গোষ্ঠীর স্বেচ্ছা সহযোগিতায় আরো সংক্ষিপ্ত অভিধান, যথা নিজ ওয়েবস্টার হ্যান্ডি কলেজ ডিকসনারি অবশ্য নৈরাজ্যবাদকে দেখে এমন একটি রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে যেটি সব সরকারের অবলুপ্তি চায়।' Cambridge Paperback Encyclopedia অনুসারে 'নৈরাজ্যবাদ রাজনৈতিক চিন্তা ও আন্দোলন সম্পর্কে একটি মূল ধারণা যেটি রাষ্ট্র ও সব ধরনের কর্তৃত্বের বিরোধতা করেও ব্যক্তির স্বেচ্ছা সহযোগিতায় গড়ে ওঠা সমাজের সপক্ষে বলে।'

নোয়াম চমস্কি বলেন, 'নৈরাজ্যবাদ কোন তত্ত্ব নয়। এটি বড়জোর ইতিহাসের একটি ধারা, যেটি চিন্তা ও কাজের ধারা। এটির নানা আলাদা আলাদা গতিপথ আছে। আর আমার ধারণা, এটি মানব ইতিহাসের স্থায়ী ধারা হিসাবে থাকবে।'

যেহেতু নৈরাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাভোগীদের বিরোধিতা করে তাই ক্ষমতাভোগীরা তাকে হিংসা ও বিশৃঙ্খলার সমার্থক বলে সমালোচনা করে। নৈরাজ্যবাদী ঐতিহাসিক জর্জ উডকক বলেন, 'তুলনামূলক হালকাভাবে দেওয়া ধারণা হল নৈরাজ্যবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি হল এমন একজন যে বোমা ছোঁড়ে এবং হিংসা ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে সমাজকে ধ্বংস করতে চায়। এটা আশ্চর্য যে এই সময়ে তাদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ করা হচ্ছে কারণ তারা সেই স্বল্প সংখ্যক কিছু মানুষের মধ্যে যারা বোমা ছুঁড়ছে না বা যারা ছুঁড়ছে তাদের সাহায্য করছে না।' নৈরাজ্য যে বিশৃঙ্খলা এমন ধারণার বিরোধিতা অনেকদিন আগেই আলেকজান্ডার বার্কম্যান করেছিলেন যখন তিনি লেখেন—

'আমাকে বলতেই হবে নৈরাজ্যবাদ কী নয়। এটি বোমা, বিশৃঙ্খলা নয়। এটি ডাকাতি বা খুন নয়। এটি প্রত্যেকের সবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়। এটি বর্বর অবস্থায় ফিরে যাওয়া নয়, এটি তার বিপরীত।'

২.৩ নৈরাজ্যবাদের ঐতিহাসিক রূপরেখা

নৈরাজ্যের শিকড় প্রাচীনকালে প্রোথিত। গ্রীক-রোমান দুনিয়ার রাজনৈতিক সংস্থার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। প্রাচীন গ্রীসের নির্বিকারবাদীরা (Stoic) রাজনৈতিক সংস্থার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁদের সুপারিশ ছিল একটা 'সামাজিক অবস্থা যেখানে মানুষ স্বাধীনভাবে সামাজিকতা ও ন্যায়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারে কাজ করতে পারে।' মধ্যযুগে কিছু ধর্মীয় গোষ্ঠী প্রচার করে যে খ্রিস্টধর্ম একটি মুক্ত ন্যায়নিষ্ঠ সামাজিক জীবন বজায় রাখতে পারে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপের রাজতন্ত্রবিরোধী মতামত একদিক থেকে পরবর্তীকালের সুসংহত নৈরাজ্যবাদী চিন্তা ভাবনার পূর্বসূরি। প্রাকৃত অধিকারের নীতি ও বা রাষ্ট্রের ক্ষমতা সীমিত করে, Adam Smith-এর তুলে ধরা অর্থনৈতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজবাদী নীতি আরো সাম্প্রতিককালে নৈরাজ্যবাদী দর্শনের উৎস।

ধীরে ধীরে নৈরাজ্যবাদের উত্থান ঘটে। কিন্তু এটি উৎসাহী কিছু লোকজনকে আকর্ষণ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের থেকে সমাজে এর প্রভাব লক্ষ করা যায়। চিত্রকর, লেখক, শ্রমিক প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষকে নৈরাজ্যবাদের সমর্থক হতে দেখা যায়। কিছু বিপ্লবী ও রাজনৈতিক নেতাও নৈরাজ্যবাদের পতাকা তুলে ধরেন। উনিশ

শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যে নৈরাজ্যবাদ স্পষ্টই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

উইলিয়াম গডউইন প্রথম নৈরাজ্যবাদী রাজনৈতিক মতাদর্শ গড়ে তোলেন। তাতে প্রুধো, বাকুনিন ও ক্রপটকিন পরবর্তীকালে যা বলেন তার প্রায় সব সূত্রই পাওয়া যায়। গডউইনের তত্ত্ব শুধু যে প্রথম তাইই নয়, দার্শনিক দিক থেকে সব চেয়ে সুসংহত।

গডউইনের জন্ম হয় ১৭৬৫-এ উইস্‌বেক-এ যেটি নর্থ কেম্ব্রিজশায়ারের ক্যাপিটল ছিল। পরে তিনি মেরি উলস্টোনক্রাফ্টকে বিবাহ করেন। তাঁর এক কন্যা ছিল, যিনি পরে ফ্রাঙ্কেনস্টিন রচনা করেন। ১৭৯৩-তে গডউইন Political Justice নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাতেই তিনি প্রথম নৈরাজ্যবাদ প্রসঙ্গে তাঁর মতামত ব্যক্তি করেন। গডউইনের কথা লোকে ভুলে যায়। তাঁর মৃত্যুর পর নৈরাজ্যবাদীদের প্রধান চরিত্র হিসাবে উঠে আসেন পিয়েরে যোসেফ প্রুধো (Pierre Joseph Proudhou)।

রুশ নৈরাজ্যবাদী মিখাইল বাকুনিন (১৮১৪-১৮৭৬) ও পিটার ক্রপট্‌কিনের (১৮৪২-১৯২১) হাতে নৈরাজ্যবাদ একটি পূর্ণ তত্ত্বের আকার পায়। তাঁরা তাঁদের রচনার মধ্যে দিয়ে নৈরাজ্যবাদকে একটি স্পষ্ট রূপ দেন। বাকুনিন অনেক মানুষের কাছে নৈরাজ্যবাদকে পরিচিত করেন। যেসব মানুষ বাকুনিন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ক্রপটকিন ছিলেন। তিনি নৈরাজ্যবাদের উপর অনেকগুলি বই লেখেন। তার মধ্যে আছে—Mutual Aid, Fiels Factories and Workshops ও The Conquest of Bread–১৯৯০-এ Encyclopedia Britannica-র একাদশ সংস্করণে ক্রপটকিন নৈরাজ্যবাদের এগারো পাতার সংজ্ঞা লেখেন। সেই সংজ্ঞার শুরুতে তিনি নৈরাজ্যবাদকে বলেন:

এই নাম দেওয়া হয় এক ধরনের নীতিকে যাতে সমাজে জীবন ও জীবনধারণ সরকারবিহীনভাবে বিবেচনা করা হয়। সেখানে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় আইনের মাধ্যমে নয় বা কর্তৃত্বের মাধ্যমে নয়। সেটি প্রতিষ্ঠিত হয় বিভিন্ন অঞ্চল ভিত্তিক গোষ্ঠী বা কর্মভিত্তিক গোষ্ঠীদের মধ্যে স্বাধীন বোঝাপড়ার মাধ্যমে। এই গোষ্ঠীগুলি সভ্য মানুষের নানা ধরনের চাহিদা পূরণের লক্ষ্য ও উৎপাদন ও ভোগের উদ্দেশ্যে গঠিত হয়।

ক্রপটকিনকে অনুসরণ করে লিও টলস্টয় নৈরাজ্যবাদের ধারণাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যান। টলস্টয় খ্রিস্টান নৈরাজ্যবাদের কথা বলেন, যেখানে চার্চের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করা হয় কিন্তু ঈশ্বরকে নয়। নৈরাজ্যবাদের স্বপক্ষে টলস্টয় বলেন—'নৈরাজ্যবাদীরা সঠিকভাবেই বলেন যে কর্তৃত্ব না থাকলে কর্তৃত্ব থাকার হিংসার চেয়ে বেশি হিংসা সম্ভব নয়।'

বিংশ শতাব্দীর আগমনের সাথে সাথে নৈরাজ্যবাদ আরো শক্তি সঞ্চয় করে। নতুন নতুন লেখন ও আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তার সংজ্ঞা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৮৮৬-এ চিকাগোতে আটজন নৈরাজ্যবাদীর জেল ও ফাঁসি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নৈরাজ্যবাদের স্ফুলিঙ্গের কাজ করে তাকে বাড়িয়ে তোলে।

ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে নৈরাজ্যবাদকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। উনিশ শতকে প্যারি কমিউনের সময় নৈরাজ্যবাদীদের সংগঠনের প্রচেষ্টা; মেক্সিকোর শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবীদের নৈরাজ্যবাদী রিকার্ডো ফ্লরেস মাগন ও এমিলিয়ানো জাপাটার মত বিপ্লবীর সহায়তায় সংগঠিত হওয়া সম্ভব হয়। আর, স্পানিশ বিপ্লব (১৯৩৬-৩৯) নৈরাজ্যবাদীদের সীমিত এলাকায় নৈরাজ্য সৃষ্টির ক্ষমতা প্রমাণ করে।

আধুনিক নৈরাজ্যবাদীরা নৈরাজ্যবাদের যৌক্তিকতা ও ইতিহাস প্রতিষ্ঠা করতে আজও কঠিন পরিশ্রম করে চলে। আজ ক্ষমতার সমস্যার সমাধান খুঁজতে নৈরাজ্যবাদকে ব্যবহার করা হয়—সেটা শুধু রাষ্ট্র ক্ষমতা নয়, সেটা যে কোন সংস্থার ক্ষমতা ও ব্যক্তি এবং সংগঠনের ওপর আধিপত্য প্রয়োগের ধরণ। এল সুজান ব্রাউন-এর মত নৈরাজ্যবাদীরা existential individualism এর ধারন এনেছেন। আবার অন্য নৈরাজ্যবাদীরা anarcho-syndicalism ও শ্রেণি সংগ্রামের উপর আস্থাশীল থেকেছেন। ক্রাস্‌-এর মত ব্যান্ড-এর মাধ্যমে গান বাজনাকে হাতিয়ার করে গোটা বিশ্বে নৈরাজ্যবাদকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। লোরেঞ্জো কমবোয়া এর্ভিন-এর মত নৈরাজ্যবাদীরা বর্ণবিদ্বেষকে চ্যালেঞ্জ

জানানোর নতুন পথ ও পদ্ধতি খুঁজছেন। প্রসঙ্গত বলা ভাল, এর্ভিন একজন প্রাক্তন ব্ল্যাক প্যান্থার। এ ছাড়াও নৈরাজ্যবাদ পরিবেশ বিষয়ে যুক্তি হয়ে গেছে অন্ততঃ কিছুটা হলেও ইকো-এনার্কিস্ট চিন্তাভাবনা ও Earth First এর মত সংগঠনদের উদ্যোগে। এবাদেও নৈরাজ্যবাদীরা নৈরাজ্যবাদকে তত্ত্বে ও কাজে টিকিয়ে রাখা লক্ষ্যে Love and Rage এর মত নৈরাজ্যবাদী সংবাদপত্র চালায় (এই সংবাদপত্রটি মেক্সিকো ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছে)। একে প্রেস (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনে)-এর মত নৈরাজ্যবাদী গ্রন্থ প্রকাশক আছে আর রাজনৈতিক বন্দিদের সহায়ক সংস্থা, যেমন Anarchist Black Cross দেখা যায়।

২.৪ নৈরাজ্যবাদী চিন্তার ভিন্ন ভিন্ন ধারা

উইলিয়াম গজ গডউইনের ফ্রি সোসাইটি। পিয়ারে যোসেফ প্রুদোঁ-র মিউচুয়ালিজম থেকে শুরু করে ম্যাক্স স্ট্যার্নারের ইন্ডিভিজুয়ালিজম—সরকারবিহীন সমাজ কি ধরনের হবে সে বিষয়ে নানা বৈচিত্রময় শিকড় আছে। তবে, নৈরাজ্যবাদী চিন্তার প্রধান দুটি ধারা হল ইন্ডিভিজুয়ালিস্ট এনার্কিস্ট বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ অনুগামী নৈরাজ্যবাদী এবং বিপ্লবী বা কমিউনিস্ট নৈরাজ্যবাদী। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদীরা স্টার্নারের রচনা থেকে অনেকখানি অনুপ্রাণিত। তাঁরা ব্যক্তি ও ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার দাবী রাখেন। ম্যাক্স স্ট্যার্নার জার্মান ছিলেন। তাঁর আসল নাম ছি জোহান্ কাস্পার স্মিথ। তাঁর কাছে ব্যক্তিই একমাত্র বাস্তব ছিল। মানুষ যা যা করে তা নিজের স্বার্থ রক্ষার্থে ও আনন্দের জন্য করে। রাষ্ট্র অস্বাভাবিক; জনস্বার্থের কথা তুলে ব্যক্তির স্বার্থকে অবদমিত করে। স্টার্নার রাষ্ট্রের বিলোপ সাধনের জন্য বিপ্লব বা হিংসায় বিশ্বাসী ছিলেন ন। তার বদলে তিনি প্রতিবাদ, অমান্যতা, তাচ্ছিল্য ও ঠাট্টার উপর নির্ভর করার পক্ষপাতী ছিলেন।

মার্কিন ইন্ডিভিজুয়ালিস্ট এনার্কিস্টদের মধ্যে জোসাইয়া ওয়ারেন (১৭৯৯-১৮৭৪) ও বেঞ্জামিন আর টাকার (জন্ম ১৮৫৪) উল্লেখযোগ্য ছিলেন। ওয়ারেল আত্ম সুরক্ষার প্রাকৃতিক নিয়মকে সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে মানুষ ব্যক্তি সম্পত্তি ও দমনমূলক রাষ্ট্রের কুফলের কারণে কষ্ট পায় তাই এইগুলির বিলোপসাধন প্রয়োজন। এ বিষয়ে তিনি একটি বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী গঠনের কথা বলেন যেটি জোর না খাটিয়ে মানুষকে বুঝিয়ে বিশ্বাস অর্জনের চেষ্টা করবে।

বেঞ্জামিন টাকার্ মনে করেন, 'স্বাধীনতা শৃঙ্খলার সব থেকে উপযোগী মাধ্যমে এবং আনন্দের মূল উপাদান'। সেই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপকে তিনি 'আক্রমণ' মনে করেন। এবং রাষ্ট্রকে তিনি মূল অভিযুক্ত সাব্যস্ত করেন। কর ব্যবস্থা, ন্যায়বিচারের পরিচালন, সামরিক নিরাপত্তা-এ সবই এই 'আক্রমণ' প্রমাণ করে। টাকার রাষ্ট্রের বিকল্প হিসাবে স্বাধীন সংস্থাকে দেখেন—যেখানে ব্যক্তি স্বাধীনভাবে যোগদান করতে পারবে বা যেখান থেকে নিজের ইচ্ছায় চলে যেতে পারবে।

বিপ্লবী বা কমিউনিস্ট নৈরাজ্যবাদীরা সমাজের নৈরাজ্যবাদী পরিবর্তন বৈপ্লবিক ও বিবর্তনমূলক পদ্ধতিতে আনার কথা বলেন। এই ধারার নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য ছিলেন দুই চিন্তাবিদ—মাইকেল বাকুনিন (১৮১৪-১৮৭৬) ও প্রিন্স পিটার ক্রপটকিন (১৮৪২-১৯২১)। বলা যায়, তাঁদের রচনাই নৈরাজ্যবাদের উপর আধুনিক সময়ের সব থেকে সুসংবদ্ধ কাজ।

মাইকেল বাকুনিন ও প্রিন্স পিটার ক্রপটকিনের মত কমিউনিস্ট এনার্কিস্টরা পুঁজিবাদের মার্কসবাদী সমালোচনার সাথে রাষ্ট্র সম্পর্কে নিজেদের সমালোচনা যুক্ত করে এমন এক সমাজ দর্শন তৈরি করেন যেখানে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির স্বার্থ যুক্ত থাকে।

বিপ্লবী নৈরাজ্যবাদের উদ্দেশ্য, বাকুনিনের মতে, হল:

১. মার্কিন জনসাধারণের শিক্ষা

২. মুক্তি

৩. সমাজজীবনের সার্বিক উন্নয়ন

এবং সেই জন্য তিনি মনে করেন নৈরাজ্যবাদীরা রাষ্ট্রের শত্রু। প্রিন্স ক্রপটকিন বৈজ্ঞানিক মানসিকতার পরিচয় দেন। তিনি বিবর্তনমূলক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি গ্রহণ করেন। তিনি মনে করেন মানুষ ও সমাজের অধ্যয়নের জন্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত। তিনি নিজে জীববিজ্ঞান ও মানব ভূগোলের ছাত্র ছিলেন। এর প্রভাব তাঁর নৈরাজ্যবাদী চিন্তায় লক্ষ করা যায়। তাঁর মতে প্রাকৃতিক বিবর্তনর নিয়ম অন্যান্য প্রাণীর মতই মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিভাবে পারিপার্শ্বিক পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়ার প্রক্রিয়া ঘটে তা বোঝা যায়। যে ব্যক্তি বা জীব যত বেশি সহযোগিতা করে নিজেদের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ায় তারা তত বেশি টেকে আর যাদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় নামার প্রবণতা বেশি তারা টিকতে পারেনা। মানব উন্নয়নের প্রাকৃতিক উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পথে মূল বাধা হল রাষ্ট্র, সম্পত্তি ও ধর্মীয় আধিকারিকরা। তাঁর মতে, রাষ্ট্রের না আছে ঐতিহাসিক না আছে প্রাকৃতিক যৌক্তিকতা। বরং সেটি মানুষের সহযোগিতার প্রবৃত্তির বিরোধী।

এনার্কো সিন্ডিকালিস্টরা শিল্পে তৎপরতার উপব জোর দেয়, বিশেষত সাধারণ ধর্মঘটের উপর। এর মাধ্যমেই নৈরাজ্যবাদী বিপ্লব ঘটিয়ে পুরাতন সমাজের খোলসের মধ্যে থেকে নতুন সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হবে, এমনটাই তাঁরা মনে করেন।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উত্তর আমেরিকায় দুটি নতুন ধারা উঠে আসে। এগুলি হল এনার্কো ক্যাপিটালিজম্ ও প্রিমিটিভিজম্। এনার্কো-ক্যাপিটালিজম্ সনাতন উদারনৈতিক ঐতিহ্যের উপর গড়ে ওঠে। সরকারের প্রতি অবিশ্বাসকে আরো এগিয়ে নিয়ে গিয়ে দাবি করা হয় যে মুক্তবাজারই ন্যায় ও নিরাপত্তা দিতে পারে। রাষ্ট্র নিষ্প্রয়োজন ও ক্ষতিকারক। জন জের্জান-এর মত প্রিটিটিভিষ্টরা মনে করেন শুধু রাষ্ট্র নয়, সভ্যতারও বিলুপ্তি প্রয়োজন স্বাধীনতা ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার জন্য। অধিকাংশ নৈরাজ্যবাদীরা মনে করেন যুদ্ধের বিরোধিতা শান্তিবাদ তাঁদের দর্শনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। লিও টলস্টয়ের অনুগামী কিছু নৈরাজ্যবাদী (যদিও সেই শান্তিবাদী নৈরাজ্যবাদীরা টলস্টয়ের মত খ্রিস্টান নৈরাজ্যবাদী নন) নৈরাজ্যবাদী বিপ্লবকে সংগঠিত করার একমাত্র পন্থা হিসাবে অ-হিংস প্রতিরোধকেই বেছে নেন।

সরকাররা নৈরাজ্যবাদীদের ক্ষেত্রে কঠোর অবস্থান নেয়। ১৯০২-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি আইন করে স-ঘোষিত নৈরাজ্যবাদীদের দেশে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ করে। মুসোলিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর পদ্ধতি অবলম্বন করে সব নৈরাজ্যবাদী গোষ্ঠীকে শেষ করে দেন। হিটলারও তাই করেন। ১৯১৭-র রুশ বিপ্লবের নেতাদের নৈরাজ্যবাদ সম্পর্কে আগ্রহ ছিল না এবং তার অধিকাংশ নীতিই বাদ দেন। ইতালি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে জাপান সর্বত্রই নৈরাজ্যবাদী গোষ্ঠী ও আন্দোলনকে দমন করা হয়। ব্যক্তিদের কারারুদ্ধ করা বা মেরে ফেলা হয়। যদিও নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যে খুবই একটা ছোট অংশ হিংসার কথা বলে (অধিকাংশই শান্তির) সবাইকেই কিন্তু জনগণের কাছে দানবিক দেখানো হয়। যদিও এখনও নৈরাজ্যবাদের প্রভাব কিছু বুদ্ধিজীবীর মধ্যে দেখা যায়, সমাজে মৌলিক পরিবর্তন আনার আন্দোলন হিসাবে তার দিন সম্ভবত শেষ হয়ে গেছে।

২.৫ নৈরাজ্যবাদের মূল্যায়ন

নৈরাজ্যবাদের সমালোচকরা বলেন—

- নৈরাজ্যবাদ মূলত অবাস্তব, তাই তাকে গুরুত্ব দেওয়া যায় না।
- নৈরাজ্যবাদীরা শুধু মানুষের সহযোগিতার প্রবৃত্তির উপর জোর দেয়। এটা মানব প্রকৃতির ভ্রান্ত বিশ্লেষণ।

বাস্তব হল, মানুষ সহযোগিতাও করে প্রতিযোগিতাও করে। সংঘাত সহযোগিতার মতই বাস্তব। কিন্তু নৈরাজ্যবাদীরা এটা সঠিকভাবে বোঝেন নি।

- নৈরাজ্যবাদীরা বোঝেননি যে স্বাধীনতা তার সহজাত প্রকৃতি অনুযায়ী সীমিত। সীমাহীন স্বাধীনতা হয় না। একজন মানুষ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না যদি অপরজনের স্বাধীনতায় সীমা না থাকে।
- সামাজিক পরিবর্তন ও পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যে ইতিবাচক ভূমিকা নিতে পারে নৈরাজ্যবাদীরা সেটা দেখেন না।
- রাষ্ট্রের সমালোচক হিসাবে এটি শক্তিশালী তবে বিকল্প দেওয়ায় অনেকটা ভাসা ভাসা।
- তা ছাড়াও, নৈরাজ্যবাদীরা সমাজের জটিল দ্বন্দ্বগুলি সঠিকভাবে মোকাবিলা করতে পারেনা। তারা অধিকাংশই দেখেন না যে স্বার্থ সমান্তরাল ভাবে থাকে না, তাদের মধ্যে সংঘাত হয়।
- নৈরাজ্যবাদীরা মনে করে মানুষ সব সময় যুক্তি দ্বারা চলিত। সেটা ঠিক নয়।

নানা দুর্বলতা সত্ত্বেও নৈরাজ্যবাদের ইতিবাচক দিকগুলিকে যথাযথ স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল যে তারা অতি-ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রের বিপদের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ব্যক্তির উন্নয়ন ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যে স্বাধীনতা প্রয়োজন ও রাষ্ট্রক্ষমতা সীমিত রাখা দরকার তা আমাদের মনে করায়। তারা সঠিকভাবে সামাজিক আন্তঃসম্পর্কের ক্ষেত্রে যে সহযোগিতা, স্বাধীনতা ও যুক্তিসহকারে মানুষকে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমাদের বলে।

সাধারণভাবে বলা যায় নৈরাজ্যবাদ কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক ক্ষমতা, বলপ্রয়োগ যান্ত্রিক জীবন ও স্বাধীনতা খর্ব করার প্রতিবাদের প্রতীক। এটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, আঞ্চলিকতা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও স্বেচ্ছা সংগঠনের পক্ষে দাঁড়ায়। রাজনৈতিক নীতি হিসাবে এটি দাগ কাটতে না পারলেও এর দার্শনিক প্রভাব থেকে গেছে। এটির প্রমাণ হিসাবে দেখা যায় যে, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আজও নৈরাজ্যবাদী সংগঠন আছে। শুধু তাইই নয়, বর্তমানে বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে নৈরাজ্যবাদের গুরুত্ব বেড়েছে।

২.৬ সার সংক্ষেপ

নৈরাজ্যবাদকে অনেক সময়ে রাষ্ট্র শক্তি ও কর্তৃত্বের বিরোধী হিসাবে দেখা হয়। এটি সঠিক নয়। তার মধ্যে আরো অনেক কিছু আছে। নৈরাজ্যবাদের তাত্ত্বিক গঠন বোঝা শুধু প্রয়োজনই নয়, কঠিনও। নৈরাজ্যবাদের ভিন্ন ভিন্ন ধারা থাকায় এটা আরো জটিল হয়ে যায়। নৈরাজ্যবাদের রাষ্ট্রের তথা যে কোন কর্তৃত্বের বিরোধ করা তাকে বহু সমালোচিত করে তোলে, প্রায়শই অযৌক্তিক ভাবে। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে উঠে আসা নৈরাজ্যবাদ আজো বিভিন্ন দিকের সমর্থন পায়—বিশেষত যুদ্ধ বিরোধী গোষ্ঠী ও পরিবেশবিদ্‌দের মধ্যে।

২.৭ নমুনা প্রশ্ন

বড় রচনাত্মক মত প্রশ্ন :

১. নৈরাজ্যবাদের মূল দর্শন ব্যাখ্যা করুন।
২. নৈরাজ্যবাদী চিন্তার বিবর্তনের ধারা তুলে ধরুন।
৩. নৈরাজ্যবাদী চিন্তার মূল ধারাগুলি চিহ্নিত করুন ও তাদের বক্তব্য তুলে ধরুন।

মাঝারি প্রশ্ন :

১. নৈরাজ্যবাদীদের রাষ্ট্রের আদেশ মানায় আপত্তির কারণগুলি ব্যাখ্যা করুন।

২. মাইকেল বাকুনিন-এর মতে, বিপ্লবী নৈরাজ্যবাদীদের লক্ষ্য কী?

৩. নৈরাজ্যবাদী দর্শনের ইতিবাচক অবদান কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. 'এনার্কি' শব্দটা কোন্ ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে?

২. ক্রপট্‌কিন নৈরাজ্যবাদী চিন্তার কোন ধারার সাথে যুক্ত ছিলেন?

৩. কে প্রথম স্পষ্ট নৈরাজ্যবাদী রাজনৈতিক তত্ত্ব গড়ে তোলেন?

২.৮ গ্রন্থসূচী

- C.E.M. Joad, Introduction to Modern Political Theory
- Marshall S. Shatz Tr. and ed., Statism and Anarchy
- Michael Rosen and Jouathan Wolff ed., Political Thought.
- Howard J. Ehrlic, Carol Ehrlich, David DeLeon and Glenda Morris ed., Reinventing Auarchy: What are Auarchista Minking These Days?
- Amal Ray and Mohit Bhattacharya, Political Theory: Ideas and Institutions.

একক ৩ ❐ বিপ্লব

গঠন

এই ইউনিটটিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হবে—

৩.১ উদ্দেশ্য
৩.২ বিপ্লব কী?
৩.৩ বিপ্লব কেন হয়?
৩.৪ বিপ্লব সম্পর্কে তত্ত্ব
৩.৫ বিপ্লবের মার্কসীয় তত্ত্ব
৩.৬ সার সংক্ষেপ
৩.৭ নমুনা প্রশ্ন
৩.৮ গ্রন্থসূচী

৩.১ উদ্দেশ্য

এই ইউনিটটি পড়ে আমরা জানতে পারব :

- বিপ্লব শব্দটার অর্থ জানতে পারব।
- বিপ্লবের সাধারণ কারণসমূহ চিহ্নিত করতে পারব।
- বিপ্লবের লক্ষ্য বুঝতে পারব।
- বিপ্লব সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব জানব।
- বিপ্লব সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণার মূল্যায়ন করতে পারব।

৩.২ বিপ্লব কী?

আলোচনার গোড়াতেই আমাদের বুঝতে হবে—'বিপ্লব কী?' সাধারণ ভাষায় বলা যায়, এর অর্থ হল আমূল পরিবর্তন। সেটা যে কোন ক্ষেত্রে হতে পারে। যথা, ঔষধের ক্ষেত্রে, পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে, রসায়নের ক্ষেত্রে জেনেটিকস্-এর ক্ষেত্রে বা অন্য কোন ক্ষেত্রে। আমরা সামাজিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বিপ্লবের কথা বলতে পারি অথবা তাদের মধ্যে যুক্তভাবেও বলা যায়।

মনে রাখা দরকার পরিবর্তন সব সময়ে সব সমাজে ঘটে চলে। অর্থাৎ, কোন সমাজব্যবস্থাই পরিবর্তনহীন নয়। তবে পরিবর্তনের ধরন ও গতির মধ্যে তফাৎ থাকে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এই চলতে থাকা পরিবর্তন সমাজ শুষে নেয়, প্রায় বোঝাই যায় না। তবে এমনও সময় আসে যখন তা সম্ভব হয় না। তখন বিপ্লব ঘটে। কোন জনগোষ্ঠীর ইতিহাসে মাঝে মাঝে এমন পরিস্থিতি আসে যখন খুব দ্রুত পরিবর্তন হয় এবং তার সঙ্গে খুব জরুরি ভিত্তিতে খাপ খাওয়ানোর প্রক্রিয়াটা চালাতে হয়। সব পরিবর্তনই উপস্থিত ব্যবস্থার উপর চাপ সৃষ্টি করে কারণ প্রচলিত প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের বদল লাগতে পারে। তবে যখন পরিবর্তন অতি দ্রুত হয় তখন চাপ অসহনীয় হতে পারে ফলে সমাজ ভেঙে পড়ার অবস্থায় দাঁড়ায়। সব চেয়ে বড় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সমাজের মূল স্তম্ভগুলির পরিবর্তন লাগে। তাই সব থেকে বড় পরিবর্তনগুলো

বিপ্লব। রাজনৈতিক অর্থে, যখন একই সাংবিধানিক ব্যবস্থার মধ্যে আইন সংগতভাবে একটি গোষ্ঠী থেকে অন্য এক গোষ্ঠী ক্ষমতা নেয় তাকে বিপ্লব বলা হয় না। কিন্তু যখন সংবিধান ও সরকার দুইই নতুন করে ঢেলে সাজানো হয় তখন বিপ্লব ঘটে। সাংবিধানিক পরিবর্তনের পাশাপাশি যদি আমূল সামাজিক পরিবর্তনও হয় তা হলে বিপ্লব আরো সর্বাত্মক। গত তিনশো বছরের মধ্যে যে বড় বড় বিপ্লব ঘটেছে সেগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ১৭৭৫-১৭৮৯ এর আমেরিকান বিপ্লব সরকার ও সংবিধানের পরিবর্তন আনে, ১৬৪০-১৬৮৮ এর ইংল্যান্ডের বিপ্লব সংবিধান ও সরকারের পরিবর্তন আনার সাথে সাথে চার্চ ও রাষ্ট্রের সম্পর্কের বিষয়টিও স্থির করে এবং একটি নতুন বাণিজ্যিক শ্রেণির আধিপত্য স্বীকৃত হয়। ফরাসি বিপ্লব যেটি ১৭৮৯-এ শুরু হয় সেটি ইংল্যান্ডের বিপ্লবের চেয়েও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমাজে আরো বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করে। আর, ১৯১৭-র রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসে সমাজে সব থেকে আমূল পরিবর্তন আনে।

Word Net Dictionary-র সংজ্ঞা অনুসারে বিপ্লব

- শাসিতদের দ্বারা সরকারের উচ্ছেদ
- চিন্তা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন; 'শিল্প বিপ্লব সামাজিক বিপ্লবও ছিল'।

অধিকাংশ সংজ্ঞাই বিবরণমূলক বা নানা ভাবনার সমন্বয়। অর্থাৎ বিপ্লব কী দাঁড়িয়েছে তার বিবরণ থেকে শুরু করে। কার্ল গ্রীওয়াল্ডকে উদ্ধৃত করে ই জে হবস্‌বম্ ['Revolution', Rosemary H. T. O'Kane সম্পাদিত 'Revolution critical Couccrts in Political Science.' খণ্ড ১, Routledge, লন্ডন, ২০০০, পৃ. ৮৫] লেখেন:

> এখনও পর্যন্ত বিপ্লব সেই ঐতিহাসিক ঘটনার ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয় যেখানে তিনটি বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটে। প্রথম, একটি প্রক্রিয়া যেটি স-হিংস ও হঠাৎ ধাক্কা দেয়, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও আইনের ক্ষেত্রে বিশেষত যেন ভেঙে বেরিয়ে যাওয়া বা উল্টে যাওয়া। দ্বিতীয়ত আছে একটি সামাজিক অংশ। এটি গোষ্ঠী বা জনগণের আন্দোলনে বা তার খোলামেলা প্রতিরোধে দেখা যায়। অবশেষে, একটি কর্মসূচি বা মতাদর্শের তাত্ত্বিক অংশ। এটি পুনর্গঠন ও উন্নয়নের ইতিবাচক লক্ষ্য নির্ধারণ করে।

এর সঙ্গে হবস্‌বম্ জনগণের সংগঠিত হওয়ার গুরুত্ব উল্লেখ করেন ও বলেন যে সেটি বাদে খুব কম ইতিহাসবিদ্‌ই বিপ্লবকে চিহ্নিত করতেন।

হ্যানা আরেন্ড On Revolution-এ (নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৩) বলেন, 'বিপ্লবকে যেভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হোক, সেগুলি নিছক পরিবর্তন নয়।' এখান থেকে শুরু করে Chalmer Johnson 'Revolution and the Social System' এ বলেন 'সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে বিপ্লব এক ধরনের পরিবর্তন; যে কোন পরিবর্তন নয়, তবুও পরিবর্তন।'

জন ডান [Modern Revolutions, Cambridge University Press, লন্ডন, ১৯৭২, পৃ.৩] লিখেছিলেন—

'বিপ্লব প্রকৃতির বাস্তব ঘটনা। প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার সমতুল্য। প্রচণ্ড শক্তি মুক্তি পায়.. নৈতিকতার সঙ্গে সম্পর্কহীন, অনিবার্য। তার পথে যা পড়ে সব কিছু ধ্বংস করে... বাধা দেওয়া অর্থহীন, এবং দাঁতো-র কথায় তা পরীক্ষা করতে যাওয়া অবাস্তব।'

বিপ্লবের সব সময়েই প্রায় দুটো দিক প্রকাশ পায়। একটি, সুন্দর বিপ্লব-পরবর্তী সময়ের মানবিক স্বপ্ন। অপরটি অমার্জিত, সংহিস বাস্তব যেটি কিছুটা আতঙ্কের সৃষ্টি করে।

বিপ্লব শাসকের শাসন করার অক্ষমতা প্রকাশ করে। তবে, আরো অনেক পরিস্থিতি আছে যেখানে শাসক শ্রেণি রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে অক্ষম হয় কিন্তু বিপ্লব ঘটেনা।

৩.৩ বিপ্লব কেন হয়?

বিপ্লবের কারণ তার সংজ্ঞার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। চারটি বিপ্লবের সাদৃশ্য বিবেচনা করে ক্রেন ব্রিন্টন The Anatomy of Revolution (১৯৬৫)-এ বিপ্লবের একটি তত্ত্ব গড়ে তোলেন। বিপ্লবগুলি হল ইংল্যান্ডের (১৬৪০ঃ, মার্কিন (১৭৭৬), ফরাসি (১৭৮৯) ও রুশ (১৯১৭)। তাঁর মূল প্রতিবেদন হল—

- অর্থনৈতিক সংকট সরকারকে অপদার্থ করে
- অপদার্থতা গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠীর অগ্রগতির পথে বাধা হওয়ায় হতাশা সঞ্চার করে।
- অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।
- বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গ ত্যাগ ও সংগঠিত হওয়ার মাধ্যমে অসন্তুষ্টরা রাজনৈতিক ভাবে সক্রিয় হয়।
- সরকার অসফলভাবে সংশোধন আনার প্রচেষ্টা চালায়।
- শ্রেণি সংগ্রাম জোরালো হয়।
- পরিস্থিতির মোকাবিলা করার পদ্ধতি নিয়ে শাসক শ্রেণির মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি হয়।
- সরকারের কার্যকলাপ ক্রমেই আরো বেশি অসংগত হয়ে ওঠে। সংকট বৃদ্ধি পায়।
- এই পর্যায়, ব্রিন্টনের মতে, বিপ্লব বাতাসে থাকে। লোকে তার কথা আলোচনা করে এবং তখন বিপ্লব ঘটে।

লুই গটসচক্ 'Causes of Revolution'-এ বিপ্লবের কারণ হিসাবে বলেন—

'(১) একটি পরিবর্তনের দাবি সেটার কারণ (ক) ব্যাপক প্ররোচনা ও (খ) ঐক্যবদ্ধ জনমত। ও (২) পরিবর্তন সম্পর্কে আশাবাদী, যেটির কারণ আবার (ক) একটি জনপ্রিয় কর্মসূচি ও (খ) বিশ্বস্ত নেতৃত্ব। তবে এই চারটি কারণও কিন্তু এক সাথে কার্যকর হলেও নিজে থেকে বিপ্লব আনতে পারেনা। এগুলি দূরবর্তী কারণ..। পাঁচটি কারণের মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল সংরক্ষণপন্থি শক্তির দুর্বলতা। এটি বিপ্লবের প্রয়োজনীয় প্রত্যক্ষ কারণ। টেড্ গুড্ Why Men Rebel (১৯৭০)-তে বলেন যে, তুলনামূলকভাবে বঞ্চিত হওয়ার ব্যাপক ধারণা অসন্তোষ সঞ্চার করে। সেই অসন্তোষের রাজনীতিকরণ হয়, যা রাজনৈতিক হিংসার সৃষ্টি করে।

চার্লস টিলি [From Mobilization to Revolution, (১৯৭৮)] ও থিডা স্কচ্পল [States and Social Revolutions (১৯৭৯)] যে কারণগুলিকে গুরুত্ব দেন সেগুলি হল—রাষ্ট্র দুর্বল হওয়া, ব্যাপক বিরোধিতার সৃষ্টি হওয়া ও বিপ্লবী শক্তির সাফল্যের সম্ভাবনা। কোন ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে এই কারণগুলি উঠে আসে সেগুলির উপর জোর দেওয়া হয়।

১৯৬৬ তে Chalmer Johnson-এর গুরুত্বপূর্ণ কাজ Revolutionary Change প্রকাশিত হয়। ব্রিন্টনের The Anatomy of Revolution-এর এক বছর পর। তিনি বিপ্লবকে অ-সামাজিক বলে আখ্যা দেন। এই ধরনের ঘটনা সেখানেই ঘটে যেখানে মূল্যবোধের সহমত আর নেই। অর্থাৎ যে সমাজে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। বিপ্লব ঘটে এবং সফল হয় কারণ রাজনৈতিক নেতৃত্ব তার কাজ করতে ব্যর্থ হয়।

জনসন্ মনে করেন বিপ্লব ঘটার প্রয়োজন নেই, এবং সফল হওয়ারও দরকার নেই। লেনিন বলেন, 'যখন তীব্র শ্রেণিসংগ্রামের দ্বারা চালিত লক্ষ লক্ষ মানুষ শ্রেণি সচেতনতা, ইচ্ছাশক্তি আবেগ ও স্বপ্ন বলে সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে তা প্রয়োগ করে তখন বিপ্লব ঘটে।' [Left Wing Communism: An Infantile Disorder.]

তাঁর কাছে বিপ্লবের মূল নীতি হল—

> 'বিপ্লবের পক্ষে এটাই যথেষ্ট নয় যে শোষিত অবদমিত জনগণ মনে করে আগের মত অবস্থায় থাকা সম্ভব নয় এবং পরিবর্তন দাবি করে। বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন সেই পরিস্থিতি যেখানে শোষণকারীরা আর আগের মতন করে আর বাঁচতে বা শাসন করতে পারবে না। একমাত্র যখন নিম্নবর্গরা আগের

পথটা চায় না আর উচ্চশ্রেণিরা আগের প্রক্রিয়ায় চালাতে পারেনা—শুধু তখনই বিপ্লব সফল হতে পারে।'

আন্দোলনের প্রক্রিয়ায় সমাজের কিছু সমস্যা সমাধান করতে পারার দাবি থেকেই বিপ্লবী এলিট্-এর বৈধতা সৃষ্টি হয়।

জ্যাক গোল্ডস্টোন (Revolution and Rebellion in the Early Modern Wrold, ১৯৯১) বিপ্লবের উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যার সমন্বয়ে বিপ্লব হয় সেগুলিকে চিহ্নিত করেন। প্রথম, রাষ্ট্রের সম্পদের সংকট। দ্বিতীয়ত, এলিটদের মধ্যে বিভাজন। রাষ্ট্রের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ায় এলিটরা আলাদা আলাদা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে প্রতিটি গোষ্ঠীই নিজে সরকার নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা চালায়। তৃতীয়ত ব্যাপক আকারে জনগণের সংগঠিত হওয়ার সম্ভাবনা। যখন এই তিনটি পরিস্থিতি এক সাথে উপস্থিত তখন গোল্ডস্টোনর মতে, বিপ্লবী সংকট সৃষ্টি হয়।

৩.৪ বিপ্লব সম্পর্কে তত্ত্ব

কতকগুলি মানদণ্ডের ভিত্তিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা বিপ্লবকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেন। সেগুলি—

- বিপ্লবের উদ্দেশ্য
- অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ও প্রকৃতি
- রণকৌশল
- ব্যাপ্তিকাল
- জনগণের অংশগ্রহণের মাত্রা
- আদর্শগত অঙ্গীকারের মাত্রা

হ্যারল্ড ল্যাসওয়েল ও আব্রাহাম কাপ্লান বিপ্লবকে তিনভাগে ভাগ করেন—প্রাসাদ বিপ্লব, রাজনৈতিক বিপ্লব ও সামাজিক বিপ্লব। স্যামুয়েল হান্টিংটন চার ধরনের যুদ্ধের কথা বলেন—অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ, বিপ্লবীক্ষমতা দখল, সংশোধন মূলক ক্ষমতাদখল ও প্রাসাদ ক্ষমতা দখল।

১৯৭২-র Journal of Political Science এ মাইকেল ফ্রিম্যান বিপ্লবের তত্ত্বের উপর একটি রিভিউ নিবন্ধে বলেন যে বিপ্লবের তত্ত্বের ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসের বিভিন্ন ধারার সাথে মেলে। প্রথম পর্যায় ক্লাসিকাল তাত্ত্বিকদের প্লেটো থেকে মার্কস্। দ্বিতীয় পর্যায় মার্কস থেকে ওয়েবার—এমন একটা সময় যখন তাত্ত্বিকরা মূল্য নিরপেক্ষ জ্ঞানের সন্ধানে চালাচ্ছিলেন এবং পরীক্ষামূলক তত্ত্ব গড়েছিলেন। এই সময়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সরোকিন, এডুয়ার্ডস, পেটি ও ব্রিন্টন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তৃতীয় পর্যায় 'functionnalism' বা ক্রিয়াবাদের এবং 'quatification' বা পরিসংখ্যাকরণের। এবং বিপ্লবের তত্ত্বের উপর এর প্রভাব পড়ে।

জ্যাক এ গোল্ডস্টোন বিপ্লবের গবেষণার চার 'Generation'-এর কথা বলেন। প্রথমটি হল ১৯০০-১৯৪০ এর তাত্ত্বিকরা। তাঁদের দৃষ্টি ছিল মূলত বিবরণমূলক; বিপ্লবের ব্যাখ্যা সামাজিক মনোবিজ্ঞান ঘেঁষা। যথা, চার্লস এ এল্উড্ বা পিটিরিম সরোকিন। দ্বিতীয় Generation তাত্ত্বিকদের দেখা যায় ১৯৪০-১৯৭৫-এ। বিপ্লব কেন ও কখন হয় সে বিষয়ে তাঁরা বিস্তারিত তত্ত্ব গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালান। তাঁদের বিশ্লেষণ জটিল সামাজিক ব্যবহার বিষয়ক তত্ত্বের উপর দাঁড় করানো হয়। মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও রাজনৈতিক আলোচনা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। তাঁদের মধ্যে আছেন টেড রবার্ট গুড়, চ্যামার, জনসন, নীল স্মেলসার, চালর্স টিলিও স্যামুয়েল হান্টিংটন। দ্বিতীয় Generation তাত্ত্বিকদের সমালোচনা করে তৃতীয় Generation উঠে আসে এমনটাই দাবি করেন গোল্ডস্টোন। এটি হয় ১৯৭৫

থেকে। একই ধরনের চিন্তা দেখা যায় পেজ ট্রিমবার্গার থিডা স্কচপল ও আইসেনস্টাট-এর মধ্যে। ১৯৮০-র শেষ থেকে নতুন ধাঁচের তাত্ত্বিক কাজ তৃতীয় প্রজন্মের তত্ত্বগুলির আধিপত্যকে প্রশ্নের মুখে ফেলে। এছাড়া নতুন তৈরি হওয়া বৈপ্লবিক পরিস্থিতি পুরাতন তত্ত্বগুলিকে ধাক্কা দেয় কারণ সেই তত্ত্বগুলি এইসব বৈপ্লবিক অবস্থার যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে পারছিল না।

৩.৫ বিপ্লবের মার্কসীয় তত্ত্ব

বিপ্লবের মার্কসীয় তত্ত্ব সম্ভবত আজ পর্যন্ত উঠে আসা সব থেকে স্পষ্ট বৈপ্লবিক চিন্তা। উনিশ শতকের পুঁজিবাদী উৎপাদনের অমানবিক দিকটার ফলে মার্কস তাঁর জীবনের সমস্ত শক্তি দিয়ে সে ব্যবস্থা উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে আন্দোলন করেন। বিপ্লবের উপর তাঁর ফোকা সম্ভবত উনিশ শতকের প্রথমার্ধের ইউরোপের বিপ্লবী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের মধ্যে অবিরাম লড়াই থেকে সৃষ্ট।

মার্কসীয় চিন্তায় সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ধারণা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় সমাজের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন আসবে। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বুর্জোয়া বিপ্লব উচ্ছেদ করে পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠা করবে। এই পর্যায়ের শ্রেণি সংগ্রামের ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করে পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হবে—মাঝে শ্রমিক শ্রেণির একনায়কতন্ত্রের একটা পর্যায় থাকবে।

মার্কসবাদী চিন্তায় প্রাকৃতিক বিবর্তনের নিয়মেই সমাজে একদিন শ্রমিক শ্রেণির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। তবে, মার্কস বৈপ্লবিক কর্মসূচিও প্রস্তাব করেন। পুঁজিবাদী শ্রেণিকে যে বিপ্লব উচ্ছেদ করবে সেটিকে অন্য সব বিপ্লব থেকে পৃথক মনে করা হয়। এই বিপ্লব অবদমিত সংখ্যাগরিষ্ঠকে ক্ষমতায় আনবে। যে অবধারিত সামাজিক বিপ্লবের কথা মার্কস বলেন সেটির লক্ষ্য সমস্ত শোষণ ও সামাজিক বৈষম্য দূর করা। বিপ্লব হবে শ্রেণি সংগ্রামের অনিবার্য সফল। বিপ্লবের প্রথম কাজ হবে শ্রমিক শ্রেণি দ্বারা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল। রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট সমাজে পৌঁছনো সম্ভব হবে না। মাঝে একটা সময়ে শ্রমিক শ্রেণির একনায়কত্ব প্রয়োজন হবে। সেই সময়ে মানুষের মন থেকে পুঁজিবাদী মানসিকতা দূর করা প্রয়োজন হবে।

লেনিন মার্কসের বিপ্লব সম্পর্কিত চিন্তাভাবনাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যান। এটা মার্কসবাদী চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর অন্যতম বড় অবদান। লেনিনের মূল আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু ছিল রুশ পরিস্থিতি আর সেই বিষয়ে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্কসীয় বিপ্লবী রণকৌশল গড়ে তোলেন। ১৯০৫-এ Two Tactics-এ লেনিন 'শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণির বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের' কথা বলেন।

বৈপ্লবিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে লেনিন বিপ্লবী দলকে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রণী ভূমিকা দেন। সেটিই একমাত্র শ্রমিক শ্রেণির হয়ে কথা বলবে ও শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে বিপ্লবী চেতনা নিয়ে আসবে। দলের সংগঠনের ভিত্তি হবে 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা'। 'গণতান্ত্রিক' কারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে পর্যন্ত সব সদস্য আলোচনায় অংশ নিতে পারবে; আর, 'কেন্দ্রিকতা' কারণ সংগঠনের লাইনের উপরের দিকে একবার সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে নীচের দিকের সদস্যরা তা মানতে বাধ্য থাকবে। এই ধাপে ধাপে সংগঠিত দল বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে।

বললে হয়তো ভুল হবে না যে রুশীদের মধ্যে দিয়ে চীনারা মার্কসবাদকে পায়। অক্টোবর বিপ্লব চীনাদের ওপর প্রভাব ফেলে। রুশ স্বৈরতন্ত্রকে উচ্ছেদ করায় বলশেভিক সাফল্য অনেক চীনা প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীকে অনুপ্রাণিত করে। সাধারণ ভাবে পাশ্চাত্যের দর্শন সম্পর্কে মোহভঙ্গ হওয়ায় চীনা বুদ্ধিজীবীরা বেশি করে মার্কসবাদের দিকে ঝোঁকে। ১৯২১-এ স্যাংহাই-তে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। তার তেরোজন সদস্যরে মধ্যে মাও জেডং ছিলেন।

১৮৯৩-তে দক্ষিণ কেন্দ্রীয় চীনের হুনান অঞ্চলের শাওশান-এ মাও জেডং-এর জন্ম। শুরুতে তিনি আমূল সংস্কারবাদী

জাতীয়তাবাদী ছিলেন, পরে মার্কসবাদী হয়ে চীনের কমিউনিস্ট দলকে জয়ের পথে নিয়ে যান। মাওবাদকে লেনিনবাদ ও সনাতন কিছু চীনা চিন্তাভাবনার সংমিশ্রণ হিসাবে দেখা যায়। মাওবাদের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল—

প্রথম, কৃষকদের উপর গুরুত্ব দেওয়া। চীনা কমিউনিস্ট দল মূলত কৃষক দল হিসাবে গঠিত হয়। আর, বিপ্লবে কৃষকদের সক্রিয় সহযোগিতা আবশ্যক মনে করা হয়।

দ্বিতীয়ত, চেতনার উপর মাওবাদ গুরুত্ব আরোপ করে। মার্কসবাদ মূলত শ্রমিক শ্রেণির নীতি ছিল। ফলে কৃষকদের মধ্যে প্রলেটারিয়ান বা সামাজিক চেতনা গড়ে তোলা প্রয়োজন ছিল। পুঁজিবাদ পর্যায়কে সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ের সঙ্গে যুক্ত করায় একটা বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়। ফলে উঠে আসে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ধারণা।

তৃতীয়ত, গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে মাও-এর নীতি, যা ১৯৩০-এ গড়ে তোলেন। বলা যায়, মাও-এর গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে রণনীতি মার্কসবাদের ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান। অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করার দীর্ঘমেয়াদী কৌশল। এ বিষয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ রচনার মধ্যে আছে Problem of Strategy in Gueraila War Against Japan ও On Protracted War। দুটিই ১৯৩৮০-এ রচিত।

মনে রাখা দরকার বিপ্লব সম্পর্কে মার্কসীয় তত্ত্ব কোন বিশেষ দেশ বা বিশেষ কতকগুলি দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সর্বত্রই, আগে বা পরে, বৈপ্লবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার কথা। সে দিক থেকে মার্কসীয় তত্ত্ব আন্তর্জাতিক। প্রথমবার সব জায়গার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক দেখা হয়। অর্থাৎ, মার্কসীয় দৃষ্টিতে বিপ্লবকে দেখতে হলে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

৩.৬ সার সংক্ষেপ

বিপ্লবের অর্থ সার্বিক পরিবর্তন। মানব সমাজের আদিকাল থেকে ঘটে চলেছে। নানাভাবে এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়। গবেষকরা বিপ্লবকে বোঝার চেষ্টা করেন। আর তার ফলে, বিপ্লবগুলোকে বিভিন্ন ভাবে শ্রেণিবদ্ধ করার প্রচেষ্টা হয়। বিপ্লবীরা তাঁদের দিক থেকে বিপ্লব সফল করার লক্ষ্যে নিজেদের মত করে তার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেন। বিপ্লবের লক্ষ্য ও পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন থেকেছে। অন্যতম বিস্তারিতভাবে গড়ে তোলা বৈপ্লবিক তত্ত্ব হল বিপ্লবের মার্কসবাদী তত্ত্ব। এটি বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

৩.৭ নমুনা প্রশ্ন

বড় রচনাত্মক প্রশ্ন :

১. সাধারণত কী কী কারনে বিপ্লব হয়?
২. বিপ্লব সমাজের উপর কী প্রভাব ফেলে?
৩. বিপ্লবের মার্কসীয় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন।

মাঝারি প্রশ্ন :

১. বিপ্লব কাকে বলে?
২. বিপ্লবগুলোকে কিভাবে—শ্রেণীবদ্ধ করা যায়?
৩. বিপ্লব সম্পর্কে লেনিনের ধারনার উপর একটি টীকা লিখুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. স্টেড গুড়ের মতে, রাজনৈতিক হিংসার কারণ কী?

২. Two Tactics-এর লেখক কে?

৩. মার্কসীয় রণকৌশলের অংশ হিসাবে কে গেরিলা যুদ্ধের কৌশল গড়ে তোলায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন?

৩.৮ গ্রন্থসূচী

১. A. S. Cohan, Theories of Revolution: An Introduction.

২. James Defronzo, Revolutions and Revolutionary Movements.

৩. J. M. Dunn, Modern Revolutions: An Introduction to the Analysis of a Political Phenomenon.

৪. Barbara Salert, Revolutions and Revolutionaries.

৫. Jack A. Goldstone et.al. Revolutions of the Late Twentieth Century.

৬. Theda Skocpol, States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and China.

৭. Leslie Lipson, The Great Issues of Politics.

একক ৪ ☐ সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ

গঠন

এই ইউনিটটিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হবে—

৪.১ উদ্দেশ্য
৪.২ ভূমিকা : সর্বনিয়ন্ত্রণবাদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত
৪.৩ সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ কী?
৪.৪ সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ শাসনের উত্থানের কারণ
৪.৫ সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য
৪.৬ সার সংক্ষেপ
৪.৭ নমুনা প্রশ্ন
৪.৮ নির্বাচিত গ্রন্থ

৪.১ উদ্দেশ্য

এই ইউনিটটি পড়ে আমরা জানতে পারব :

- সর্বনিয়ন্ত্রণবাদের উত্থানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত।
- সর্বনিয়ন্ত্রণবাদের বিষয়বস্তু কী?
- সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য।
- সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ প্রসঙ্গে নানা বিতর্ক।
- সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ ও কর্তৃত্ববাদের পার্থক্য

৪.২ ভূমিকা: সর্বনিয়ন্ত্রণবাদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সর্বনিয়ন্ত্রণবাদের উদ্ভব ঘটে। তবে ধারণা হিসাবে এটি ধরা দিতে চায় না; সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন হয়। অনেক সময়েই শব্দটিকে সাধারণভাবে মূল্যবোধের সঙ্গে যুক্ত করে দেখা হয়,স্বচ্ছ বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে নয়।

যদিও প্রায়শই সর্বনিয়ন্ত্রণবাদকে একনায়কত্ব হিসাবে দেখা হয়, সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ কিন্তু কোন সাধারণ একনায়কত্ব নয়। সনাতন একনায়কত্বের থেকে আলাদা। সর্বনিয়ন্ত্রণবাদে রাষ্ট্রের ক্ষমতার কোন সীমা নেই। রাষ্ট্র সব কিছুকে গিলে ফেলে। সর্বক্ষণ প্রচারের মাধ্যমে মতানয়ন করে সম্ভাব্য মতদ্বৈত মুছে দেয়। এটাকে বড়জোর এক বিশেষ ধরনের অতি উগ্র একনায়কত্ব মনে করা যেতে পারে।

Totalitarianism শব্দটির উৎপত্তি সম্ভবত ইতালিতে। কিছু গবেষকের মতে ফরাসি ভাষা থেকে ইতালিয়ান ভাষায় এটি আসে। অবশ্য ভাষা অভিধানগুলি দাবি করে যে ইতালিয়ান ভাষা থেকে এটি ফরাসি ভাষায় আসে।

২২ জুন ১৯২৫-এ মুসোলিনি একটি বক্তৃতায় শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করেন। সেখানে, অবশিষ্ট বিরোধীদের সমালোচনায় তিনি 'La nostra Feroce volunta totalitaria, নিজেদের তথা ফ্যাসিস্টদের 'তীব্র টোটালিটেরিয়ান ইচ্ছা'র কথা বলেন। সেই একই বছরে আগে Giovanni Gentile (যিনি ফ্যাসিবাদের তত্ত্বের স্বীকৃত দার্শনিক হন) ফ্যাসিবাদ প্রসঙ্গে

শব্দটি ব্যবহার করে একটি সার্বিক জীবনের ধারণার কথা বোঝান। পরবর্তী কয়েক বছরে শব্দটি মুসোলিনির একটি প্রিয় শব্দে পরিণত হয়, এবং তিনি প্রায়ই, তাঁর দাবিতে, তাঁর সৃষ্ট ব্যবস্থাকে 'Lo stato totalitario', অর্থাৎ টোটালিটেরিয়ান রাষ্ট্র বলে উল্লেখ করেন।

গোড়াতে Totalitarianism যে অর্থে ব্যবহার হয়েছিল আজ তা না হলেও সে সময়ের পরিস্থিতি বোঝার জন্য তা জানা প্রয়োজন। সেটি Giovanni Gentile এর দর্শনের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের ধারণা। তাঁর মতে, টোটালিটেরিয়ানজিম্ এমন একটি রাষ্ট্রীয় অবস্থা যেখানে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে হোক, পুর সমাজের সব কাজ শেষপর্যন্ত রাষ্ট্র সমতুল ভাবে করা হয়। অর্থাৎ, এই ধরনের সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ উদারনীতিবাদ ও সমাজতন্ত্র দুই-এরই বিপক্ষের মতবাদ।

৪.৩ সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ কী?

আজ সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ বলতে সাধারণত সেই ধরনের সরকার ব্যবস্থা বোঝায় যেখানে জনপ্রতিনিধিত্ব নেই এবং একটি রাজনৈতিক দল একনায়কত্বের ভিত্তিতে ক্ষমতায় থাকে। রাজনৈতিক দল ও তার নীতি এবং সেই দেশের সরকারের নীতির মধ্যে এতখানি সাদৃশ্য যে সরকার ও দল প্রায় একটি একক।

Cambridge International Dictionary of English সর্বনিয়ন্ত্রণবাদকে চিহ্নিত করে—

- এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে, যাঁরা ক্ষমতাসীন তাঁরা পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকেন এবং মানুষকে স্বাধীনভাবে তাঁদের বিরোধিতা করতে দেন না।
- সর্বনিয়ন্ত্রণাদী ব্যবস্থায় সবাই সবাইকে সন্দেহ করে। এমকি নিজেদের পরিবারভুক্ত ও বন্ধুরা।

এছাড়াও, নিম্নলিখিতভাবে এটাকে চিহ্নিত করা যায়—

- স্বৈরতান্ত্রিক শক্তির কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ।
- রাজনৈতিক ধারণা যে নাগরিক সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী রাষ্ট্র সমাজের সব ক্ষেত্রে নিজেকে যুক্ত করে, এমনকি নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়। এ ধরনের সরকার শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়কেই নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে না, জনগণের বিশ্বাস, মূল্যবোধ আচার আচরণ সব কিছুই নিয়ন্ত্রণে আনে। অর্থাৎ সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভেদের সীমারেখা লুপ্ত হয়। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্যই সমাজের মূল বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আর, বর্তমান সমাজকে আদর্শ সমাজ দ্বারা প্রতিস্থাপন করা রাষ্ট্রের লক্ষ্য হয়। বলাবাহুল্য, সরকারের মতাদর্শের ভিত্তিতে আদর্শ সমাজ কী তার ধারণার তফাৎ হয়।

জর্জ এইচ স্যাবাইন তাঁর গ্রন্থ A History of Political Theory-তে বলেন যে একটি সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের জাতীয় শক্তিবৃদ্ধি করতে সরকারকে সমস্ত ব্যক্তি ও সংগঠনর ক্রিয়া ও স্বার্থকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। অর্থাৎ সর্বনিয়ন্ত্রণবাদের তত্ত্ব অনুসারে সরকার শুধু সর্বশক্তিমান নয়, তার কাজের পরিধি অসীম। কোন কিছুই তার প্রক্রিয়ারের বাইরে নয়। প্রতিটি স্বার্থ ও মূল্যকে সে নিয়ন্ত্রণ করে—অর্থনৈতিক, নৈতিক বা সাংস্কৃতিক। সরকারের অনুমোদন ছাড়া কোন সংগঠন (তা রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন বা সাংস্কৃতিক সংস্থাই হোক) থাকতে পারবে না। সরকারের অনুমোদন ছাড়া কোন কাজ, নির্মাণ, বা শিল্প হতে পারবে না; কোন কিছুর প্রকাশনা বা জনসভাও সম্ভব নয়। এমনকি প্রচারের মাধ্যমে করার লক্ষ্যে অবসর ও বিনোদনও নিয়ন্ত্রিত হবে।

রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে সর্ব নিয়ন্ত্রণবাদ একনায়কত্ব বোঝায়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বা স্থানীয় সরকারের কোন স্থান নেই। সংসদ বা স্বাধীন বিচারব্যবস্থার মত উদারনৈতিক রাজনৈতিক সংস্থা প্রকৃতপক্ষে ধ্বংস করা হয়। নির্বাচন নেহাতই লোক দেখানো, নিয়ন্ত্রিত।

স্যাবাইনের মত, 'সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সমস্ত দিক সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রণ করে—ব্যক্তিগত

বা স্বেচ্ছা পছন্দর কোন স্থান নেই।' বাস্তব ক্ষেত্রে এর অর্থ হল অসংখ্য সংগঠনের বিলোপ সাধন—যথা ট্রেড ইউনিয়ন, শিল্প সংস্থা ইত্যাদি যেগুলি দীর্ঘদিন ধরে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাজের সাথে যুক্ত থেকেছে, সেগুলি হয় মুছে দেওয়া হয় বা রাষ্ট্র অধিগ্রহণ করে নতুন করে ঢেলে সাজায়।

The Great Issues of Politics-এ লেসলি লিপসন বলেন, রাষ্ট্রের আয়তন সর্বনিয়ন্ত্রণবাদের কাছে গুরুত্বহীন।... সেখানে বিশেষাধিকার, অদ্বৈতবাদ, কর্তৃত্ববাদ ও ক্ষমতা একীকরণের মেলবন্ধন। যখন এই সবগুলি যুক্ত হয় তখন তার মোট ফল দাঁড়ায় সমাজের ওপর রাষ্ট্রের পূর্ণ আধিপত্য ও রাষ্ট্রের উপর মুষ্টিমেয় কয়েকজনের।

৪.৪ সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী শাসনের উত্থানের কারণ

সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী প্রবণতার কোন একটি কারণ নেই। প্লেটো, রুশো ও মার্কস-এর Collectivist রাজনৈতিক তত্ত্বে এর তাত্ত্বিক শিকড় থাকতে পারে। তাকে, সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী ধরনের সরকারের উদ্ভব সম্ভবত আরো বেশি করে ঐতিহাসিক কারণের সঙ্গে যুক্ত। যথা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরের বিশৃঙ্খলা ইতালি ও জার্মানিতে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী সরকারের উত্থান ঘটতে দিল বা তা উৎসাহিত করল; আবার, আধুনিক অস্ত্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে সেই সরকার তাদে ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে ও সুসংহত করতে পারল।

৪.৫ সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য

উন্নত প্রযুক্তি ও যোগাযোগের ফলে, সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী রাষ্ট্র ব্যক্তিজীবনের সমস্ত দিকই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সবকিছু নিয়ন্ত্রণের আওতায় আসে, যথা অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও খেলাধুলা। 'চিন্তা' একই সঙ্গে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটা ধরণ ও পদ্ধতি হয়ে দাঁড়ায়।

১৯৫১তে হ্যানা আরন্ডে (১৯০৬-১৯৭৫) তাঁর গ্রন্থ The Origins of Totalitariansim-এ totalitarianism শব্দটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন। উনি দেখান যে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ বেশ নতুন এবং বিংশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য। সর্বনিয়ন্ত্রণবাদের মূল বিষয়, তাঁর মতে, আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আতঙ্কের মাধ্যম একটি মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করা। উনি পৌরতত্ত্ব হিসাবে নাৎসিবাদ ও স্টালিনবাদের সাদৃশ্য দেখানোর চেষ্টা করেন। কারো কারো মতে সব ফ্যাসিবাদী ও সব কমিউনিস্ট শাসনই সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী। আবার কেউ মনে করেন কিছু ফ্যাসিবাদ শাসন (যথা ফ্রাঙ্কো-র স্পেন, মুসোলিনির ইতালি) ও কিছু কমিউনিস্ট শাসনে (যথা টিটোর শাসনকালে যুগোসলাভিয়া, ডেং জিয়াও পিং-এর নেতৃত্বে চীন ও ফিডেল কাস্টো-র নেতৃত্বে কিউবা) সর্বনিয়ন্ত্রণবাদের চেয়ে কর্তৃত্ববাদের বৈশিষ্ট্যই বেশি দেখা যায়। কিছু ব্যাখ্যাকার মনে করেন স্টালিনের সোভিয়েট ইউনিয়ন উত্তর-সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী সমাজ।

জার্মানিতে নাৎসীরা এই শব্দটি কমই ব্যবহার করেন। সম্ভবত সর্বপ্রথম আর্নেস্ট জুয়েনগার শব্দটি সামরিক অর্থে সার্বিকভাবে সংগঠিত হওয়াকে বোঝাতে ব্যবহার করেন। সেটা ১৯৩০-এ। পরের বছর কার্ল স্মিট (যিনি একজন আইনজীবী ছিলেন এবং পরবর্তীকালে নাৎসীদের অন্যতম মূল তাত্ত্বিক প্রবক্তা হন) টোটালিটেরিয়ান রাষ্ট্র সম্পর্কে নাৎসী সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ব্যক্ত করেন। হিটলার শব্দটি কমই ব্যবহার করেন। এবং যখন করেন তখন তার আগে 'তথাকথিত' শব্দটি যুক্ত করেন। ঐ সময় নাগাদ ফ্যাসিবাদের উদারনৈতিক বিরোধীরাও শব্দটা ব্যবহার করছিলেন তবে তা ফ্যাসিবাদের সমালোচনায়—তার একনায়কত্ব ও দুর্নীতিপরায়ণতার কথা বলতে।

Dictionary of the Soviet Academy অনুসারে ১৯৪০ থেকে সোভিয়েট ইউনিয়নে এই শব্দটা 'ফ্যাসিবাদী শাসন' প্রসঙ্গে প্রায়ই ব্যবহার হয়।

সোভিয়েট ইউনিয়নের সমালোচনায় পাশ্চাত্যের লেখকরা ও বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীভুক্তরা সে দেশের শাসনব্যবস্থাকে টোটালিটেরিয়ান বলেন। জার্মানির নাৎসী শাসনের পতনের পর থেকে বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও পশ্চিম ইউরোপের অনেক তাত্ত্বিক নাৎসী জার্মানির সরকার ও স্টালিনের শাসনে সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে সাদৃশ্যের কথা বলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাৎসী 'সমাজতন্ত্রের' কথা বলা হত না কারণ নাৎসীদের সমাজতন্ত্র প্রচারে ছিল, তাদের তত্ত্বে বা প্রয়োগে নয়। বলা হত নাৎসীবাদ ও স্টালিনবাদ দুটোই সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী। বলা বাহুল্য, সোভিয়েট ইউনিয়ন এসব কিছুর তীব্র প্রতিবাদ করে ও দাবি করে এগুলি ঠান্ডা লড়াই-এর প্রচার।

আমরা বুঝতে পারি, সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ অত্যন্ত বিতর্কিত বিষয়। অধিকাংশ ঐতিহাসিক যাঁরা নাৎসী জার্মানি বা সোভিয়েট ইউনিয়ন নিয়ে গবেষণা করেন, তাঁরা সতর্কতার সঙ্গে এই ধারণাটিকে গ্রহণ করেন। আরেক দল গবেষক আছেন (সাধারণত Neo-conversative) যাঁরা আরেন্ড ও অন্যান্য সর্বনিয়ন্ত্রণবাদীর গবেষকদের থেকে কিছুটা আলাদা মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে নাৎসীবাদ বা স্টালিনবাদ শুধু শাসনের ধরনেই সমতুল্য নয়, দুটি ক্ষেত্রেই 'সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা' বর্তমান। যাঁরা ঐ মত পোষণ করেন তাঁরা নাৎসী নেতাদের নিজেদরে সমাজতান্ত্রিক বলে মাঝেমধ্যে আখ্যা দেওয়াটা দেখান, এবং নাৎসীদের পুঁজিবাদ বিরোধী দলীয় অবস্থানের উল্লেখ করেন। সেই একই কর্মসূচির কমিউনিস্ট বিরোধী অবস্থানকে কিন্তু ঐ গবেষকরা অগ্রাহ্য করেন। এছাড়া, ইটালিয়ান ফ্যাসিবাদী আন্দোলনের নেতা বেনিটো মুসোলিনি যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে সমাজতান্ত্রিক ছিলেন সেই বিষয়টা ঐ গবেষকরা তাঁদের বক্তব্যের সপক্ষে তুলে ধরেন।

আইয়ান কেরস, হ্যান্স মমসেন ও জোয়কিম ফেস্ট-এর মত ইতিহাসবিদরা মনে করেন যে নাৎসী দলের উৎস প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী জার্মানির অতি দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদী দল ও বর্ণবিদ্বেষী আন্দোলনগুলি আর তারও আগের থুলে সোসাইটির মত আন্দোলনে নিহিত। কার্ল মার্কস, ফার্ডিনান্ড লাসেল, কার্ল কাউটস্কি, অগাস্ট বেবেল প্রভৃতির ব্যক্ত করা উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের জার্মান সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্যক হিটলার গোয়েবেলস ও নাৎসী তাত্ত্বিকরা ধারাবাহিকভাবে অস্বীকার করে যান। বরং এই ইতিবাসবিদদের মতে যে বুদ্ধিজীজীদের দিক নাৎসীরা গোড়া থেকেই তাকান (নিটশে বা হুস্টন স্টুয়র্ট চেম্বার্লেন) তাঁরা বরাবরই মধ্য দক্ষিণ অবস্থান নেন। অর্থাৎ, নাথীসবাদের তাত্ত্বিক উৎস দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদী ও বর্ণবিদ্বেষী চিন্তায়। সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্যে নয়।

এছাড়াও নাৎসীরা যে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ঐতিহ্য উদ্‌যাপন করে সেগুলি সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্যের অংশ নয়। হিটলার ও নাৎসীরা ওয়াগ্নারের জাতীয়তাবাদী অপেরা, বিশেষত দি রাইট মাইকেল-কে শ্রদ্ধা করেন ও ফ্রেডেরিক দি গ্রেট বা টিউটনিক নাইটদের ইতিহাসের হিরো মনে করেন। আবার উল্টোদিকে নাৎসীরা ফরাসী বিপ্লব ও ১৮৪৮ এর বিপ্লব বা শ্রমিকদের নানা ধর্মঘট ও প্রতিবাদের ইতিহাসকে (যেগুলি সমাজতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের অঙ্গ) অস্বীকার করে। নাৎসীরা আঠারো ও উনিশ শতকের বিপ্লবী আন্দোলনগুলির সমালোচনা করে সেগুলিকে সনাতন মূল্যবোধ ও সামাজিক সম্পর্ক ধ্বংস করার জন্য দায়ী করে। তারা সেগুলিকে ইহুদিদের ষড়যন্ত্র হিসাবেও দেখে কারণ—সেই বিপ্লবগুলি ইহুদিদের মুক্তি আনে।

নাৎসীবাদ ও অন্যান্য ধরনের ফ্যাসিবাদ যে ধরনের ক্রমোচ্চ সমাজব্যবস্থা তুলে ধরে তা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাম্যের ধারণার বিপরীত। কের্‌স বলেন, নাৎসীরা সাম্যবাদের বিরোধী, সমাজ সম্পর্কে এলিট মনোভাব পোষণ করে ও দাবি করে নাগরিগদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় উৎকৃষ্ট ব্যক্তি শীর্ষে থাকবে।

সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ ও কর্তৃত্ববাদের সম্পর্ক ও বিতর্কিত। কোন কোন বিশ্লেষকের মতে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ কর্তৃত্ববাদের কে উগ্র ধরন; আবার কারো কারো মতে দুটি একদমই আলাদা।

জিন কির্কপ্যাট্রিকের মত neo-conservative কিছু রাজনৈতিক বিশ্লেষক সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ ও কর্তৃত্ববাদের মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য বিশ্লেষণ করেন। তাঁরা বলেন, দুই ধরনের সরকারই রাজনৈতিক বিরোধীদের সঙ্গে অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারে, তবে কর্তৃত্ববাদী সরকারের মূল লক্ষ্যে থাকে রাজনৈতিক বিরোধীরা; ব্যক্তি জীবনের সব দিক নিয়ন্ত্রণ

করা ইচ্ছাও থাকে না, ক্ষমতাও থাকে না। অন্যদিকে, সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী ব্যবস্থায় শাসনব্যবস্থার দর্শন দাবি করে ব্যক্তির জীবনের সব দিক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হবে; এমনকি, পেশা, আয় ও ধর্ম।

ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্যবাদের মত রাজনৈতিক তত্ত্বে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদকে চরমতম রাষ্ট্রবাদ হিসাবে দেখা হয়। কিন্তু অন্য রাজনৈতিক, দার্শনিকরা এই ব্যাখ্যা মানতে নারাজ। তাঁদের মতে এর অর্থ দাঁড়ায় যে, সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ একটি কার্যকর সরকার থেকে ধীরে ধীরে, ক্রমশ গড়ে উঠতে পারে।

এলা ব্যাপকভাবে দেখা গেছে যে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ একটি জনমোহিনী নেতৃত্বকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এর ফলে অনেক গবেষক মনে করেন সর্বনিয়ন্ত্রণবাদের এক প্রেরণাসঞ্চারী বড় নেতার প্রয়োজন হয় যিনি শাসনের যৌক্তিকতা প্রদান করবেন। বাস্তবে দেখা যায়, ঐ ধরনের ব্যবস্থায় সর্বদাই এক সর্বশক্তিমান জীবিত নেতার প্রয়োজন হয় এবং আশা করে জীবনের সব বিষয়ে সেই নেতার কাছ থেকে নির্দেশ আসবে।

সর্বনিয়ন্ত্রণবাদের সমালোচকরা অনেক সময়ই বলেন যে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ ও কর্তৃত্ববাদের মধ্যে কোন স্পষ্ট পার্থক্য নেই, যারা চায় কোন এক নায়কত্বকে অন্য একনায়কত্বের চেয়ে ভাল দেখাতে তারাই কৃত্রিম ভাবে এই পার্থক্যের সৃষ্টি করে। এছাড়াও আছে তারা যারা কোন বিশেষে একনায়কের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্কের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে ইচ্ছুক।

বলাবাহুল্য, সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ গণতন্ত্রের নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এটা ব্যক্তির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে, তার অধিকার পদদলিত করে এবং তার স্বাধীনতার প্রতি কোন শ্রদ্ধা দেখায় না। সর্বক্ষণের আতঙ্ক, সন্দেহও বলপ্রয়োগ এ ব্যবস্থার ভিত্তি। সমাজে সুস্থ, স্বাভাবিক ভাবে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া অপূরণীয়ভাবে ব্যাহত হয়।

৪.৬ সার সংক্ষেপ

সর্ব নিয়ন্ত্রণবাদকে কেউ কেউ চরম একনায়কত্ব হিসাবে দেখেন; অন্যরা সে দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করেন। সর্বনিয়ন্ত্রণবাদে রাষ্ট্র সর্বত্র পরিব্যাপ্ত; এবং শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রই নয়, সামাজিক ক্ষেত্রও নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ, এক কথায় বলা যায়, কোন কিছুই তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে না নাৎসী জার্মানি ও ফ্যাসিবাদী ইটালি সর্বনিয়ন্ত্রণবাদের উদাহরণ। কিছু বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী ব্যবস্থার উত্থান ঘটে। প্রেরণাসঞ্চারী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতাকে দেখা যায় সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী ব্যবস্থার সৃষ্টি ও তা বজায় রাখায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে।

৪.৭ নমুনা প্রশ্ন

বড় রচনাত্মক প্রশ্ন :

১. সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ বলতে কী বোঝেন?
২. সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী শাসনের উদ্ভবের মূল কারণ কী কী?
৩. সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

মাঝারি প্রশ্ন :

১. সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ সাতন একনায়কতন্ত্রের থেকে কীভাবে পৃথক?
২. আমরা কি সর্বনিয়ন্ত্রণবাদের ও কর্তৃত্ববাদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি?
৩. সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী ব্যবস্থার কুফল কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. জিওভানি জেন্টিল কে ছিলেন?

২. সর্বনিয়ন্ত্রণবাদের কবে উদ্ভব ঘটে?

৩. মুসোলিনি কোন বছর তাঁর বক্তৃতায় 'totalitarian' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন?

৪.৮ গ্রন্থসূচী

১. E. Fromm, Escape From Freedom.

২. H. Arendt. The Origins of Totalitariansim

৩. C. J. Friedrich and Z. K. Brezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy

৪. M. Curtis ed., Totalitarianism

৫. H. Buchheim, Totalitarian Rule.

৬. L. B. Schapiro, Totalitarianism.

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

— সুভাষচন্দ্র বসু

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

—Subhas Chandra Bose

Price : Rs. **150.00**

(*NSOU* -র ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিক্রয়ের জন্য নয়)

Published by : Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector-1, Salt Lake City, Kolkata-700 064 and
Printed at : Royal Hlaftone Co., 4, Sarkar Bye Lane, Kolkata-700 007